উৎসর্গ

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসুকে

সামান্য কথা

উনিশ শ' চুয়ান্ন সন। তারও আগে মাদ্রাজের পথযাত্রায় দেবভূমি দক্ষিণের মন্দিরে মন্দিরে পরিক্রমায় বেরিয়েছিলাম। পরিক্রমা শেষে 'মন্দিরে মন্দিরে নামে একটি পাণ্ডুলিপির দীর্ঘশ্বাস প্রতিনিয়ত কানে বাজতে থাকায় তাকে কোথায় যেন পাঠিয়েছিলাম। বেশ কিছুকালের টানাপোড়েনে সেইখানেই সে পাণ্ডুলিপি হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো!

আবার দীর্ঘদিন দীর্ঘশ্বাসের তাড়না। বাধ্য হয়ে নতুন করে স্মৃতিমন্থনে 'মন্দিরে মন্দিরে' নব রূপে রূপায়িত করা ছাড়া উপায় ছিল না। সেই রূপে তাকে যুগান্তরের সাময়িকীতে দীর্ঘ ছাব্বিশ সপ্তাহ ধরে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিয়েছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। সেও উনিশ শ' ছাপ্পান্ন সনের ১২ই মার্চের আগের ঘটনা।

পরের ঘটনা : কয়েক বছরের ব্যবধানে 'মন্দিরে মন্দিরে' নামে বাজারে অন্য বইয়ের আবির্ভাব। এতেও নিরাশার কারণ নেই বলে মতামত দিয়েছিলেন একদিন আশাবাদী শ্রীসজনীকান্ত দাস। তাঁর দৃঢ়কণ্ঠের কঠোর সত্যবাণী মোলায়েম করলে দাঁড়ায় : "নাম নিলেও লেখা লোপাট করা যায় না।"

বর্তমানে স্বর্গীয় ওই সাহিত্যসেবীর বাণীতে আস্থা রেখে 'মন্দিরে মন্দিরে'-র নাম পরিবর্তন করে 'দেবভূমি দক্ষিণ' পাঠকের হাতে তুলে দিয়ে অশেষ প্রতীক্ষার পরিসমাপ্তি।

দেবভূমি দক্ষিণের ইতোমধ্যে অনেক বহির্মুখ পরিবর্তন হয়েছে। মহাবলীপুরম থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত রং পালটে গেছে বহির্বাসের। কিন্তু মন্দির-কেন্দ্রিক "দেবভূমি দক্ষিণ" অন্তরের দিকে মূলতঃ তেমন বেশী কিছু পাল্টায়নি। তাই সাময়িকীর 'মন্দিরে মন্দিরে' বহির্মুখ

বিবর্তনে দেবভূমি দক্ষিণ-এর চিরন্তন রূপ ও স্বরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে।

অনেকেই এই মাদ্রাজ-প্রবাসী বাংলা-সাহিত্যসেবীকে নানাভাবে দিনের পর দিন সাহিত্যসেবায় উৎসাহ দিয়ে আসছেন। এঁদের সংখ্যা স্বল্প নয়। সুতরাং অন্তরে এঁদেরকে স্মরণ করে অব্যক্ত শ্রদ্ধা নিবেদনে এ-সামান্য কথার সমাপ্তি টানছি।

কলেজ লেন,
মাদ্রাজ-৬

বিনীত
অমল ঘোষ

প্রকাশকের নিবেদন

এই বইখানা প্রকাশ করার একটু ইতিহাস আছে। আমি যেবার দক্ষিণ ভারতে বেড়াইতে বাহির হই তখন মাদ্রাজে কয়েকদিন ছিলাম। সে সময় বিখ্যাত চিত্রকর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ চৌধুরীর বিদায় উপলক্ষ্যে বাঙ্গালীরা একটি উৎসবের আয়োজন করেন। সেই উৎসবে আমি আমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। সেইখানেই প্রথম এই পুস্তকের গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত অমল ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হয়। সেই সূত্রেই অমলবাবু তাঁহার বইটি প্রকাশ করার জন্য আমাকে বলেন। তাহার পর বন্ধুবর সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় ইহা প্রকাশ করার জন্য আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেন; এবং তিনি তাঁহার মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়া পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া দেখিয়া দেন, এমন কি প্রুফ দেখার ভারও তিনি নিজে নিয়া আমাকে অসীম সাহায্য করিয়াছেন। সেজন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণী, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিলে ত্রুটি থাকিয়া যাইবে।

নিবেদক

মহালয়া

শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক

সপ্ত প্যাগোডার শেষ প্যাগোডা,
মহাবলীপুরম

মন্দিরময় দক্ষিণভারতের একটি মন্দিরের বহির্দৃশ্য, মাদ্রাজ
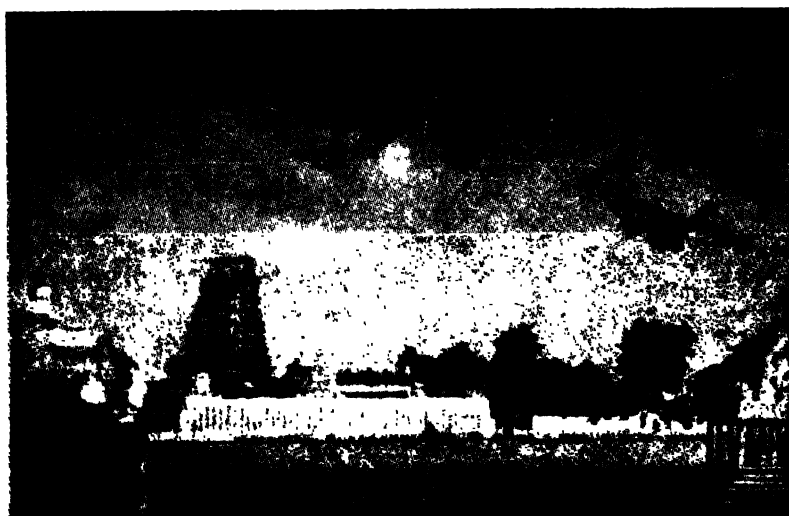
শেষ প্যাগোডার গবাক্ষপথে সমুদ্রের উচ্ছ্বাস, মহাবলীপুরম

সহদেবের রথ,
পাশেই ঐরাবত,
অদূরে সিংহ,
মহাবলীপুরম

দ্রৌপদীর রথ,
পঞ্চ পাণ্ডবের রথের
রাজ্যে বাঙলার
স্থাপত্যরীতির নিদর্শন,
মহাবলীপুরম

অজুনের তপস্যা— এই সুবিশাল ভাস্কর্যপট বিশ্বের বিস্ময়

।রম্ (মহাবলীপুরম)-এর
একালের নরনারী
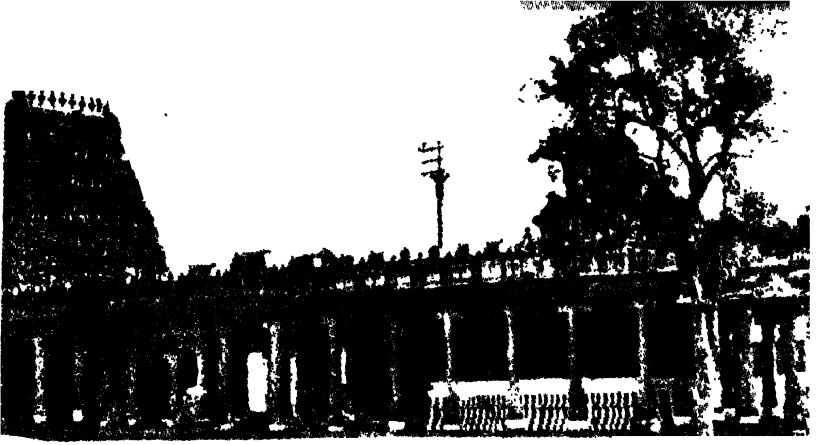
কাঞ্চীভেরামে একাম্বরেশ্বর মন্দিরের অঙ্গ-সংলগ্ন সভামণ্ডপের দৃশ্য

পক্ষীতীর্থের পাহাড়শীর্ষে দেবগিরীশ্বরের মন্দির
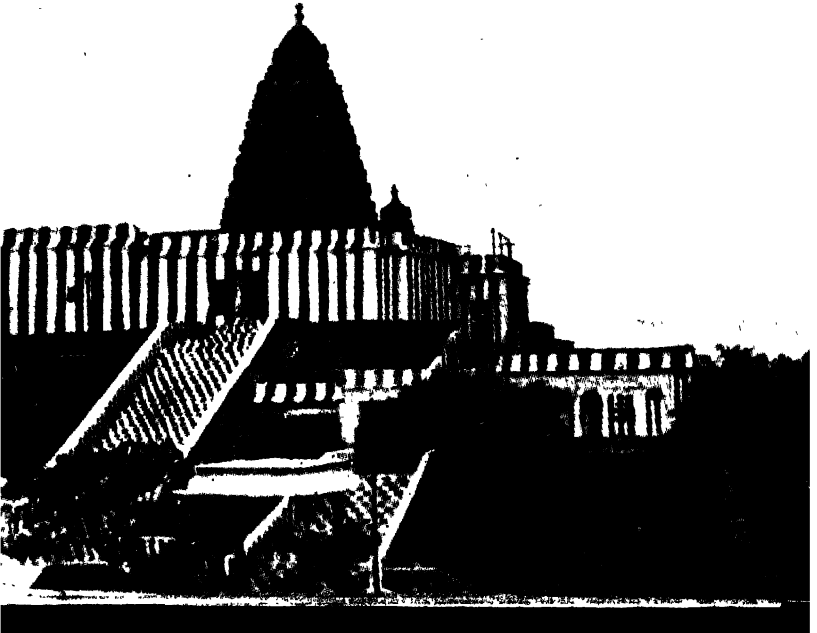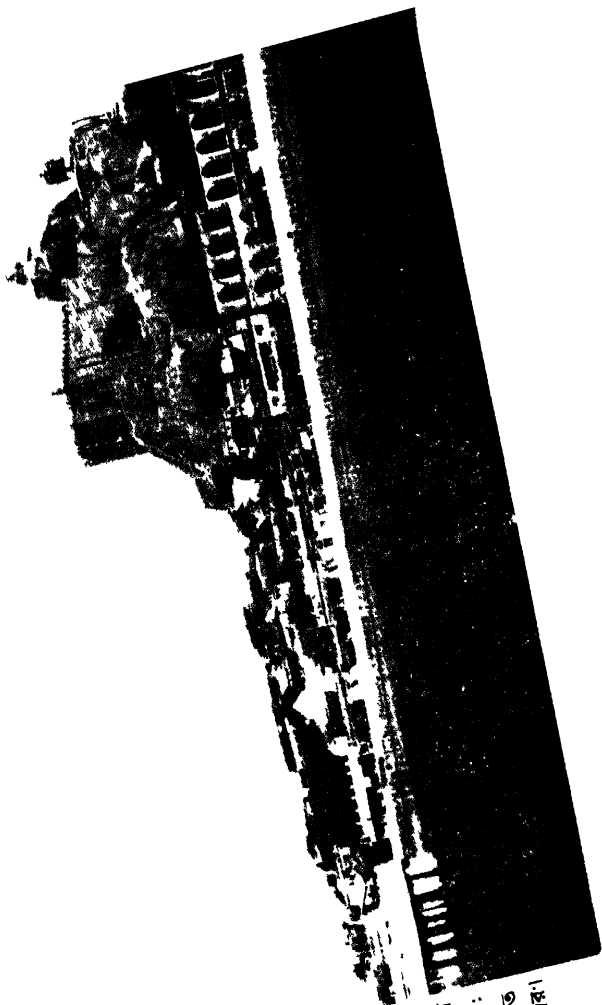
ত্রিচীর রক ফোর্টের পাদদেশে
জলবিহারের একাংশ :
পাহাড়চূড়ায় আকাশ-আলিঙ্গনরত
গণেশ মন্দির।

মীনাক্ষী মন্দিরের সভাকক্ষে
নৃত্যরত নটরাজ মূর্তি

শুচীন্দ্রম মন্দিরের
গোপুরম ও জলটুংগী।
এ মন্দিরটি ত্রিবান্দ্রাম থেকে কন্যাকুমারিকার পথে অবস্থিত।

দেবভূমি দক্ষিণের
মনোহারী কুমারীদেবী,
কন্যাকুমারিকা

কন্যাকুমারিকায় সূর্যোদয়, বঙ্গোপসাগর
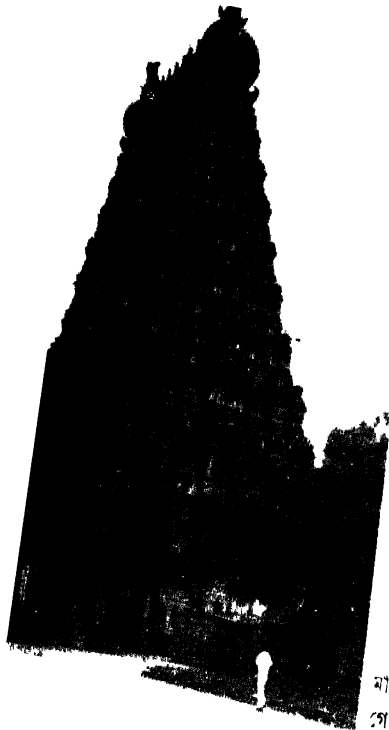
মীনাক্ষী মন্দিরের উত্তর গোপুরম—গোপুরম সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ নমুনা।

কন্যাকুমারিকায় সূর্যাস্ত, ভারতের সর্বশেষ স্থলবিন্দু, আরবসাগর
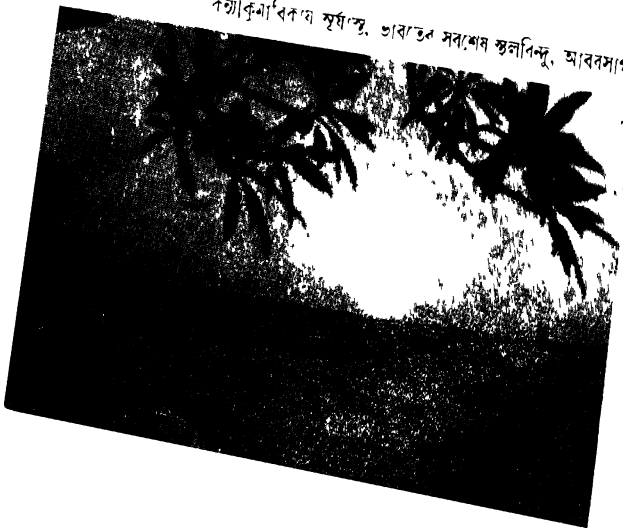
"নৃত্যরতা অপ্সরা"– বৃহদীশ্বরের মন্দিরের গর্ভগৃহের অন্যতম অত্যাশ্চর্য বি
তাঞ্জোর।

দেবভূমি দক্ষিণের মন্দিরগাত্রের
এক অনন্যা সুরসুন্দরী মূর্তি,
কাঞ্জীভেরাম।
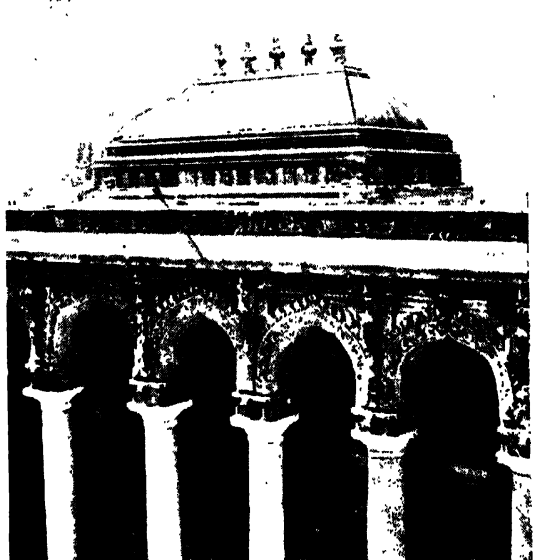
তিরুমলাই নায়েকের প্রাসাদ -
সম্মুখভাগ —
মাদুরা।
দেশ-বিদেশের পর্যটকদের
অবশ্য দ্রষ্টব্য —
দক্ষিণের স্থাপত্যশিল্পের
অনন্য নিদর্শন।

মীনাক্ষী মন্দিরের
অন্দর মহলের পদ্মপুষ্করিণী,
একালে চিরপদ্মহীন
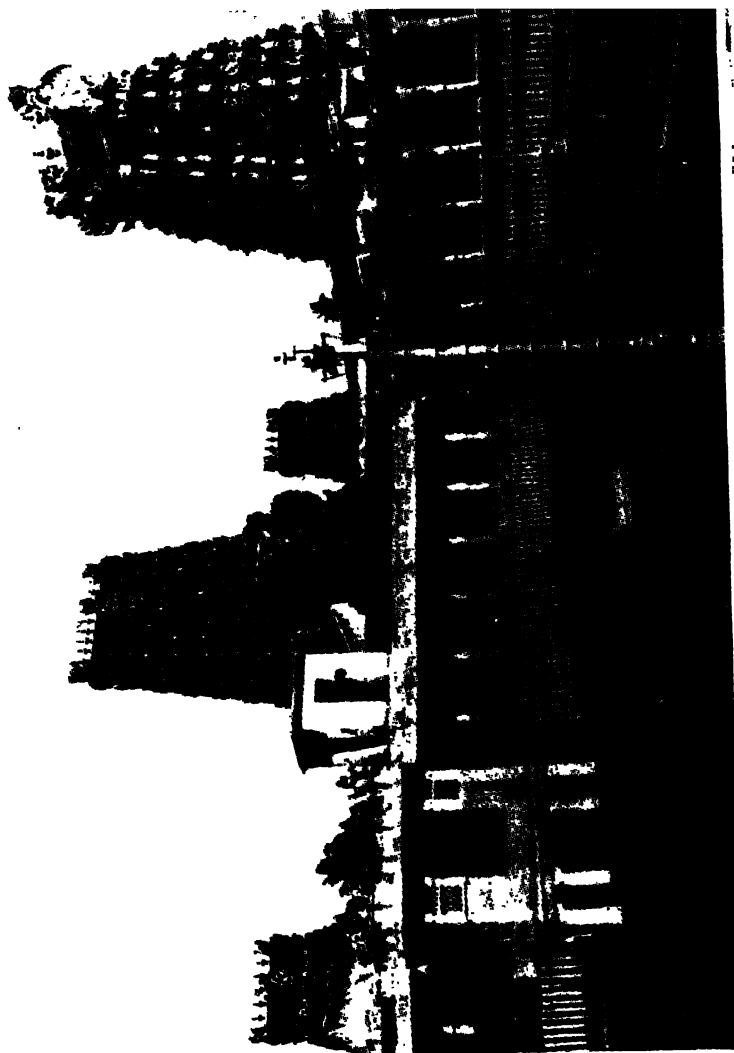
'বিবেকানন্দ রক', কন্যাকুমারিকা

কন্যাকুমারিকায় কুমারীদেবীর মন্দির-তোরণদ্বারে সমুদ্রের নম্র নমস্কার

ভারতনাট্যমের একটি অনিন্দ্যসুন্দর নৃত্যভঙ্গিমায়
দক্ষিণী নৃত্যপটীয়সী,
মাতুরা।

সমুদ্রবিধৌত রামেশ্বরম মন্দিরের জগদ্বিখ্যাত অলিন্দ

স্নানের ঘাট, কন্যাকুমারিকা. ভারতমহাসাগর

দেবভূমি দক্ষিণ

॥ ১ ॥ কাঞ্চীর বন্দর-নগরে

সেখানে গেলে স্বপ্ন দেখতে হয়। কল্পনার অতল তলে সুদক্ষ ডুবুরীর মত তলিয়ে যেতে হয়। মুঠো ভরে অতীতের সমুদ্র থেকে শুক্তি কুড়িয়ে এনে ভবিষ্যতের পাথেয় উপহার দিতে হয় বর্তমানের উৎসুক পথিকের হাতে।

"আবহমান কালের স্রোতে নিজেকে লুপ্ত করে দিতে না পারলে ঐ ভগ্ন পাষাণলোকের কাছে গিয়ে কোনো লাভ নেই।

"একবার সেখানে গিয়ে সেই সৃষ্টিকাণ্ডের যজ্ঞশালায় বিশ্বকর্মার লীলার পাশাপাশি মহাকালের পরিহাসলীলা বারেক দেখে নাও। তারপর নিজেকে যদি ভুলে যেতে পার, সেই চেষ্টা কর। অন্ততঃ আর কিছু সম্ভব না হয়, একালের অতিবাস্তব অন্তরটাকে ঘুম পাড়িয়ে ছাড়।

"ঘুমের রাজ্যে পরীদের সোনার কাঠির স্পর্শে যখন ঘুমন্ত প্রাণটা আরেক জগতে জেগে উঠবে তখন দেখবে, অশরীরী আত্মারা সব শোভাযাত্রায় বেরিয়েছে। তাদের পদপাতের সুমিষ্ট সুরে ঘুমন্ত গ্র্যানাইটের ঘুম ভেঙে গেছে।

"ঐ গ্র্যানাইট তোমার সঙ্গে কথা কইবে. তার জন্যে কত আকুলি-বিকুলি। অমনি আগের কালের অবিরাম সৃষ্টির স্রোত প্রোজ্জ্বল হয়ে রূপোর তরঙ্গে তরঙ্গে অন্তরের চোখের উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে মিশবে সুমহান সভ্যতার মহাসাগরে।

"এক সময় হয়তো তুমিও নিজেকে আবিষ্কার করবে অশরীরী শোভা-যাত্রার মাঝখানে। চার পাশের লোকজন চিনবে না অথচ রক্তের অনুভূতিতে কেমন যেন আচমকা মনে হবে, চিনি, চিনি—এ যে আমারি আজন্মের আত্মার আত্মীয় সব। কবে কোন্ যুগে কোন্ এক কাঞ্চীর বন্দর নগরীতে এদের বিসর্জন দিয়ে একাকী পান্থ আমি নতুন কোনও দেশের পথ খুঁজতে খুঁজতে পথ হারিয়েছিলাম। আজ আবার কয়েক

শতাব্দী বাদে ঘুরতে ঘুরতে আমারই হারানো পরমাত্মীয়দের সভ্যতার শ্মশানভূমিতে ফিরে এলাম।"

তখন কিশোর বয়স। এক পরিব্রাজকের মুখে উপরের কথাগুলো শুনতে শুনতে প্রায় ঘর পালাবার পরিকল্পনা এঁটে এনেছিলাম। কিন্তু সে পরিকল্পনা অনেকদিন পর্যন্ত কাজে পরিণত করতে না পারায় মনে যে খেদ ছিল, সে খেদ মিটাতে যেদিন সত্যি সত্যি "ঐ ভগ্ন পাষাণলোকের কাছে" উপস্থিত হলাম, সেদিন জানি না কেন সহসা কল্পনার বল্‌গাটা আপনা থেকেই ছিঁড়ে গেল, আর কেনই-বা স্বপ্নের সুষমা মধ্য দিনে এ'ছুটি নয়নে নীলাঞ্জন মাখিয়ে দিল। সে রইল চিরদিনের মত অজ্ঞাত।

পথ চলার একটি ছন্দ আছে। জনপদবধূদের দীঘির ঘাটে জল ভরার ছন্দের মত সে ছন্দনূপুর সেই শুনতে পায়, যার অন্তরের কান সুদূরের সুরের প্রত্যাশায় দিন-রাত্রি উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে।

পথের এই ছন্দনূপুর যে শুধু শুনল না, ঐ নূপুরের সুরে সুরে প্রাণ সঁপেও দিল, তাকে ঘরের বাঁধন বাঁধবে কেমন করে! বাঁধনহারা সে তরুণ পথিক, সেই কি সংসারের প্রতিটি মানুষের বুকে ঘুমন্ত যাযাবররূপে সর্বকালে সর্বদেশে আসন নিয়েছে? সে আসন যেদিন আমার মাঝটাতে টলে উঠল, সেদিন সুপ্রভাতে ঘরকে নমস্কার করে পথের বাঁকে বেরিয়ে পড়া গেল।

"একগাছ দড়ি গুছিয়ে না পারি", এই যে হেঁয়ালিঘেরা আদিম, অকৃত্রিম পথের বর্ণনা, এরই এক চক্রবাঁকে এসে নতুনতর যাত্রার শুরুতে মাইলপোস্টের লেখা দেখে ভাল করেই মালুম হল, এটা মাদ্রাজ মহানগরীর পৌরসভার সীমানা ছাড়িয়ে মাত্র এক মাইল পথ।

মাইলের দূরত্বে কলকাতা থেকে মাদ্রাজ এক হাজার বত্রিশ মাইল। মনের দূরত্বে একই দেশের ছুটি প্রান্তের ব্যবধান প্রায় আকাশ আর পাতাল। ভাষার পার্থক্য অনেকটা যুগ-যুগান্তরের।

হয়তো যেদিন মঙ্গল গ্রহের কল্পিত মানুষের কোন প্রতিনিধি হঠাৎ পৃথিবীতে এসে তাদের ভাষায় যে পরিচয় দেবে, তাতে পৃথিবীর মানুষেরা

এর চেয়ে বেশী চোখ ছানাবড়া করবে না, যতটা এখন একজন বঙ্গ-সন্তান হঠাৎ এই দেশে এসে এখানকার সাধারণ মানুষের মুখের কথায় করে বসে।

হাজার হলেও উপমা উপমাই। যুক্তি সে নয়। তাই পরক্ষণেই মনে হয়, মাদ্রাজের সাধারণ মানুষের কথায় যতদূর দূরত্বের ব্যবধান আরোপিত হয়, আসলে হয়ত ব্যবধান ততটা নয়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাসের অপেক্ষা করতে করতে একথা ভাবছিলাম। পাশেই কাদের কণ্ঠস্বর কানে ভেসে আসছিল। এ স্বর সুমিষ্ট কিনা সে বিচার বিদেশীর রায়ের বাইরে। সে শুধু এইটুকুতে সান্ত্বনা লাভের প্রয়াস পাচ্ছিল যে, মায়ের শিশু যেমন মায়ের কাছে প্রিয়, মাতৃভাষাও মানুষের কাছে তেমনি। তবে দূরদেশী পথিকের কাছে প্রতিটি শব্দই এখানকার কেমন যেন আয়ত্তের অন্তরায়।

কি কাণ্ড! পাঁচ, দশ, পনেরো মিনিট অন্তর বাস আসছে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মফঃস্বলের বাসগুলো দাঁড়াবার নাম না করে বাজীর ঘোড়ার বেগে সমানে ছুটে চলেছে। কাছাকাছির যাত্রীদের নেবার জন্যে যে দু'চারখানা বাস থামছে, তাদের কণ্ডাক্টরের মুখে কোলকাতার চিরপরিচিত 'বাঁধকে' বুলির তড়বড়ি যেমন নেই, তেমনি নেই চালু ইঞ্জিন থামিয়ে একদল ঠাসা মানুষকে পিষে মারবার ব্যবস্থা। অবশ্যি এখানে যাত্রীর ভীড়ও ভীষণ কিছু নয়।

কিন্তু আমায় নিয়ে যে যাবে, কোথায় সে যন্ত্র-রথ! আমি যে সেই কখন থেকে যান্ত্রিক সারথির পথ চেয়ে বসে আছি।

অনেকক্ষণ প্রতীক্ষার পর এ যাত্রীকে 'সেণ্ট টমাস মাউণ্টের' অদূরস্থ পাদদেশ থেকে তুলে নেবার উদার সারথি তার যন্ত্র-রথ থামালো। ভেতরে বসবার নয়, দাঁড়াবার জায়গা ছিল। দূরদেশীর জন্যে সহসা একটু ঘেঁষা-ঘেঁষি বসবার জায়গারও বন্দোবস্ত হল।

আমার যাত্রা এইতো সবে শুরু। এই-যে তেঁতুলগাছের সারির তলা দিয়ে সুমুখে এগিয়ে চলেছি—দুপাশে কোথাও ধূসর প্রান্তর কোথাও বা সবুজ শস্যক্ষেত—প্রকৃতির এ এক বৈচিত্র্য। সে যেমন কৃপণা

কঠোরা, তেমনি যেখানে মানুষ তাকে বশ করেছে সেখানে সে শ্যামসুষমায় ধন্যা।

দুপাশে, আগে পেছনে এদেশের মানুষেরই ঠাসাঠাসি। চলার পথে তারা কেউ বিশ্রামালাপ জুড়ে বসেনি। এমন কি স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি বসে নীরবে চলেছে দূরের গাঁয়ে—কেউ বা নীড়ে কেউ বা আত্মীয়-ঘরে। আশ্চর্য, একটানা মাইলের পর মাইল ছোটার সুযোগে একটি লোকও তার বিদ্যে-বুদ্ধির হাঁড়ির ঢাকনাটি খুলে ধরে পরকে জ্ঞান বিতরণে লেগে যায়নি। তবে কি এটাই সত্যি, এখানকার, এই দক্ষিণের মানুষ স্বভাবতঃ কথা বলে কম, কাজ করে বেশী?

বাসটি চিংগেলপেট থামতেই যাত্রীদের বেশীর ভাগ নেমে পড়ল। এটি একটি জেলা শহর। এর চেহারা এত চমৎকার নয় যাতে বোঝা যায় সোনাদানার জোয়ার বয়ে চলেছে এর শিরায় শিরায়!

যন্ত্র-রথের ঘর্ঘর সুরু হতে একটি নতুন দল শূন্য আসনগুলো জুড়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে নতুন পথে বাঁক নিয়ে যান্ত্রিক সারথি ছুটিয়ে দিলে রথ।

গ্রাম, জনপদ এপথে তেমন নজরে পড়ে না। যতই অগ্রসর হতে থাকি অন্যান্য কত কি চোখে পড়ে, দেখা যায় না কেবল সজীব গ্রাম আর প্রাণবান মানুষ!

কাজেই বাইরে থেকে চোখ ঘুরিয়ে চোখ দুটি ভেতরে ফিরিয়ে আনতে হয়। মন্দ নয়, নবাগতরা ইংরেজীতেই কথা কয়। তবু পথের দূরত্ব পেরোতে পেরোতে মনের বুভুক্ষা বেড়েই চলে। হায়, দূরদেশী পথিকের সঙ্গে কেউ যদি বা প্রাণঢালা কথা বলে!

এক সময় পক্ষীতীর্থের পায়ের কাছে অনেকেই নেমে গেল। নামল না শুধু চিংগেলপেট থেকে যে দলটি উঠেছিল।

পাহাড়ের অঞ্চলপ্রান্ত ছাড়িয়ে বাসটি ছুটে চলেছে। অনুর্বর ওই মৃত্তিকার বুক জুড়ে কাঁটার ঝাড়। কোথাও বা আবার মান্ধাতার আমলের হলের আঘাতে কৃপণ মাটি অঙ্কুর-মুখর।

ছোট্ট একটি সেতু পেরিয়ে তুপাশের 'ব্যাকওয়াটার' পেছনে ফেলে নামলাম এসে সে-কালের অন্যতম আশ্চর্য এক পুরীতে।

দক্ষিণের ইতিহাসে এর এক নাম আছে, যে নাম ঘষেমেজে এসে দাঁড়িয়েছে মহাবলীপুরমে। একালের কেউ কেউ আবার আদর করে বলে—সপ্ত-প্যাগোডা-পুরী।

প্যাগোডা বলতে, সোজা কথায়, মন্দির। চিংগেলপেটের সেই যাত্রীদল নিজেদের আলাপচারীতে প্রকাশ করে ফেললে, "চল, সৈকতের মন্দিরে যাওয়া যাক্।"

মন্দির! সে হচ্ছে সারা ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাধনার প্রতীক। মন্দির—আমার মনোমন্দিরে ঐ নাম ফুটিয়ে তোলে কি এক অপূর্ব ব্যঞ্জনা! মন্দির আমায় অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করে। দূর হতে দূরে যারা, তাদের মনের সোনা যে চিরদিন ছোঁয়াতে পারে সেইতো মন্দির!

এখানে সমুদ্রতীরে সে আমায় ডাক দিয়েছে। ডাক দিয়েছে ওই দলের আলাপচারীর চূর্ণ-কথার ইসারায়। আর যে আমি থাকতে পারছি না। আমার চরণতুটি আগে আগে পদচিহ্ন এঁকে এগিয়ে চলতে চাইছে অজানাকে জানবার, অদেখাকে দেখবার, অচেনাকে চেনবার পুলকে।

কাছেই সমুদ্র। হাওয়ায় তারই আভাস। ঝাউয়ের পাতায় পাতায় তারই মনোমর্মর।

আকাশে অজস্র আলোক। সূর্যের সুন্দর জ্যোতি অম্লান ধারায় ভাসিয়ে দিচ্ছে দ্যুলোক ভূলোক। ঐ আলোকে সমুদ্রের সফেন আলিঙ্গন হেলায় তুচ্ছ করে হাসছে সপ্ত প্যাগোডার একটি প্যাগোডা।

পাথরে গড়া এই প্যাগোডা। সাত ভাই চম্পার মত একদিন সাতটি মন্দির এই সমুদ্রসৈকতের হৃদয়ে জুড়ে বসেছিল। কোন্ সুয়োরাণীর চোখের বিষে একে একে ছ'টি মন্দির কোথায় কেমন করে যে মিলিয়ে গেল আজ কেউ কি তার খবর রাখে। কেবল কোন্ দূর বাতাসে বোন-পারুলের দীর্ঘশ্বাস ভেসে আসে। তারই স্পর্শ পেয়ে

পাথরের প্যাগোডা একবার শেষবারের মত বোনের ডাকে হাঁক পেড়ে সাড়া দিতে চায় যেন। তখনি সহসা সমুদ্র সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সে সাড়া জাগবার আগে সমুদ্রের গর্জনে স্তব্ধ হয়ে যায় বইতো নয়।

সমুদ্র আজকাল প্যাগোডার পা ধুয়ে বয়ে চলেছে। প্রচণ্ড তরঙ্গরাশি অজস্র হাসিতে লুটোপুটি খেতে খেতে পা।'র বাঁধানো পাড়ে সজোরে আঘাত হেনে ফিরে যাচ্ছে। যাবার বেলায় জলস্রোতের রুদ্র বীণায় কেমন এক অদ্ভুত সুর শোনা যায়। কে যেন ডেকে বলে, "আর কতদিন ফেরাবি মোরে!"

ঐ-দিকে তাকিয়ে মনে হয়, সমুদ্রের ক্ষুধা তো কম নয়! মানসচক্ষে ভেসে ওঠে ওরই গর্ভে অবলুপ্ত একে একে ছ'টি প্যাগোডার অতীতের উদ্ধত শির। হয়তো এমন একদিন ছিল, যখন সাতটি প্যাগোডাই সমুদ্রের সসম্ভ্রম নমস্কারকে উপেক্ষায় দূরে রাখত। তারপর রত্নাকর কালে কালে রুষে রুষে তার করাল গ্রাসে একের পর এক সকলকে লোপ করে দিতে চাইলো। কেমন করে সাতভাই চম্পার শেষ ভাইটি আজো বেঁচে রইলো সে এক পরমাশ্চর্য!

নিঃসন্দেহ, সমুদ্র দূর থেকে অনেক কাছে সরে এসেছে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে তার রাক্ষসী গ্রাসে আরো অনেকটা ভূভাগ লুপ্ত হয়ে যাবে। কে জানে আর কতদিন এভাবে ক্রমাগত তরঙ্গাঘাত অগ্রাহ্য করে সপ্ত প্যাগোডার শেষ প্যাগোডাটি দূর-দূরান্তের, সপ্তসমুদ্রপারের দর্শকদের আনন্দ দিতে সমর্থ হবে।

সমুদ্রের একদিকে মন্দির-তোরণ। তোরণটি গ্র্যানাইট পাথরে নির্মিত, ভাস্কর্যশোভিত। এই তোরণেরই পা ছুঁয়ে এখন সমুদ্রের চিরন্তন প্রবাহ বয়ে চলেছে। দূর নীলাম্বু-বক্ষ থেকে দূরপথগামী জাহাজের নাবিক দূরবীণ চোখে এ তোরণটিকে হঠাৎ দেখে না জানি কী ভাবে। সহসা তার শিরায় শিরায় রক্তধারায় কে যেন কথা কয়, ওই কি সেকালের ঐশ্বর্যশালী কাঞ্চীর বন্দর নয়?

॥ ২ ॥ কাঞ্চীর সমুদ্র-সৈকতে

সমুদ্রের রূপ দেখছিলাম। যৌবনের উন্মাদনামুখর। সহসা কানে এলো, "আপনি কি বাঙালী ?"

চমকে ফিরে চাইলাম। সাধারণ স্যুটপরা এক মাঝারি ভদ্রলোক। দেহ স্থূল, মুখে সচ্ছলতার ছাপ। দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। হাতে দামী সিগারেটের টিন। মাথার ছাঁটা-চুলে সৌখিনতার মৃদু অথচ ভুরভুরে সুগন্ধি। অবাক হয়ে চেয়ে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, এখন এত দূরে এই দগ্ধ-দিনের আসন্ন মধ্যাহ্নে কে এমন একজনকে মিলিয়ে দিল যে ছুটে এসেছে যেচে আলাপ করতে।

"কি ভাবছেন ? আসুন না ওদিকে আমার দু-একজন আত্মীয়ও আছেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।"

সৌভাগ্যের সোনালি রেখা আমার মনের আকাশে তখন চিকচিক্ করে উঠেছে। ভদ্রলোকের পিছে পিছে এগিয়ে চলেছি। প্রায় পনেরো গজ এগোতেই চোখে বিস্ময় আর ধরে না—এক দুধে-আলতা-রং বাইশটি-বসন্তের নবীনা ; সুন্দর সজ্জায় স্বাচ্ছন্দ্যে দাঁড়িয়ে মন্দিরচত্বরের ভাস্কর্য দেখছেন। তারই একটু ওদিকে এক বঙ্গ-ললনা। মুখে তাঁর মাতৃত্বের ব্যঞ্জনা। বেশ একটু ভারিক্কিও বটে।

ভদ্রলোক নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন, জানেন বোধ হয় আমি অমুকের ছেলে।

যাঁর নাম করলেন তিনি কেবল বাঙালী নন, সারা ভারতবাসীরই নমস্য। তাঁর নাম ভারতের ঘরে ঘরে সুপরিচিত। তাঁরই সাক্ষাৎ সন্তানকে সামনে পেয়ে আমার কৌতূহলের অন্ত রইল না। এমন অবস্থায় সাধারণতঃ যেমনটা হয়—একপক্ষের কৌতূহলের মাত্রাধিক্যে অন্যপক্ষের কোন কোন ক্ষেত্রে উপেক্ষাই দেখা দেয় ; কিন্তু নতুন পরিচয়ের আকর্ষণেই হোক কিংবা সুদূর প্রবাসে দেশের লোকের দর্শনের দুর্লভতার কল্যাণেই হোক অথবা বাপের গরিমা সন্তানে সামান্যমাত্র বর্তানোর

জন্যেই হোক, ভদ্রলোক অশ্রান্ত মুখরতায় আমার অব্যক্ত কৌতূহল চরিতার্থ করতে ভুললেন না।

তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হল। অমনি ভদ্রমহিলা বললেন, "শুভ্রা, কফি দাও এদিকে। ইনিও বাঙালী।"

শুভ্রা সেই সুন্দরী। স্মিত-হাস্যে হাতদুটি তুলে নমস্কার জানালেন। হাত নামাতে-না-নামাতেই তাঁর অমল মুখখানি সহসা মলিন হয়ে গেল।

সেই মুহূর্তে ভদ্রলোকটি হাঁক ছেড়ে বললেন, "হ্যালো রাম সিং, ইনি বাঙালী।" আর, আমায় বললেন, "ইনিই হচ্ছেন শুভ্রার স্বামী।"

ভব্যতার চরম পরাকাষ্ঠায় হাত দুখানি আমার কপালে ঠেকলেও রাম সিং সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। সংসারের সরস, বিরস, বিরূপ ও বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কিছু কিছু স্বাদ গ্রহণের সুযোগ ইতিমধ্যেই এ জীবনে ঘটে ওঠায় সহসা কোন কিছুতেই অবাক আর বড় একটা হই না। তাই রাম সিং-এর ভ্রূক্ষেপহীন ব্যবহার সানন্দে বরণ করে নিয়ে শুভ্রার হাতের কফির পাত্রটি গ্রহণ করে একবারটি রাম সিং-এর দিকে তাকালাম।

কোন কোন মানুষকে সহস্রের ভীড়ের মধ্যে দেখলেও মন অনায়াসে তার, একমাত্র তারই দিকে আকর্ষিত হতে দেখা যায়। মনে হয়, সে যেন কত কালের চেনা। কত যুগযুগান্তরের অদৃশ্য বন্ধনে তার আত্মায় আরেকটি আত্মা বাঁধা। আবার অতি কাছে কোন একটি বিশেষ লোককে দেখলেই নিদারুণ বিরূপতায় অন্তর বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে। যাঁরা অন্তরবাণীতে বিশ্বাস করেন তাঁরা অভিজ্ঞতায় দেখে থাকবেন, অনেক ক্ষেত্রে মনের বিরূপতা অকারণ নয়। সে যাই হোক, মানুষমাত্রেই আমার কাছে প্রিয় হোক বা না হোক, অন্ততঃ তার প্রতি এ দুটি চোখের দৃষ্টি সতত-প্রীতিব্যঞ্জক। তবু কেন যেন রাম সিং-এর কোন কিছুই এই পরিবেশে প্রীতিকর বলে মনে করতে পারছিলাম না।

এক পাশে শ্রীমতী শুভ্রা অকারণে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলেন, কম্পন তাঁর তেমন ভীষণ না হলেও অন্য ভদ্রমহিলাটির দৃষ্টি এড়াতে পারেনি।

আমার সঙ্গে ভদ্রলোক রাম সিং-এর আলাপ জমিয়ে তোলবার পণ করেই লেগেছিলেন পরিচিতি ব্যাপ্ত করতে। কিন্তু রাম সিং-এর দিক থেকে তেমন সাড়া পাওয়া গেল না। সুতরাং ভদ্রলোক ইংরেজী ছেড়ে বাংলায় বুঝাতে চাইলেন, রাম সিং মোটেই মন্দ নয়। দিব্যি ভালো ছেলেই তাকে বলা যায়। পাছে কেউ এতে সন্দেহ করে তাই তিনি এ-ও জানালেন, রাম সিং বাপের একমাত্র ছেলে। আর তাদের সেদিন পর্যন্তও শরাবের যা ব্যবসা ছিল, এদেশে 'প্রোহিবিশন' না হলে ওরা তো প্রতি রাতে লাল-জল বেচেই নিতি নিতি লাল।

ও তাই বলুন! তাহলে মদের ব্যাবসাদারকেই শুভ্রাদেবী বিয়ে করেছেন ?

বিয়ে করেছেন মানে! এই বিয়ের জন্যে ভাগ্নীটি আমার চারদিন উপবাস করে পড়ে ছিল। সে আর বলেন কেন, বিধাতাপুরুষেরও সাধ্য নেই যে মেয়েদের মন বোঝে।

কেন বলুন তো।

না এমনিই বলছিলুম।

ভদ্রলোক এমন এক রহস্যের ইশারায় এসে থামলেন যেখানে প্রশ্ন করা চলে না অথচ অজস্র প্রশ্ন উকিঝুঁকি দিতে থাকে। থাক্ গিয়ে। কোথাকার কোন্ সুন্দরী শুভ্রা কোন্ এক রাম সিংকে বরণ করবার জন্য চার-চারদিন উপবাস করে ছিল, আর আজ সেই রাম সিং-এর উপস্থিতিতে অন্য লোকের সামনে সে ম্লান মুখে কাঁপেই বা কেন, কি কাজ তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে। এমনি কত কি তখন মাথায় কিলবিল করছিল, এমন সময় রাম সিং ভদ্রলোকটির কাছে জানতে চাইলে, আর কতক্ষণ এখানে এভাবে কাটাবেন।

আমি আমার কাজে চললাম। অর্থাৎ সমুদ্রসৈকতের এই মন্দির-অভ্যন্তরে দর্শনের আশায় ঢুকে পড়লাম।

একটু থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। পূজারী কোথায়? এই মন্দিরে এককালে অগণিত ভক্তদের কর্ণ পরিতৃপ্ত করতে যে নাদেশ্বর কর্ণাটিক

বেহাগের সুর তুলত, সেই বা কোথায়! পল্লব রাজত্বের আমলে এখানে দিনরাত্রি পূজারতির ঘটা দেখতে সপ্ত সাগরের দর্শনার্থীর সমাবেশ হত—তারই বা চিহ্ন কোথায় গেল! আসন্ন সন্ধ্যায় সাগরপারের পণ্যবাহী অর্ণবপোতের মাস্তুল শীর্ষে আলো জ্বলতে না-জ্বলতে যে-সকল দেবসেবায় উৎসর্গীকৃতা দেবদাসী ঘৃতদীপ-হাতে এ মন্দিরে আরতিকার আয়োজন করত তাদের শেষ নিঃশ্বাসের রেশটুকুই বা কোথায় হারালো!

পূজো দেবেন?

যার কণ্ঠস্বর তার দিকে চোখ ফেরাতে দেখা গেল, ব্রাহ্মণত্বের দিনশেষের এক প্রেতাত্মা। কোথায় গেছে সেই ভীষণ প্রতাপ, কোথায় বা সে সুদিনের স্বাক্ষর, যেদিন পূজারীর পাদোদক পর্যন্ত প্রচণ্ড শক্তিধরের পূজা পেত। আর আজ মনু, পরাশর, অগস্ত্য, বিশ্বামিত্রের বংশধর দেবতার পূজার জন্যে কাকুতি করে ফিরছে। পরনে কতকালের মলিন চীর। শরীরে বুভুক্ষার সুস্পষ্ট ক্ষতচিহ্ন। চোখে-মুখে অসহায়তার চরম ছাপ। দেখলে দুঃখ হয়। বুকে ব্যথা বাজে। মনে প্রশ্ন জাগে—এ কোন্ পাপের শেষ পরিণাম।

মন্দিরের ভেতরে চোখ বুলিয়ে দেখি, পূজার পরিবেশ কোথাও নেই। কতদিন এ মন্দিরে আসীন শিবের মাথায় পড়েনি একটিও নাগকেশর। জ্বলেনি প্রদীপ। পোড়েনি ধূপ। জোটেনি দেবতার নৈবেদ্য। কবে কোন্ ধর্মভীরু কেউ এসেছিল, শিবের চরণতলে রেখে গেছে কয়েকটি বেলফুল। দিনের পর দিন রুদ্রের দারুণ নিঃশ্বাসে সে ফুল শুকিয়ে পড়ে আছে। তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে তবু তাকে তুলে সাগরের জলে শেষ উৎসর্গ করবার কোন লোক জোটেনি।

যে লোকটি পূজার কথা বলেছিলেন তিনি সমানে আমার পেছু লেগে রইলেন। মনটা আর্দ্র হয়ে ওঠায় তাঁকে বললাম, পূজার আয়োজনে ঠাকুরমশাই কি কি প্রয়োজন?

ঠাকুরমশাই ছুটে গিয়ে কোথা থেকে একটু কর্পূর আর একটা নারকেল নিয়ে এলেন। দীনের দেবতা শিবের পূজায় এর বেশী

আর কি-ই-বা চাই! শ্মশানে-মশানে যাঁর বাস, ভিক্ষান্নে যাঁর জীবিকা, ধুতরোর ফুলে যাঁর কানের কুণ্ডল, গায়ে ভস্ম, বেলপাতায় তুষ্ট, সে দেবতার পূজার দাবি অতি সামান্য। নেহাৎই সাধারণ মানুষের প্রাণের দেবতা শিব। তাই তার 'খাই-খাই' নেই। তাই কালোবাজারের রাজাগজার আমলে আর যে দেবতারই কদর থাক্, দেবাদিদেব শঙ্কর সোৎসাহে পরিত্যাজ্য।

সাদামাঠা পূজো। পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের বালাই নেই—জাঁকজমক হাঁকডাক নেই, রাজভোগ নেই, ষোড়শোপচার নেই—শুধু পাথরে ঠুকে নারকেলটা ভেঙে তার জলটুকু শিবের মাথায় দিলেই শিব সন্তুষ্ট। যে কর্পূরটুকু এসেছিল সেটুকুও শিবের ভাগ্যে না জুটে জুটল গিয়ে এই মন্দিরের পেছনে শয়ান অনন্তশয়ন বিষ্ণুর কপালে।

মধ্যদিনে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে অনন্তশয়ন বিষ্ণুর সমুখে কর্পূর জ্বেলে পুরোহিত আরতি সেরে সেই আলো দেবতার মুখের কাছটাতে ধরে মনে মনে কি মন্ত্র পড়ে গেলেন। তার একটি অক্ষর স্ফুট না হলেও কেমন যেন এক অব্যক্ত অনুভূতি সাময়িক ভাবে সমগ্র প্রকোষ্ঠটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

অদ্ভুত! সমুদ্রের আওয়াজ এখানে একেবারেই থমকে গেছে। আমাদের দুটি প্রাণীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যায়—এমনি নিস্তব্ধতা। তবে কি রত্নাকরের প্রাণস্পন্দনেরও এখানে প্রবেশ নিষেধ! না, মাত্রাতিরিক্ত তরঙ্গচিৎকার শান্ত-সমাহিত মন্দিরের শান্তিভঙ্গকারী বলেই তার প্রতি দেবতার আদেশ, সে যেন এখানে এসে হট্টগোল না করে! অথবা স্থপতির এ এক অনন্যসাধারণ স্থাপত্য-কীর্তি!

অতি সঙ্কীর্ণ মন্দিরাভ্যন্তরের দেওয়াল-ঘেরা পথ দিয়ে কয়েক পদ অগ্রসর হতেই আবার সেই সমুদ্রগর্জনে কর্ণ বধিরপ্রায়। বাইরে এসে দেখি রাম সিং-রা নেই—কেবল দাঁড়িয়ে আছেন বয়স্কা ভদ্রমহিলা।

কোথায় গিয়েছিলেন ?

মন্দিরে পূজো দিতে।

ভদ্রমহিলা বিস্মিত হয়ে বললেন, এখানে আবার পূজো দেয় নাকি !

দু-একজনে দেয় বৈকি।

আপনার বুঝি দেবতার প্রতি অসীম ভক্তি !

বিপদে ফেললেন দেখছি।

তাহলে আর জানতে চাই না। আচ্ছা, আপনি কিছু মনে করবেন না—রাম সিং-এর ব্যবহারের জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত।

কোন্ রাম সিং-এর কথা বলছেন বলুন-তো ?

এরি মধ্যে ভুলে গেলেন ! কেন আমাদের ভাগ্নীজামাই—

তাই বলুন। কিন্তু……

আপনি অবশ্যি মনে কিছু না-ও করতে পারেন। হয়তো করেনও-নি। কিন্তু লোকটির ব্যবহারটা দেখলেন তো—এমন লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা না করলে আর আমাদের চলত না। আমার তো রাতদিন শরীরের মধ্যে রি-রি করে জ্বলে—এই বিদেশে আপনাকে পেলাম বলেই বলছি, ও লোকটা সুবিধের নয়।

আমি বাধা দিলাম, ঘরের কথা পরকে না বলাই উচিত।

বাধা পেয়ে ভদ্রমহিলা থামলেন তো নাই, বরং একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তারপর বলতে লাগলেন, আপনি আমার দেশের মানুষ, আপনি হলেন পর ! আর ঐ কোথাকার কোন্ শরাব-বেচা লোকটার সঙ্গে ভাগ্নীর ভুল করে একটা [illegible] হয়েছে বলে তার সকল অসভ্যতা সহ্য করতে বলেন ? সহ্য করতে পারিনি বলেই কর্তাকে বললাম, তোমরা এগোবে এগোও আমি মায়ের মুখে শেখা বুলিতে দুটো কথা কয়ে বাঁচি।

ওঁরা সবাই আপনাকে ফেলে চলে গেলেন !

চলে যাবেন কেন। ঐ যে মোটরে বসে ডাব খাচ্ছেন।

চলি।

কোন্‌দিকে যাবেন ?

কাছেই পুরোহিত মশাই দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি আভাসমাত্র বুঝে নিয়ে ভাঙ্গা হিন্দীতে জানালেন যে, যেতে হবে পঞ্চপাণ্ডবের রথ দেখতে। আমিও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম।

সে কি, আমাদের সঙ্গে আসবেন না ?

আপনারা রথী, আমি পদাতিক। এগোতে থাকি, দেখা হবে।

কিছু মনে করবেন না। মনের ভুলে বেফাঁস কিছু বলে ফেললে জানবেন, জ্বালাতন না হলে কখনো কোনো কথা এমুখ থেকে বেরোয় না।

আপনাকে দেখে তো মনে হয় না তেমন কিছু জ্বালাতন কখনো হয়েছেন।

বাইরে থেকেই দেখতে অমনি। আমার ভাগ্নীটিকেও তো দেখলেন, বলতে পারেন ও কত সুখে আছে ?

মন্তর-টন্তর জানিনে।

মন্তর যাঁরা জানেন তাঁরাও বলতে পারবেন না। জানেন অমন সীতার মত লক্ষ্মীকে আমার বাংলায় কথাটি পর্যন্ত বলতে দেয় না।

উনি হয়তো বলতে চানও না।

না চায় না—! ওরাই ওর মাতৃভাষা ভুলিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত।

তাই বলুন। এতে আপনি বিচলিত নাই বা হলেন।

কি বলছেন! বিচলিত হব না! মাতৃভাষা মেয়েতে ভুলে যাবে তবু বিচলিত হব না! আপনি পাগল না ক্ষ্যাপা!

বহুকষ্টে ভদ্রমহিলার হাত এড়িয়ে পঞ্চপাণ্ডবের রথের দিকে চলতে চলতে কেবলি চিন্তা করছিলাম, কে পাগল আর কেই বা ক্ষ্যাপা! মনে পড়ল কয়েক বছর আগের কথা। উত্তর ভারতের হাজার কয়েক মাইল ঘুরে ঘুরে সন্ধান করে ফিরেছিলাম প্রবাসে প্রবাসী বাঙালীর মাতৃভাষা কতটা টিকে আছে। বেনারস, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ এসকল জায়গায় প্রবাসী বাঙালীর সংখ্যা মোটেই কম

নয়। তাদের তরুণ সমাজে বাঙালীর মাতৃভাষা বাংলা আজকাল যে রূপ ধারণ করেছে সে-রূপসজ্জায় মা সরস্বতীকে সাজালে অনেকটা ঢাকাই, মুর্শিদাবাদী, নদীয়া, ফরাসডাঙ্গার শাড়ির পরিবর্তে লক্ষ্ণৌর চুড়িদার পাঞ্জাবী ও দোপাট্টায় সাজাতে হয়। অনেকে বলেন, এটা কিছু মন্দ নয়! তবে ভয় হয় ক্রমে ক্রমে প্রবাসী বাঙালীদের জীবনে সে দিন না এসে যায়, যে দিন দিকে দিকে রাম সিংয়ের দল শুভ্রাদের মাতৃভাষায় কথাটা বলবার অধিকারটুকু পর্যন্ত নানা প্রকারে লব্ধ জোরের অত্যাচারে হরণ করে না ছাড়ে।

॥ ৩ ॥ পঞ্চপাণ্ডবের রথের রাজ্যে

মধ্যদিন। মাথার 'পরে প্রচণ্ড সূর্য। চারদিকে আলোর প্রাচুর্যে যেন আগুন জ্বলছে। প্রাচুর্যের একটা ভীষণ বিপদ আছে। অনেক ক্ষেত্রে সে ব্যসনে গিয়ে দাঁড়ায়, যার পরিণাম শুভ নয়। যাঁরা ইউরোপে গেছেন তাঁরা বলেন, ঐ ইউরোপের যে অংশটায় ইংরেজদের বাস, যে ইংরেজ দু'শত বছর ধরে বিশ্বের সুবিশাল সাম্রাজ্য সংগঠন ও শাসনের সৌভাগ্য লাভ করেছিল, সেই ইংরেজের নিজের দেশ ইংল্যাণ্ডে কেবল যে সূর্যালোকের অপ্রাচুর্য তাই নয়, তার চারিদিকে অপ্রাচুর্যের অজস্র ছড়াছড়ি। ফল কিন্তু শুভই বলতে হবে। প্রকৃতি বিরূপ, কাজেই প্রত্যেকে হল কর্মঠ। বছরের অনেককাল আকাশে মেঘের দৌরাত্ম্য, তাই আলোর জন্যে তাদের কত অভিযান। আর এদেশে সেই সূর্যের দান আলোক হল আগুন। প্রাচুর্যের আগুনে জ্বলে গেল ক্ষেত খামার, শুখালো নদী-নালা, দীঘি-সরোবর। সমানে মরুর অজগর এগিয়ে এলো সবুজ শস্যঘেরা জমিকে গ্রাস করতে। প্রথম দিকে হয়তো এ আগুন নেভাতে প্রয়োজনমত জলের ছিল আয়োজন। কালক্রমে বর্ষার জল-ঝরাও বন্ধ হল। সেই থেকে শস্য-শ্যামলা মাটি বন্ধ্যা।

পথের দু পাশে আজ শুধু ধূ ধূ বালি হা হা করে হাসে। সেই হাসির উল্লাসে দুর্জয়-প্রাণ বুনো ফুলগুলো কেঁপে কেঁপে ওঠে। ওদের মরুবিজয়ী জীবন বুঝি ত্রাসে সন্ত্রস্ত।

যে দুটি-চারিটি স্থানীয় নর-নারী পথ চলতে চোখে পড়ে, তাদের দিকে তাকাতে পারা যায়, কিন্তু তারাই কি কাঞ্চী দেশের বন্দর-নগরী মহাবলীপুরমের সেকালের প্রবল প্রতাপান্বিত শাসক ও সমাজবিধাতাদের প্রতিনিধি, উত্তরপুরুষ? এ প্রশ্ন সকল পান্থেরই মনে জাগে। মনে জাগে বলেই ভাল করে চোখ খুলে দেখে নিই। হায়, সে সুগঠিত শরীর কোথায়! কোথায় গেল কর্মক্ষম

স্বাস্থ্য! কোথায় বা গেল বিশ্ববিজয়ী সৃষ্টিযজ্ঞের সুমহান পরিকল্পনার যোগ্য মস্তিষ্ক!

এদের দেখতে অনেকটা দুঃস্থ ছিন্নমূলদেরই মত। মাথায় এরা সাধারণ বঙ্গ বা উৎকলবাসীর সমান উঁচু, গায়ে প্রায় তাদেরই মত। তবে বুকের মাপে একটু কম। চোখ দুটো জ্যোতিহীন, কোটরগত। বাহুতে বলের চিহ্নটুকু নিঃশেষ। পথ চলছে সে যেন নেহাৎই দায়ে। কথা বলছে বড় বেশি তাগিদে পড়ে। দু' আনায় একটা ডাব খেয়ে চার পয়সা বখশিস দিলে এদের নিষ্প্রাণ চোখে যে হাসির ঝিলিক দেখা দেয়, সে দেখলে সহসা এরা স্বর্গ পেয়েছে বলেই ভ্রম হয়।

কি মেয়ে কি পুরুষ সবারই দশা সমান। যাঁরা মা হয়েছেন, তাঁরা কেমন করে এখনো যমকে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে আছেন সেটাই আশ্চর্যের। রূপ যৌবন কবে কোন্ ফাগুনে এদের চিরবঞ্চিত করে পালিয়েছে, সেই সত্যটুকু জানবার সুযোগটা পর্যন্ত এঁরা পাননি।

এদের সঙ্গে অবশ্যি মাদ্রাজ-মহানগরীর নর-নারীর তুলনাই চলে না। কোথায় আকাশ আর কোথায় পাতাল। নগরীতে দুঃখ-দারিদ্র্য নেই এমন কথা বলা সত্যের অপলাপের সমান। তবে সেখানে সম্পদ সম্বল সাড়ম্বরে যেন টলমল। আর এখানে দারিদ্র্য নিদারুণ, নিষ্ঠুর, নির্মম, নিশ্চল।

পুরোহিতের সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবদের রথের কাছটাতে এসে পড়তেই নজরে পড়ল সেই চিংগেলপেট থেকে ওঠা বাসযাত্রী দলটি এখানে দিব্যি জমিয়ে বসেছে। সংখ্যায় এরা বেশি নয়, মাত্র তিনজন। জঙ্গলের হাতী যখন জল খেতে আসে তাদের দল দেখলে দর্শকমাত্রেই যেমন অনুমান করতে পারে, এদের দেখে তেমনি মনে হয়। বাপ মা আর কন্যায় মিলে একটি দল।

তন্বীর কেশভার কাটা। ভাবভঙ্গীও "বব্‌ড হেয়ারের" গোত্র ঘেঁষে যায়।

সে যাই হোক, আমার চোখ ততক্ষণে আকর্ষণ করেছে একখানি বাংলাঘরের চৌচালে। চৌচালটি আবার বাঁশের বা কাঠের বাতায়

নয়। ছাউনিও তার না গোলপাতার, না খড়ের, না শণের। এমনকি টিনেরও নয়, ইঁটেরও নয়। একদম গ্র্যানাইটের।

গ্র্যানাইট পাথর কেটে খণ্ড খণ্ড করে গাঁথা চৌরিঘর হলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু এ তো পাথরখণ্ড দিয়ে গাঁথা নয়। এর ভিত থেকে মাথা পর্যন্ত আগাগোড়া নিরবচ্ছিন্ন সুষম সৌন্দর্যে এক গ্র্যানাইট পাহাড় কেটে কুঁদে তোলা এ বাংলা চৌচালা ঘরখানা।

কে এ ঘরের স্রষ্টা! সে সৃষ্টিকর্তার কোথায় বা ঘর, কোথায় বা তার শ্মশান কিংবা কবর! সে একদিন ছিল সুনিশ্চিত, নইলে এ চৌরিঘর এল কোথা থেকে! মাথা না থাকলে মাথাব্যথা হবার কথা নয়। বাংলার স্থপতি এই তামিলনাদের কাঞ্চী রাজত্বে না এলে তার বন্দর-নগরীতে বাংলার চৌরিঘর এল কোন্ ভানুমতীর কুহকে! হতে পারে বাংলার স্থপতি তার জ্ঞানীগুণী সুধীজনের মত সেকালে ছড়িয়ে পড়েছিল সুদূর দক্ষিণে। ইতিহাস গোপাল, ধর্মপালের,—শীলভদ্র-দীপঙ্করের, এমনকি বিজয় সিংহেরও কীর্তি-গাথার স্বাক্ষর প্রোজ্জ্বল অক্ষরে বক্ষে ধারণ করে রেখেছে। এঁদের কেউ রাজা, কেউ শিক্ষাব্রতী, কেউ বা দিগ্বিজয়ী উপনিবেশ স্থাপয়িতা। কিন্তু কালে কালে দেখা গেছে ইতিহাসের স্বীকৃতি শিক্ষাব্রতী পর্যন্ত পৌঁছালেও শিল্পী, স্থপতি ও ভাস্করকে এদেশে গ্রাস করেছে রাজা-মহারাজা, রাজ-অমাত্যের দল। তাই তাজমহলের অন্তরে মমতাজ নারী, বাহিরেতে সাজাহানের সুযশ; কিন্তু কেউ জানে না কে সে পরমাশ্চর্যের প্রকৃত স্রষ্টা। 'বাদশানামায়' যে শিল্পীদের নাম পাওয়া যায়, সত্যিমিথ্যে যাই হোক, সে নামগুলি মোটেই সাধারণের কাছে সুপরিচিত নয়! অথচ সবাই জানে, সারা পৃথিবীতে তাজমহলের স্রষ্টা হিসাবে সম্রাট সাজাহানই পূজা পায়। সাহির লুধিয়ানজী সাধে কি বলেছেন:

> "এক শাহানশাহ নে
> দৌলৎ কা সাহারা লেকর
> উড়ায় হ্যায় গরীবোঁ কী মহব্বৎ কী মজাক
> ঐ মেরে মহবুব: কহীন্ ঔর মিলাকর মুঝসে।"

পুরোহিতের কথায়, এই পাথরে কুঁদে তোলা চৌরি-ঘরখানার পুরাতাত্ত্বিক নাম, দ্রৌপদীর রথ। পাঞ্চাল-দুহিতা দ্রৌপদী রাজপ্রাসাদ, রাজকীয় সমারোহ, কত কি ছেড়ে এই যে চৌরি-ঘরখানি পছন্দ করেছিলেন, পাঞ্চালীর পছন্দের তারিফ করতে হয়। আর কেবলি মনে হয়, সুদূর বাংলার সে অখ্যাত অজ্ঞাত কুশলী স্থপতি কিংবা তাঁরই কোন শিষ্য, যিনি এই চৌরি-ঘরখানিতে ভাস্কর্যের রূপ দিয়েছিলেন, তিনি ও তাঁর বংশধরেরা কোথায় কি করে অবলুপ্ত হয়ে গেলেন !

পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই। মহাভারতে পাই—নকুল-সহদেব দুজনেই অঙ্গাঙ্গী ভাই। এখানে তাই দ্রৌপদীর রথের একসারে তৃতীয় পাণ্ডব, ভীম ও ধর্মরাজের রথের পরে এধারে পাঞ্চালীর দরজার কাছে যূথপতি করীর পাশে রয়েছে সহদেবের রথ।

অঙ্গাঙ্গী দুটি ভাইয়ের ভাগ্যে একটি রথই জুটেছে। এখানে নকুল নিঃস্বার্থ না হলেই দর্শকের বিপদ। কারণ, দ্রৌপদীকে একটি স্বতন্ত্র রথ না দিলে গার্হস্থ্য ও দাম্পত্য জীবনে যেমন বিড়ম্বনার সম্ভাবনা, তেমনি এখানকার এই সুদৃশ্য স্থাপত্যের পাঁচটি নিদর্শনকে পঞ্চপাণ্ডবের রথ বলে চালিয়ে দেওয়াও চলে না। তাই নকুলের সহদেবের সহবাসী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর কোথায়।

কিন্তু সহদেবের রথটি দৃষ্টি আকর্ষণের পক্ষে চমৎকার। এ রথের চালটি আবার অদ্ভুত। হঠাৎ দেখলে একখানি ছই ওলটানো টাবুরে নৌকো বলে ভ্রম হয়। ভাল করে দেখতে দেখতে এক সময় চোখে পড়ে, রথের চালটা হাতীর পিঠেরই মত। তাই সম্ভবতঃ এরই পাশে সাদৃশ্য হিসাবে সেকালের স্থপতি প্রকাণ্ড একটি পাথুরে হাতী দাঁড় করিয়ে রেখেছেন।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য দুই পিঠোপিঠি ভাই। একটিকে ছেড়ে আরেকটি বহুকাল পর্যন্ত অন্য কোথাও কখনো যেতে রাজী যে হত না, তারই নিদর্শন এখানকার রথে রথে। অবশ্যি এখন কাল পালটে গেছে।

দ্রৌপদীর রথের পাশেই একই সারে পর পর তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম

পাণ্ডবের রথ। তৃতীয় পাণ্ডবের রথটি যেমন স্তরে স্তরে সারি সারি ক্রম-উর্ধ্ব গম্বুজ বিমানে মাথা পর্যন্ত উঠে গিয়ে একটি গম্বুজে-মটকায় শেষ হয়েছে, ধর্মরাজের রথটি তারই অনুরূপ কিন্তু আকারে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। আর মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের সুবিশাল বপুর ন্যায় ভীমের রথখানি আয়তনে অনেক বেশী জায়গা জুড়ে আছে।

প্রত্যেকটি রথের গায়ে নানা ভাস্কর্য যেন অলঙ্কার পরিয়েছে। এই অলঙ্কারগুলি আবার আনাড়ি ও অভিজ্ঞ-কুশলী ভাস্করের হাতের সৃষ্টি। তাই রূপরসের মাপকাঠিতে অনেকগুলির খাদ ধরা পড়লেও দু-একটি ভাস্কর্যের অনন্য সৌন্দর্যে ও অনিন্দ্য সৃষ্টিতে বিস্মিত হতে হয়।

যতই দেখা যায় ততই মনে হয়, হয়তো এই-যে একটি অখণ্ড পাহাড় পাঁচ-সাতটি খণ্ডে বিভক্ত করে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন সৃষ্টি, এ কোন এক কালের শিল্পীর খেয়াল মাত্র নয়। অনুমান হয়, সম্ভবতঃ সেকালে এখানে কোন বৌদ্ধবিহার গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। সেই বিহারে নালন্দা বিক্রমশিলার মত নানা দেশের বিচিত্র ছাত্রদল সমবেত হয়ে থাকবে। তাদের জন্যে কেবলমাত্র এখানে শাস্ত্র ও দর্শন শিক্ষার ব্যবস্থাই ছিল না, আয়োজন ছিল স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিক্ষারও। তাই পঞ্চপাণ্ডবের রথে আনাড়ি হাতের পাশাপাশি কেবল কুশলী হাতের হাতুড়ি-বাটালির স্বাক্ষরই নয়, নানা দেশের বৈচিত্র্যময় স্থাপত্যের সমাবেশ এখানে সহ-অবস্থানে দেখতে পাওয়া যায়।

মনে পড়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় কোথায় যেন লিখেছিলেন—"বুড়ো মানুষে না হয় একশত দেড়শত বৎসরের কথা বলিবে, ইহার অধিক হইলে বলিবার মানুষ পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। লেখায়পড়ায় রাখিয়া গেলে সে কথা অনেক দিন থাকে সত্য, কিন্তু যে জিনিসে লেখা হয়, সেতো আর বেশি দিন টিকে না। কাগজ আট নয়শত বৎসর টিকে, তালপাতা বার-চৌদ্দ শত বৎসর টিকে, ভূর্জপত্র পনেরো-ষোল শত বৎসর টিকে, পেপিরস না হয় দু' হাজার বৎসর টিকিল। ইহার অধিক দিনের কথা শুনিতে গেলে কাহার কাছে শুনিব, পাথর ভিন্ন অন্য উপায় নাই।"

যুগে যুগে মানুষ তার মনের কথা পাথরে কুঁদে পাথুরে গাথায় পেছনে ফেলে রেখে মৃত্যুর পরপারে পাড়ি জমিয়েছে। স্রষ্টা চলে গেলে তাঁর সৃষ্টি বিগত স্রষ্টাকেই স্মৃতিভারে বহন করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নতুন কালের মানুষদের মনে নতুনভাবে কৌতূহলের আজো যে বীজ বপন করে চলেছে, সে বীজ ভাবী বনস্পতিরই।

কিন্তু কবে থেকে এই পাথরে গাথা রচনার আরম্ভ, সে কে বলে দেবে! পৃথিবীর নানা দেশে গুহাসভ্যতার নানা পর্যায়ের ইতিহাসের আদি-অন্ত এই বিংশ শতাব্দীর সহজ জ্ঞানবিস্তারের যুগেও সাধারণের কাছে যেমন দুর্লভ তেমনি রহস্যভরা। কবে অজন্তা ইলোরায়, বাগ-গুহায় গুহামন্দির-কেন্দ্রিক সমাজ-সভ্যতার প্রথম প্রভাতোদয়, কখন বা তার মধ্যাহ্ন, কখন অপরাহ্ন—সে ঠিকুজী কে সবার চোখের সামনে মেলে ধরবে!

মহাবলীপুরমের এই যে পঞ্চপাণ্ডবের রথ, কেমন যেন মনে হয়, এ তো রথ নয়। রথ যদি হবে, তার চাকা তো থাকবে। কোথায় সারথি, কোথায় বা রথী, রথ যে টানবে সেই প্রচণ্ডশক্তি অশ্ববাহিনীই বা কোথায়!

রথ না বলে এগুলিকে বলা চলে 'গুহাগেহ'। পরিপূর্ণ বাসগৃহ এ নয়, তবে কি এ চৈত্যবিহার? চৈত্যবিহার সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ হবার আগেই এ অঞ্চলে আঞ্চলিক রাজপ্রতাপে কোনো পরিবর্তন ঘটে থাকবে। পৃথিবীর দিকে দিকে রাজশক্তির ছত্রছায়ায় যুগে যুগে ধর্মের উত্থান-পতন। তারই কোনো এক অঘটনের রথচক্রতলে এই মহাবলীপুরমে যেদিন বৌদ্ধধর্ম রাজাশ্রয় হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, সেদিন শিবের ধর্মধ্বজা নিয়ে এখানে যে অভিযাত্রীদের দল ছুটে এসেছিল তাদের প্রবল প্রতাপের পদতলে বৌদ্ধ যুগের শেষ পতাকাবাহী শিল্পী সন্ন্যাসীদল আত্মদানে হাড়ের আবাদ করলেও বিস্মিত হবার কিছু নেই। তবে সভ্যতার সৌভাগ্য, নবাগত শক্তিমানেরা সেকালে কালাপাহাড়-ব্রতের অনুরাগটা অনেকটা তুচ্ছ করেছিলেন। পুরোপুরি যে করতে পারেননি, তারই প্রমাণ

অতীতের বৌদ্ধচৈত্য নতুন শক্তির আওতায় আখ্যাত হয়েছিল প্রথমটা শিবের পরিবারের বিহার হিসাবে। পুরনো কিংবদন্তী বলে, এই পাঁচটি মন্দিরে স্বয়ং শিব, পার্বতী, গণেশ ও কার্তিক অধিষ্ঠান হয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন রয়ে গেল, এঁরা তো হলেন চারজন, পাঁচটি মন্দিরের প্রয়োজন কি করে হল! তারও উত্তর মিলে গেল। কিংবদন্তী বলল, অবশিষ্টটি শিবের বাহন স্বয়ং নন্দীর।

এ কিংবদন্তী বেশ কিছুকাল আসর মাত করবার পর বিপদ দেখা দিল অন্যদিক থেকে। অনার্য দেবতা শিব—আর্যরা আস্তে আস্তে তাঁকে ভদ্রস্থ করে, চাটুকারিতার মন্ত্রে বশীভূত করে একদিন বিষ্ণুকে এনে হাজির করলে আর্যাবর্ত থেকে এই দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রতটে। সঙ্গে সঙ্গে শিবের দিন ঘনিয়ে আসতে লাগল। কালে কালে আর একদিন নূতন কিংবদন্তীর উৎপত্তি হল। আদিম কিংবদন্তীকে স্থানচ্যুত করে এই নবীন হাঁক ছেড়ে বললে, এগুলি সব কৃষ্ণসখা পাণ্ডবদের। এখন, পাণ্ডবরা তো মানুষ। কৃষ্ণকে দেবতা বলে দেশ মানলেও, অসাধারণ মানুষের উপরের-স্তরে পাণ্ডবদের পদোন্নতি সর্বস্বীকৃতি না পাওয়ায় যে চৈত্যবিহার এককালে শিব-পরিবারের অধিষ্ঠানের আসন বলে খ্যাত হয়েছিল, পরবর্তীকালে লোককথায় তাই পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়িয়েছে গিয়ে পঞ্চ পাণ্ডবের রথে।

আরো পরে একদিন দ্রৌপদীর রথের অনুরূপ স্থাপত্য অন্যত্রও দেখা দিয়েছিল। ভীমের রথের ক্রমবিবর্তনে একদিন দক্ষিণের গোপুরম, শোনা যায়, রূপ নিয়েছিল।

পঞ্চ পাণ্ডবের এই এলাকার শিল্পকর্মগুলিকে রথ, মন্দির, গেহ কিম্বা চৈত্য যাই বলা হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত এগুলিকে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সুপ্রাচীন নিদর্শনরূপে গ্রহণ করলেই সম্ভবতঃ সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হয়। হতে পারে, এই নিদর্শন সৃষ্টিতে নানা ধর্ম ও ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার হাতের ছাপ পড়েছে। কিন্তু এ যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের পাঁচটি উজ্জ্বল প্রদীপ, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

॥ ৪ ॥ পাহাড়ের গায়ে প্রাণের কাব্য

বেলা বাড়ছিল। বিদেশী পর্যটক সিনি—ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত। 'টেকে'র পর 'টেক' নিয়েই চলেছেন। কাছে যেতেই ক্যামেরা তুলেই বিমুগ্ধ দৃষ্টি মেলে সপ্রশংস সুরে নিজের বিস্ময় প্রকাশ করে বসলেন ঃ একটু জোড়া নেই, ভাঙা নেই—ঠিক যেন ছাঁচে-ঢালাই। প্রকাণ্ড একখণ্ড পাথর কুঁদে এমন সুন্দর স্থাপত্যছন্দ গড়ে তোলা সত্যিই বিস্ময়কর।

পুরোহিত মশাই চলবার তাগিদ দিতে লাগলেন। আমি আবার এগিয়ে চললাম একই পথ দিয়ে, সেই যে-পথ দিয়ে এসেছিলাম।

কোন্ ভোরে দু'টি রুটি মুখে দিয়ে পথে বেরিয়েছিলাম, মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হলেও এখনো কিছু আর পেটে পড়েনি। পুরোহিত মশাইকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যাটার কথা বলতেই তিনি এক রকম সোৎসাহে লাফিয়েই উঠলেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ 'টুটি-ফুটি' হিন্দীতে জানালেন, সেজন্যে ভাবনার কিছু নেই। কাছেই হোটেল। গেলেই খাবার।

কি চমৎকার! এই-তো চাই!

হোটেল বলতে যাঁরা গ্রাণ্ড, ব্রিস্টল, গ্রেট ইস্টার্ন, তাজমহল, কনিম্যারা, এ্যামব্যাসাডার বোঝবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছেন, তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে হতাশ হবেন না। কারণ একালের মহাবলীপুরম নেহাৎই একটি গণ্ডগ্রাম। এখানে স্থানীয় মানুষের যা উপার্জন সে কেবল ডাব বেচে, পুরনো প্যাগোডার খ্যাতি কুড়িয়ে কুড়িয়ে অক্লেশে দূরাগতদের উপহার দিয়ে। সামান্য যে কয়েক ঘর মানুষ কালের করাল কুটিল চক্রান্ত-গ্রাস অস্বীকার করে এখনো একালের মহাবলীপুরমে ঘর বেঁধে বাস করছে, তাদের দৈন্য সোনার দেশের সকলকে লজ্জা দিতে পারে। এমন জায়গায় হোটেল বাইরের দর্শকের উপর নির্ভর করে চালাতে আসবে কোন্ ওবেরয় কিংবা টাটা? তাই এখানকার স্বল্পপুঁজিসম্বল সামান্য হোটেলওয়ালা নামে হোটেল, আসলে ছোট্ট একটি ডালভাতের আস্তানা আগলায়।

যেদিন দর্শকের ভীড় হয়, সেদিন তুটি পয়সা পায়। যেদিন ভীড় হয় না, সেদিন হতাশ মনে হয়তো তার হোটেলটি তুলে দেবারই মতলব আঁটে বসে বসে।

সোনার ভারতের স্বর্ণছন্দের তলে তলে দারিদ্র্যের তীব্র স্রোতে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত যে দীনদরিদ্র ভারত, তার প্রায়-অবলুপ্ত জনপদে যে ধাঁচের হোটেল ভারতের অন্যত্র মেলে এখানকার হোটেলটি তারই সগোত্র।

খাবার 'মেনু'ও সাদামাঠা। পদগুলোর নাম পদাবলীর মত মিঠে না হলেও রসবিহীন নয়। বাংলা দৈনন্দিন ডালের মাঝে মানানসই তরকারি, তাতে একটুখানি তেঁতুলগোলা—এরই নাম সম্বর। সম্বরের পরে যে পদার্থটি পরিবেশিত হল তার নামটি—রসম্। তামিলনাদের ভোজ্য-তালিকায় সম্বর-রসম্ বাদ পড়বার নয়। পুরাকালে সেরা সেরা মুনি-ঋষিরা সোমসারের সাংঘাতিক ভক্ত ছিলেন বলে শোনা যায়। একালের তামিল সংসারীরা রসম্‌কে প্রায় সোমসারের মত দেখে থাকেন।

পাশাপাশি তুটি পাতে পুরোহিত মশাই আর আমি। তিনি রসম্ দিয়ে চটকে ভাতকে পাতলা ক্ষীরের মত করে হাতের মণিবন্ধ পর্যন্ত পাতার উপরে সেঁটে চটপট হাপুস-হুপুসে এমন এক তৃপ্তির আওয়াজ তুলে আহার চূড়ান্তভাবে সমাপ্ত করলেন যাতে কোন সন্দেহই রইল না যে, রসম্ সারা তুনিয়ার না হোক, তামিলনাদের পরম প্রিয়।

পাছে এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ থাকে তাই পুরুত মশাই হাতের চেটোটি চেটে বললেন, রসম্ যেন হজমী দাওয়াই! একে এ হজম করায় তায় মধুর মত বল দেয় বলেই বামুনের ঘরে এরই নাম 'রসমধু'।

আমি ঔৎসুক্যভরে বললাম, বলুন ত, রসম্ কেমন করে কি কি দিয়ে তৈরী করে।

আগ্রহের স্বরে পুরোহিত মশাই বর্ণনা দিতে লেগে গেলেন। সে বর্ণনায় প্রকাশ পেল, রসম্ তৈরীতে ডালের জল আর তেঁতুলের রস চাই-ই চাই। তার উপর গোলমরিচের গুঁড়ো আর ঘিয়ের সম্বরা—

সে হলে সবচেয়ে মজাদার। তার চেয়ে 'আচ্ছা' রসম্‌ও আছে। তবে সে পাকা হাতের ব্রাহ্মণী ছাড়া যে-সে পাক করতে পারে না।

রসম্‌-প্রশস্তি কিছুতেই থামবার লক্ষণ নেই দেখে পাত ছেড়ে উঠে পড়াই ঠিক করলাম। পুরোহিত মশাইও পাছে যজমান হাতছাড়া হয়ে যায় সেই আশঙ্কায় আবার পেছন ধরলেন।

অপরাহ্ণ দিনান্তের দিকে গড়িয়ে চলেছিল। দিনের আলো থাকতে থাকতে মহাবলীপুরমের পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তূপ ও গুহামন্দিরগুলি দেখেশুনে সারা চাই। তাই এক রকম ছুটতে ছুটতে সমভূমি থেকে পাহাড়ের টিলার পাশটাতে চলেছিলাম। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হবার পরেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। ভাস্কর্য-সমন্বিত সুবিশাল দেওয়ালের মত একটি পাথরের 'প্যানেল'। ইউরোপের কোন কোন গীর্জার চিত্রাবলীর ক্যানভাস অতি বিরাট। কিন্তু পাথুরে ক্যানভাসে অসংখ্য মূর্তির এত বড় নিদর্শন সত্যি বিস্ময়কর। এই পাথরের ক্যানভাসটিকে বলা হয়, 'অর্জুনের তপস্যা'।

পাহাড়ের গায়ে সারি সারি অসংখ্য মূর্তি। সে মূর্তিগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে যে লাইনটি দিয়ে, সে রেখার মধ্যস্থল থেকে নিম্নভাগ পর্যন্ত অধিকার করে রয়েছে ভাস্কর্যের নাগ-কন্যারা। আর এক পাশের ক্যানভাসে হস্তী-শাবক-সহ যে প্রকাণ্ড হস্তী-দম্পতীকে দেখা যায়, ভাস্কর্যের বিস্ময়কর পাথরের পাতায় তার তুলনা মেলা ভার।

পুরোহিত মশাই সমগ্র 'প্যানেলটিতে' অর্জুনের পাশুপত লাভের যে চিত্তহারী গল্পটিকে সারি সারি মূর্তিতে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে, সেই কাহিনী বলে চলেছিলেন।

তৃতীয় পাণ্ডব সর্বশত্রুজয়ী হয়ে ভ্রাতাদের অজেয় দিগ্বিজয়ীরূপে পৃথিবীতে প্রখ্যাত করে রাখবার মানসে হিমালয়ে শিবের তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। এমন সময় একটি বন্য-বরাহ তীব্রবেগে তাঁর দিকে ধেয়ে আসতে থাকায় অর্জুন তূণ থেকে বাণ নিয়ে ধনুকে যোজনা করে যেই সে বন্য-বরাহকে তীরবিদ্ধ করলেন, সেই মুহূর্তে আরেকটি

তীর এসে বরাহের দেহ বিদ্ধ করায় তৃতীয় পাণ্ডব ক্ষুণ্ন হয়ে শিকারীকে যুদ্ধে আহ্বান জানালেন। অর্জুন শিকারীকে লক্ষ্য করে যে তীর চোঁড়েন সেই তীর বন্য-ব্যাধ খণ্ড খণ্ড করে ফেলেন চক্ষের নিমেষে। তৃতীয় পাণ্ডবের বিস্ময় আর ধরে না—এ কোন্ ব্যাধ, যার সঙ্গে তাঁর মত মহাবীর ধনুর্যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারেন না! এ ব্যাধ যেই হোক একে জয় করতে না পারলে বীরের মনে শান্তি কোথায়!

বীরচূড়ামণি তৃতীয় পাণ্ডব সাময়িক ভাবে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে শিবলিঙ্গের পাশে এসে পুনরায় তপস্যায় বসলেন। তপ সেরে শিবের গলে যেই মালা পরিয়েছেন, চোখ তুলে দেখেন ব্যাধের গলায় সেই মালা দুলছে। এ ব্যাধ তো ব্যাধ নয়, ব্যাধরূপী মহাদেব নিশ্চয়। তপে তুষ্ট মহাদেব অতঃপর ভক্তের মনোবাঞ্ছা পুরাতে তৃতীয় পাণ্ডবকে পাশুপত মহাস্ত্র প্রদান করলেন।

পুরোহিত মশাই থামলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর থামলেও সে-স্বরের রেশ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল। তারই সঙ্গে সঙ্গে কারা যেন প্রতিবাদ তুলল, না, না, এ পাহাড়-কুঁদা মূর্তিগুলি পাশুপত-লাভের, মহাদেব-মহিমার কাব্যগাথা নয়। এই যে নাগকন্যারা, এরা তো শিবের কণ্ঠের মালা হয়ে নেই। এদের বাসস্থান যে জলে। আর ঐ-যে ধাবমান মূর্তির সারি, তাঁদের পায়ের গতিতে বোঝায় না কি তাঁরা সব কিসের তাড়ায় যেন ছুটছেন? এখানকার লোক-প্রবাদ বলে, ঐ ধাবমান মূর্তিগুলি ভগীরথের মর্ত্যে গঙ্গা আনয়নের সময়ে যে সকল নর-নারী মা-গঙ্গার দর্শন ও পূজা-আরাধনার জন্যে ছুটেছিলেন, তাঁদেরই প্রতীক। সত্যিই, সারা পাহাড়ের গায় জোড়ায় জোড়ায় নর-নারী। এঁরা যে স্বামী-স্ত্রী সে সম্বন্ধে অনেকেরই কোন সন্দেহ নেই।

কেবলি কি নর-নারী, স্বামী-স্ত্রী! এক পাশে মন্দিরের কাছে বসে এক ঋষি। তাঁরই পদতলে হরিণ। কোথাও বা সিংহের মূর্তি, কোথাও বা বরাহের। একজোড়া বানর যেমন আছে, তেমনি রয়েছে

একটি কচ্ছপ। কিংবদন্তীর কথায়, নর-নারী জন্তু-জানোয়ার মুনি-ঋষি সবাই মা-গঙ্গার অভ্যর্থনার জন্য সমবেত।

দেবতাদের দর্শনও পাওয়া যায়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কোন-না-কোন রূপে এ পাহাড়ের গায়ে স্বয়ং অধিষ্ঠান।

কেউ যদি বলেন, সংসারের সত্যিকার একটি পূর্ণাঙ্গ 'রিলিফ' এই পাহাড়ের ভাস্কর্যে ভাস্কর খোদাই করে রখেছেন, হয়তো প্রতিবাদ তেমন উঠবে না। কারণ সংসারে এ সবি তো রয়েছে। এই নর-নারী, দেব-দেবী, মুনি-ঋষি, জন্তু-জানোয়ার, সাপ-বাঁদর—এর সকলকে নিয়েই তো আমাদের সংসার। কিংবদন্তী সহজ সত্যটিকে দৈব মহিমায় আশ্চর্য কাহিনীর অলঙ্কার পরিয়ে সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থিত করেছে বৈ তো নয়।

পাশের একটি গুহায় ঢুকতেই চোখে পড়ে গোবর্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণকে। এই গৃহটিকে বলা হয় 'কৃষ্ণ-মণ্ডপ'।

ব্রজের রাখাল কৃষ্ণ গোকুলে বাল্য কৈশোর কাটিয়েছিলেন। কিশোর কৃষ্ণকে রাখাল বালকেরা সখারূপে পেলেও যশোমতী-দুলাল মাঝে মাঝে খেলার ছলে এমন অদ্ভুত, অসম্ভব ও অসাধারণ লীলা দেখাতে শুরু করেছিলেন যে, শীঘ্রই সারা গোকুল জুড়ে রাখাল-রাজার পূজা পত্তন হতে চলেছিল। ফলে দেবতাদের রাগ আর ধরে না। দেবরাজ ইন্দ্র তো রেগেই আগুন। তিনি রাগের চোটে দিগ্বিদিক-জ্ঞান হারিয়ে একবার কৃষ্ণ-ভক্তদের বিধিমতে শিক্ষা দেবার মন করে সাতরাত সাতদিন প্লাবনধারা বইয়ে দিলেন। সন্ত্রস্ত সারা গোকুলের লোকজন প্রাণভয়ে যখন 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' রবে বাঁচার পথ খুঁজতে খুঁজতে জলে ভেসে যাবার জোগাড়, তখন ভক্তবৎসল প্রেমের ঠাকুর আঙ্গুলের ডগায় গোবর্ধন গিরি ধারণ করলেন। আর তার তলায় সকলে আশ্রয় নেওয়ায় ইন্দ্রের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল। মহাভারতের ঘরে ঘরে প্রচলিত উত্তর ভারতের এ পৌরাণিক কাহিনী মহাবলীপুরমের কৃষ্ণ-মণ্ডপের পাথরের দেওয়ালে ভাস্কর্যে উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে।

গোবর্ধনধারীর এক পাশে ধেনুদোহনরত গোপকে কেন্দ্র করে এখানে ভাস্কর যে পল্লী-পরিবেশটি পাথরের কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন সেটি যেমন জীবন্ত তেমনি প্রাণবান। এর সামনে দাঁড়ালে সহসা দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে। যে ধেনুটিকে গোপ দোহনরত, সে ধেনুটির লেজ থেকে শিং সব কিছু আশ্চর্য জীবন্ত। বৎসবৎসল মায়ের চোখছুটি কী সজীব! আর ধেনুবৎসটির গাত্রলেহনে গোমাতার মাতৃত্ব অনাবৃত, আশ্চর্য সুন্দর। পশ্চাৎপটে এক জননী জানুপরে সন্তানধারিণী, তারই এক পাশে অন্যান্য গাভীরা, ননীভাণ্ড হাতে গোপিকা। আজকের দিনেও গ্রামীণ ভারতে গোপপল্লীর এ চিত্র অদৃশ্য নয়।

"জীবনে জীবন যোগ করা"র মাধ্যমে যে জীবন্ত লোকশিল্পের জন্ম ও বিকাশ, তারই প্রতীক এই কৃষ্ণ-মণ্ডপের ভাস্কর্যাবলী।

দিনের আলো পশ্চিমে হেলে পড়তে পাহাড়ের সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছিলাম। একটু এগোতেই পুরোহিত মশাই থমকে দাঁড়িয়ে সামনের মন্দিরটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, এই দেখুন, 'গণেশরথ'।

তাকিয়ে দেখি রথের এক পার্শ্বে ছুটি শিং একটি দণ্ডে যুক্ত হয়ে শিরোভূষণরূপে শোভা পেয়েছে। এ রথটি গুহামন্দিরের এক চমৎকার নিদর্শন। এখানে বহুকাল আগে যে ছোট্ট পাহাড় মাথা উঁচু করে ছিল তার কতক অংশ ছেঁটে ফেলে কুঁদে তোলা হয়েছে গুহা-মন্দিরটিকে। দেবদেবী-ভক্ত ভারতে প্রত্যেকটি গুহামন্দির কোন-না-কোন দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত। এখানেও তার ব্যত্যয় হয়নি।

এমনি অসংখ্য মন্দির, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুহা-গেহ এই পাহাড়ের চারপাশ ঘিরে, বুক জুড়ে রয়েছে। তাদের দেখলে মনের পর্দায় একে একে নানা সভ্যতার পদক্ষেপ ফুটে ওঠে। কোনটি উজ্জ্বল, কোনটি-বা অনুজ্জ্বল। কিন্তু কল্পনার মুন্সিয়ানায় মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে পাহাড় বলতে অনুচ্চ টিলার উপরে চড়তে চড়তে এক সময় পুরোহিত মশাইয়ের সঙ্গে বরাহ-মণ্ডপে

গিয়ে হাজির হওয়া গেল। এ মণ্ডপটির মুখ পশ্চিমমুখো। এর পেছনের দেওয়ালে লক্ষ্মীর আসন। স্বয়ং ধনের দেবী কমলে আসীনা। কমলাসীনার কল্পনা পাথরে প্রাণ পেয়েছে এখানে। এবং সে কমলাসীনাকে ঘিরে রয়েছে ডাইনে বামে চার সহচরীতে।

ভারতে যে হস্তী ঐশ্বর্য-সম্পদের প্রতীক, তাদের দুই প্রতিনিধি দুপাশ থেকে ঐশ্বর্যের দেবীর পরিচর্যায় নিযুক্ত রয়েছে। একটি হস্তী পূর্ণকুম্ভ শুণ্ডে ধারণ করে দেবীকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। অন্যটি যেন আজ্ঞা-প্রতীক্ষায়।

সহচরীদের দৈহিক গঠনে কবিকল্পনার আতিশয্য বর্তমান। এক পাশের দুটি রমণী স্তনভারনতা, অন্য পাশের তরুণীদ্বয় কুচযুগশোভিতা। প্রথমোক্ত রমণীদ্বয়ের দৈহিক বিবর্তনে বয়সের যেমন ছাপ আঁকা, শেষোক্ত তরুণীদ্বয়ের যৌবনের জোয়ার তেমনি উদ্ধত।

ভারতীয় ভাস্কর্যে নগ্ন নারী-সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি অনেক সময় বাড়াবাড়িতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বলে যে অভিযোগ শোনা যায়, সে যে একেবারে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ এই চার সহচরী। কিন্তু এই নগ্নতায় অশ্লীলতা না থাকায় সৌন্দর্যের স্বর্ণকোরক এখানে অঙ্গে অঙ্গে প্রস্ফুটিত দেখতে পাওয়া যায়।

আকাশে আলোর তেজ ক্রমশঃ কমে আসছে। আগে যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাদের কাউকে কাছাকাছি কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সেজন্যে মনে যে একটা আকুলতা প্রকাশ পায়, তাও নয়। অন্তরের তন্ত্রীতে এখানকার পাথুরে ছন্দে সভ্যতার মহাকাব্য পাঠের ব্যাকুলতা নতুন আবেগে বেজে চলেছে। ফুলরূপলোভী প্রজাপতি-মন এখন চার পাশের সহস্র বছরের পাথরের ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াতে চাইছে।

॥ ৫ ॥ মহাবলীপুরমে এক রাত্রি

সহস্র বছর আগে, না, তারও আগে, আনুমানিক পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে, ইতিহাস লেখে, এই এলাকায় পল্লব রাজাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সে রাজত্বের সেরা সৌরভবাহী ফুলদল পাছে কালের হাওয়ায় উধাও হয়ে যায় সেই আশঙ্কায় সেকালের ভাস্কর-শিল্পী-স্থপতির দল মনে মনে পণ করেছিল—পাথরের ফুল ফোটাতে হবে। যে ফুল সহসা ঝরবে না, কালের হাওয়ায় যার রূপ রস গন্ধ সৌন্দর্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উত্তরকালের রসিকদের অন্তরে আনন্দ দেবে, কল্পনায় বান ডাকাবে। তাই সত্য হল।

টিলার উপরে চড়ে যে অনুচ্চ সমতলভূমিতে দাঁড়ালাম, তারই পূর্বদিকে কোন্ দূর্‌কালের ভাঙ্গা অট্টালিকার সুউচ্চ স্তম্ভগুলো এখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মহাকালের সঙ্গে সদর্পে লড়ছে যেন। ঐ স্তম্ভকে ঠিক স্তম্ভ বলা যায় না। পাথরের খণ্ডের পর খণ্ড বসিয়ে ভারিক্কি খুঁটির মত এদের দাঁড় করানো হয়েছিল। কোনটা বা কক্ষের দেওয়াল ছিল। আজ কারও জাতগোত্র গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে চিনবার জো নেই।

অথচ এরই গায়ে কত সুন্দর সুন্দর ভাস্কর্য জরাজীর্ণতার মধ্যেও ভাস্বর। তখনো আকাশের আলো মিলিয়ে যায়নি। তাই দেখবার সুযোগ হল—এ যেন সেকালের সভ্যতার পুষ্পাঞ্জলি একালের আসন্ন দিনান্তের পায়ে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে যে মন চায় সে মনটি বলে, কত কালের কত ইতিহাস ঝরাপাতার দীর্ঘশ্বাসের মত মিলিয়ে গেছে এদেরই পায়ের তলায়। এক ধর্মের পতনের পরে নতুন ধর্মের অভ্যুদয়, এক রাজবংশের বিলুপ্তিতে অন্য রাজবংশের সমুদ্ভব। তারপর প্রবল প্রতাপের পরাজয়ে প্রবলতর বর্বরতার লৌহরথের তলায় তলিয়ে গেছে মহিমান্বিত সভ্যতার আসন। দুর্লভ স্রষ্টার দল যারা কেহ বা সৃষ্টির বেদীমূলে নিজের সাধক জীবন সমর্পণ করে ধন্য হতে চেয়েছিল, কেহ বা বিরাট কোন কল্পনায় নয়, হয়তো কেবল

পেটের দায়ে হাতুড়ি বাটালির আশ্রয় নিয়ে জীবিকা অন্বেষণে ছুটে এসেছিল, কালে কালে তাদের শেষ বংশধরেরাও কোথায় অবলুপ্ত হয়ে গেল ? আরেকটি মন বলে, অতশত দেখাশোনা, বাদ-বিচার, গবেষণায় কাজ কি তোমার। ছুনিয়ার বাস্তববাদীদের দৃষ্টিতে দেখো, এ ধ্বংসস্তূপ ছাড়া কিছুই নয়। কবে এই মহাবলীপুরমে বৌদ্ধপ্রভাব স্তিমিত হয়ে আসায় শৈবদের অভিযান জয়ী হয়েছিল, কবেই বা বৈষ্ণববাদীদের তলোয়ারের ধারে প্রথমত অরাজকতা, তারপর অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থিতির শেষে ক্রমে ক্রমে শৈব-ধর্মের চূড়ান্ত পরাভব অসম্ভব দেখে শৈব-বৈষ্ণবে সন্ধি ঘটেছিল তা দিয়ে আজকার দিনে কারই-বা কি আসে যায় !

প্রথম মনটি বলে ওঠে, না-হে-না—ছুনিয়া কেবল বাস্তববাদেই চলে না। বাঁচার মত বাঁচতে হলে, অমৃত চাই, আনন্দ চাই। সোনার কাঠির স্পর্শ চাই—শিল্পের স্পর্শ। চাই বাঁশীর সুর, চাঁদের হাসির বাঁধভাঙা ঢেউ—কল্পনাকে স্বপ্নকে যে সুন্দর করে গড়ে তুলতে প্রেরণা দেয় সভ্যতার মিনার।

দ্বিতীয় মনটা বিক্ষোভ জানায়, রুটি চাই, তাই পেলে বর্তে যাই।

তবু আমি পাথরের ফুলে সৌরভ মেলে কি না মেলে তারই সন্ধান করতে করতে কখন যে পল্লব আমলের বাতিঘরের ভগ্ন শিখরে চড়ে বসেছিলাম, কেমন এক জাগ্রত সুপ্তিতে সারা অন্তর আচ্ছন্ন থাকায় সেকথা জানতেই পাইনি।

পুরোহিত মশাই এমন পুরানো পাথরভক্ত নাছোড়বান্দা লোকের পেছনে পেছনে ঘুরে নাজেহাল হবার মজুরি শেষটায় না পোষায় সেই আশঙ্কায় মাঝপথে কখন কেটে পড়েছেন। ভালই হয়েছে। মহান্ মৃত্যুর স্তব্ধতার মুখোমুখি কথা কইতে গেলে আশেপাশে অরসিক কেউ থাকলে কি চলে !

আকাশে সন্ধ্যা নেমেছে। আমার জীবনে আলোর সন্ধিক্ষণ বুঝি এখন। এই পরিত্যক্ত বন্দরনগরীর উত্তপ্ত শ্মশান-শ্বাস সবে অন্ধকার দিগন্তের কোলে মিলিয়ে গেছে। আজ আমার শূন্যমুঠি পূর্ণ করে নিতে আমি হাত পেতেছি অতীতের সিংহদ্বারে।

যতই দেখছি, ততই নিজেকে হারিয়ে ফেলছি সৌন্দর্যের আলোক-সরোবরে। সেই সরোবর দেখতে দেখতে সীমাহীন সমুদ্রে রূপান্তরিত হল কেমন করে! আমায় সে ভাসিয়ে নিয়ে চলল যে! চলেছি তো চলেছি। গুহাগহ্বরের আদিম অন্ধকার-স্রোত ঠেলে পৌরাণিক যুগের পরবর্তী কালে মানবচিত্তের বিরাট বিরাট কল্পনার প্রবাহ ঠেলে, বৌদ্ধযুগের সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত দেখে, আর্যাবর্তের আবেগবান প্লাবন মন্থন করে কবে একদিন উঠেছিলাম এসে অন্ধ্রের এক অন্ধকার দ্বীপে। সেখানে সহসা আলোকস্রোতের কাহিনী প্রকাশ করতেই অসংখ্য শত্রুর আক্রমণ-সম্মুখে আত্মরক্ষায় অসমর্থপ্রায় আবার একদিন ভেসে চললাম করাল স্রোতে আরো দক্ষিণে।

ভাসতে ভাসতে ফের ডাঙ্গা পেলাম কাঞ্চীতে। এর মাটি কামড়ে উঠে দাঁড়াতে চারপাশে যারা ভীড় করে এল তাদের সহায়তায় যে রাজ্য গড়া হল, তার মূলমন্ত্র ছিল, "আলো, আরো আলো!" সে আলো সমস্ত দেশময় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরিব্যাপ্ত হতে লাগল। পাথরে পাথরে প্রাণের কথা, অন্তরের অনুভূতি, হৃদয়ের আবেগ, কল্পনার মূর্তি প্রমূর্ত হয়ে উঠল।

তারই অদৃশ্য স্পর্শে সচেতন হয়ে চারদিকে চেয়ে দেখি, কোথাও জনমানব নেই। শুধু আধুনিক 'আলোক-ঘরের' সুউচ্চ শিখর থেকে দৈত্যের চোখের মত জ্বলজ্বলে খানিকটা আলো বহুদূর সমুদ্রের বুকে ঘুরপাক খেয়ে ফিরে ফিরে ছিট্‌কে গিয়ে পড়ছে তিরুকালুকুন্‌রমে। ওখানেও রয়েছে সেকালের সুবিখ্যাত মন্দির।

মহাবলীপুরমে একটি রাত্রি! আগের কালে হলে এই এক রাত্রিকে নিয়ে মহাকাব্য রচিত হতে পারত। আর এখন জনশূন্য অন্ধকার ভগ্নস্তূপ-পরিবেষ্টিত এ রাত্রিতে কেবলি মনে হয়, সেকালের এই সুন্দর জনপদের অধিবাসীরা আজ কোথায়। সেই বাতিঘর পড়ে রয়েছে, পড়ে রয়েছে সমুদ্রসৈকত—নেই শুধু সাতসমুদ্রতটের বাণিজ্যবহর। অষ্টম শতাব্দীতেও কাঞ্চীর সামুদ্রিক বন্দর অবলুপ্ত হয়নি। তার আগে তো

এখান থেকে কাঞ্চীবাসী দুঃসাহসিক বাণিজ্যিক বীরেরা সমুদ্রযাত্রা করেছে সিংহল, মালয় ও যবদ্বীপের উদ্দেশে। অন্যান্য দেশের সওদাগরী বহর নোঙর করেছে এখানকার বন্দরে। অসংখ্য জলযানের মাস্তুলে মাস্তুলে দিনরাত্রির হাওয়ায় উড়েছে পৃথিবীর নানা দেশের পতাকা। কেতনদণ্ডে আকাশপথে পাঁচিল খাড়া হয়েছে। আর বিচিত্র বিশ্ব-সমাজের বৈচিত্র্যময় কলরোলে দিনের আকাশ যেমন মুখরিত, এমন রাত্রিতে তেমনি স্তিমিত আলোকে জাহাজের যত্রতত্র বসে নানান দেশের নানা জাতির মানুষ যার যার প্রিয় পুঁথিপত্তর খুলে আরম্ভ করেছে সুর করে পড়া। নানান সুরের বিভিন্নতা কখন ঐকতানে সম্পূর্ণতা পেয়েছে, আকাশ ছাড়া অন্য কেউ সে খোঁজ পায়নি।

আগের কালের আলোকস্তম্ভ থেকে নেমে এসে প্রথম সমস্যায় পড়লাম, এখানে কোথায় ঠাঁই পাই। অন্ধকারে পথ চলতে গা ছমছম করে। মনকে এ রাজ্য থেকে সরিয়ে নিতে কত কি-ই না ভাবতে চাই। কিন্তু বারবারই ঘুরেফিরে মনে জাগে—কোথায় যাই।

কিছুদূর এগিয়ে যে লণ্ঠনের আলো চোখে পড়ল তার কাছে যেতেই পুরোহিত মশাই হা-হা করে উঠলেন। এত রাত্রি পর্যন্ত অজানা মানুষটি বাইরে থাকায় তিনি যে কতটা শঙ্কিত সে-ভাব প্রকাশ করেই থামলেন না, ভাঙ্গা হিন্দীতে বলতে লাগলেন, ভেবেছিলাম আপনি চলে গেছেন। এখানে রাত্রিতে বাইরে কেউ কখনো বড়-একটা থাকে না।

সেটুকু আমি ইতিমধ্যেই আঁচ করতে পেরেছিলাম। কিন্তু পুরাকালের ধ্বংসপুরীতে নির্জন রাত্রিবাসের সম্ভাবনায় পুলক অনুভবও করছিলাম।

পুরোহিত মশায়কে ধরে-পড়ে রাত্রিবাসের আস্তানা একটা জোটানো গেল। কাছেই ডাক-বাংলোও ছিল। কিন্তু তার পরিবেশ এই ধ্বংস-পুরীতে নেহাতই বেমানান।

মহাবলীপুরম থেকে শুনতে পেলাম, যাত্রীবাস সন্ধ্যার আগেই দূরবর্তী শহরমুখে ধাওয়া করে। আর পরের দিন বেশ কিছু বেলাতে

সূর্যের ঝরঝরে আলোতে দর্শনার্থী নিয়ে বাস আসে। কাজেই আপাতত এখানকার অন্ধকারে আমি বন্দী। এ বন্ধনে শৃঙ্খলের বেদনা নেই, আছে অনাবিল মুক্তির আনন্দ। এখন আমি নগরীর কোলাহল, চারপাশের ঝলমলে বিজলী, যানবাহনের হাঁকডাক, সবার অত্যাচার থেকে বহুদূরে নৈঃশব্দ্যের সুশান্ত সাগরে ইচ্ছে করলে সাঁতার কেটে বেড়াতে পারি।

তাড়া দেবার কেউ নেই। প্রকৃতির রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করবার ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ। কি এক অপরিসীম আনন্দ!

সমুদ্রের আওয়াজ এগিয়ে আসছে। ঝাউবনে হাওয়া অজানা সুর তুলছে। মানুষ নগরীর রূপে আত্মসমর্পণ করে যা কিছু পেছনে হারিয়ে এসেছে—সেই সুন্দরের অভিসার আজ রাত্রিতে মহাবলীপুরমে।

পুরোহিতমশায়ের কাছে প্রস্তাব করলাম, চলুন, একটু পথে পথে ঘোরা যাক। তিনি সহসা সম্মতি না দিলেও পরদেশী পথিকের পীড়াপীড়িতে শেষটায় যখন রাজী হলেন তখন আকাশে আধফালি চাঁদ উঁকি দিচ্ছে।

ঐ চাঁদের আলোতে পথ দেখে চলার চেয়ে কেমন যেন পথ ভুলে চলছিলাম। দিনের রৌদ্রতপ্ত পথ এখন শীতল। মৃদু হাওয়ায় কোন বনফুলের বিহ্বল গন্ধ। আশেপাশের গাছপালায় রমণীয় নিস্তব্ধতা।

চলতে চলতে একসময় সমুদ্রসৈকতে এসে পড়লাম। আকাশের রূপ যেন সহস্রধারায় ঝরে পড়তে উন্মুখ। সমুদ্রে অফুরন্ত জলরাশি আনন্দে উদ্‌ভ্রান্ত। ঢেউয়ে ঢেউয়ে জ্বলন্তপদ্ম পাপড়ি মেলে তটপ্রান্তে ছুটে আসছে।

কতক্ষণ সে সমুদ্রতটে গা এলিয়ে বালুশয়নে পড়ে ছিলাম! সহসা শুনতে পেলাম কাদের দীর্ঘশ্বাস। তাদের দেখবার জন্যে চোখ বিস্ফারিত করে তাকালাম। কিন্তু কোথায় তারা! রূপহীন, বর্ণহীন অবাস্তব শূন্যতায় তাদের নিঃশ্বাসের সঞ্চার তখনো অনুভব করছিলাম। আশ্চর্য, কারা যেন আমার চারপাশে প্রাণের উৎসবশেষে ভীড় করে বসেছে। তাদের ভারি নিঃশ্বাস আমার সর্বাঙ্গে এসে লাগছে, অথচ আশেপাশে কোথাও কেউ নেই। পুরোহিতমশায়?

আমার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি তুলল না, আমার প্রশ্নের উত্তরও কেউ দিল না। একাকী আমি। পুরোহিতমশায়, কোথায় গেলেন ?

আশা করেছিলাম, ডাক শুনে কেউ দৌড়ে আসবেন। কিন্তু কেউ এলেন না। গায়ে আমার কাঁটা দিয়ে উঠল।

ভূতপ্রেত বিশ্বাস করি না। ভয়কে ভয় বলেও মানি না, তবু কেমন যেন······

ঐ, ঐ-যে কারা যেন চলে বেড়াচ্ছে। পবিত্র মন্দিরের অঙ্গনে সহসা কাদের ভীড়! যাদের বহু সাধ ছিল এ মন্দির গড়বার, তাদেরই কি ? যারা সংসারে সহস্র লোভের জাল বিস্তারিত করে টেনে তোলবার আগেই অন্যলোকে প্রস্থান করেছে, তাদের সমাবেশ এমন নিস্তব্ধ রাত্রিতে হবে বৈকি! এখানে এককালে যে সকল নরনারী নীড় গড়েছিল, সংসার বিছিয়ে বসেছিল, পুত্রকন্যার হাসি দেখে সানন্দে হেসেছিল, আশাভঙ্গের মনস্তাপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল, তারা কি চিরকালের জন্যে কখনো ভুলে যেতে পারে জীবনের রম্যলোককে ? তারা কি কখনো চিরতরে বিদায় নিতে পারে এ-মাটির মায়া ছেড়ে ?

"বাবুজী চলিয়ে"—

"কে—পুরোহিতমশায় ?"

পরিত্যক্ত প্রাচীন জনপদের সমুদ্রতটের বুক ছেড়ে উঠতে গিয়ে সেকালের জীবনের হাসি-কলরব, কান্না-বেদনার সঙ্গে কেমন যেন নাড়ীছেঁড়া ব্যথায় সারা অন্তর ব্যথিয়ে উঠল।

সে রাত্রিটা কোনক্রমে আধো-ঘুমে আধো-জাগরণে নিঃশেষ করে ভোরের আলোতে জেগে দেখি, পরিত্যক্ত প্রেতলোকে কার সোনার আবরণ অদ্ভুত এক বেষ্টন পরিয়ে দিয়েছে। দু'চারজন স্থানীয় বাসিন্দা অতি ভোরে উঠে সমুদ্রের সৈকতে রত্নাকরের উদ্বৃত্ত দানভাণ্ডার সংগ্রহে ছুটেছে। বেলা বাড়তে আরো কিছু লোকের আনাগোনা আরম্ভ হল। আমার মন মন্দিরের পথে পথে ছুটে যেতে চঞ্চল হয়ে উঠল।

॥ ৬ ॥ পক্ষীতীর্থের পাহাড়-মন্দিরে

আমাকে নিয়ে পক্ষীতীর্থের পথে যাত্রী-বাস যখন রওনা হল তখন একাকী নিস্তব্ধভাবে বারবারই মনকে যার কথা নাড়া দিচ্ছিল, সে মহাবলীপুরমের প্রতিষ্ঠাতা নবসীমা বর্মণ মমল্ল নয়, কিংবা নয় অন্য কোনো খ্যাতিমান দিগ্বিজয়ী দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট—সে হচ্ছে সেই লোকটি যে আমায় বিদেশ-বিভূঁয়ে রাত্রিতে মাথা গুঁজবার ঠাঁই সংগ্রহ করে দিয়েছিল, যার চোখদুটি বিদেশীর বিদায়কালে জলে ঝাপসা, পরনে যার চীর।

তিরু-কলু-কুন্‌রম, অর্থাৎ পবিত্র পাখীর পাহাড়। একালে দূর-দূরান্তের পুণ্যলোভী পল্লীবাসীও জানে পক্ষীতীর্থের নাম। এই পক্ষীতীর্থেরই তামিল নামকরণ তিরু-কলু-কুন্‌রম্।

বেলা প্রায় দশটায় দশ মাইল পথ উজান এসে পক্ষীতীর্থের পায়ের কাছে পৌঁছুলাম। কাছেই পূজার উপকরণ-বিক্রেতা ওৎ পেতে বসে। এক খুচরো দোকানী চালায় আশ্রয় নিয়ে পুণ্যলোভাতুরদের পুণ্য সঞ্চয়ের পসরা সাজিয়ে বসেছে। পুণ্যের পসরার পাশাপাশি বিড়ি-সিগারেট সাজানো রয়েছে। ধূমপায়ীদের সুবিধাই হয়েছে। পাশেই মাটিতে কাঁদি কাঁদি ডাব। পড়ে পড়ে শুকোচ্ছে।

ডালিতে ফুলের মালা নিয়ে ফুল ফিরি করে ফিরছে সাধারণ ঘরের কিশোরীরা। ওপাশে একটি বধূ গলা ফাটিয়ে হাঁকছে—তারও ফুল পসরা।

দেখতে দেখতে কয়েক দল তীর্থযাত্রী এসে পড়ল। তাদের সঙ্গে সকল বয়সের ছেলে-মেয়ে। কলরোলে কান দিয়ে জানা গেল, আগতরা বহুদূর থেকে এসেছে। যে ভাষায় কথা বলছে তার চলন আগ্রা থেকে মথুরার পথে-ঘাটে যে-কোন পরিব্রাজকের কানে এসে থাকবে।

সুউচ্চ পাহাড়-শিখরে পুরাকালের মন্দির। যদিও আধুনিক সিঁড়ি আগাগোড়া চরণ থেকে শিখর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত তথাপি অতটা পথ চড়াই চড়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধার পক্ষে সহজ নয়। সকাল-সকাল যাত্রা না করলে পাছে পক্ষীতীর্থের পক্ষীরূপী মুক্তপ্রাণ মুনিদ্বয়ের দর্শনলাভ না হয় সেই ভয়ে

এরই মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সুপ্রশস্ত পরিচ্ছন্ন পাথরের সিঁড়ি দিয়ে পাহাড়ে চড়তে শুরু করেছেন। তাঁদের চারপাশে কিশোর-কিশোরী, তরুণী ও মধ্যমা মহিলারা আনন্দে হেলতে-দুলতে চলেছেন। কারো চোখে সুউচ্চ মন্দির-তীর্থের আকর্ষণ, কারো-বা রক্তে পাহাড় জয়ের দুরন্ত নেশা। কেউ ঘরের বন্ধনছাড়া মুক্ত বিহঙ্গীসমা, কেউ বা অলৌকিক কিছু দর্শনের দুর্লভ সৌভাগ্যের সমীপবর্তী হবার সম্ভাবনায় চঞ্চলমনা।

মাথাপ্রতি দু'পয়সার টিকিট কেটে ছাড়পত্র নিয়ে সকলকে আধুনিক লৌহকপাট পেরিয়ে তবে উপরে চড়বার সিঁড়িতে পা দিতে হয়। কিছুদূর চড়াই ভেঙ্গে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থা সারা পথেই বর্তমান। এ ব্যবস্থাগুলি এই সেদিনকার। এগুলি যেমন প্রশস্ত তেমনি পরিচ্ছন্ন। দাঁড়াতে বসতে আপনা থেকেই মন চায় আর মাথার উপরে আচ্ছাদন থাকায় প্রখর সূর্যের আলো অনায়াসেই উপেক্ষা করা যায়।

প্রায় পাহাড়ের মাঝামাঝি এসে দুদিকে দুটি পথ চলে গেছে। একটি সোজা খাড়াই, অন্যটি এঁকে-বেঁকে একটু একটু করে উপরে উঠেছে। সোজা পথে উঠতে কষ্ট, নামতে আরাম। বাঁকা পথে পাহাড়ে চড়া সহজ বলে অনেকেই এই পথে মন্দিরে চড়ে সোজা পথে নেমে আসার পক্ষপাতী। এর সুফলও একটা আছে। সে হচ্ছে গোটা মন্দিরটিকে একরকম আসা-যাওয়ার পথে প্রদক্ষিণ করে ফেরা।

বাঁকা পথটাই আগে বিশেষ চলিত ছিল। সোজা পথটা কিছুকাল হল পাহাড়ের বুক কেটে অনেকটা খাড়াভাবে তৈরী করা হয়েছে। দেখলে মনে হয় অনাবরণা সুন্দরীকে কে যেন শৌখিন এক ফ্রক পরিয়েছে। আর তার কপালে একালের হরেক রকম ব্যবসায়ী প্রতিযোগিতায় জয়ীদের শিরে যে সব নকল মুকুট পরাবার চল হয়েছে, তেমনি ধরনের বিজলী-বাতির টিপ। পল্লীবধূকে ঘোমটা খসিয়ে গাউন পরিয়ে পথে হাজির করলে যেমন বেমানান দেখায়, পক্ষীতীর্থের পাহাড়ী পথে চকচকে পাথরের সিঁড়ি আর ঝলমলে বিজলী বাতির ব্যবস্থা তার চেয়েও বেমানান।

চোখের দৃষ্টি পাছে পদে পদে তকতকে পাথরের সোপানে হোঁচট খায়

সেই শঙ্কায় নতুন পথ সযত্নে এড়িয়ে বহুকালের পুরানো পথ ধরে এগিয়ে চললাম।

কতকালের এই সিঁড়ি কতশত বিলুপ্ত দৃষ্টিকে সঙ্গোপনে বুকে আশ্রয় দিতে গিয়ে ক্রমশ নিজেই বিলুপ্তির পথে বহুদূর এগিয়ে বসে আছে। কত লক্ষ পদপাত একালের অলক্ষ্যে এরি বুকে মঞ্জীরে মঞ্জীরে বেজে গেছে। বহুশত বর্ষের বহু বসন্ত এরই বুকে মৃদুস্পর্শ বুলিয়ে এই তীর্থ-পথকে আরো স্মৃতি-মধুর করে তুলেছে। ভক্তির প্রচণ্ড উল্লাসে প্রমত্ত ভক্তদলের দৃষ্টি কখনো এ বিজন পথটির মুখপানে তাকায়নি। অবজ্ঞাত, অবহেলিত এ পথ অনায়াসে দেবের আসন পর্যন্ত নিজের বুক পেতে গ্রহণ করেছে লক্ষ জনের চরণধূলি। সে ধূলিধূসরিত এ প্রস্তরদেহ আজ জরাজীর্ণ। হয়ত আর কিছুকাল বাদে মানুষ মাত্রেই এর কদর ভুলে যাবে। এরই বুকে বিচরণক্ষেত্র হবে অন্ধকারের উপোসী জানোয়ারদের।

চলতে চলতে সেকালের এ পথের রূপে কেমন যেন বিমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। একদিন এরই দিন ছিল। আজ এ ইতিহাস। সে ইতিহাসও কত রোমাঞ্চকর! এ পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে পক্ষীতীর্থের মন্দির-দ্বারে পৌঁছে গেছেন এককালে কত কত রাজ্যের রাণী-মহারাণী। শিবিকা ছেড়ে, ঐশ্বর্যের দাম্ভিকতা মাটির ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে শত সহচরীদের দূরে রেখে একাকী পথ ভেঙেছেন রাজ-রাজেশ্বরী। কত রাজা-মহারাজা অমাত্য-পরিবেষ্টিত হয়ে অনুচরসহ এই পথে সদম্ভে পূজা দেবার ছলে নিজের সম্পদ-ঐশ্বর্য জাহির করতে করতে মন্দিরে এসেছেন, গেছেন। তারপরে একদিন দেখা গেল, কোথাও কেউ নেই, প্রকৃতির নিদারুণ দুর্যোগে দিনের আকাশে প্রলয়ের মেঘ। রাজা-রাণী, ধনী সওদাগর, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞজন যে যার প্রাণভয়ে অস্থির। এমন সময় এক আলোক-পিপাসী সন্ন্যাসী ছুটে চলেছেন শিখর লক্ষ্য করে। চলতে চলতে বজ্রের সম্মুখীন; চোখ ঝল্‌সে গেছে, প্রাণ আঁৎকে উঠেছে, তবু থামেনি অদম্য চরণ-দুটি। সে চরণ-চিহ্নও এ বুকে আঁকা রয়েছে।

ঐতিহাসিক পথে, পৌরাণিক অনুভূতির রেণু গায়ে মেখে পথের পাশে

আকাশস্পর্শী পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা গুহাগুলি দেখতে দেখতে অনেকটা পথ ভেঙ্গে এগোতে এক সময় একসঙ্গে কতকগুলি কণ্ঠের কলরব শুনতে পেলাম। ঐ যে ওঁরা ওপথে কয়েক দল আগেই এসে গেছেন।

যেখান থেকে কলরব আসছিল, সেটি একটি কৃষ্ণচূড়াতলা। তারই অদূরে পাকা-মেঝে একখানি লম্বা চারপাশ-খোলা চালা। ক্রমে ক্রমে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলবার সঙ্গে সঙ্গে চালাঘরখানি সাদা-কালো মাথায় ভরে গেল।

দিনটা আবার রবিবার। এগারোটা নাগাদ একদল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এসে হাজির। ছুটির দিনের 'মজালুটি' মনোভাব এদের চোখে-মুখে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। যার যার বন্ধুবান্ধব নিয়ে দেখতে দেখতে প্রায় সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। একটি অত্যাধুনিকার চারপাশ ঘিরে দিব্যি এক জটলা, কিন্তু সেদিকে ঐ চালার লোকদের কোন দৃষ্টিই নেই। ওদের চোখ এখন আকাশে পাখা মেলে দিয়েছে। শত শত যোজন শূন্য উড়ে কাশী থেকে পক্ষীরূপী মুনিদ্বয় কতক্ষণে আসেন সেই দর্শন-প্রত্যাশায় সবার মন অধীর।

আমি অদৃশ্য এক আকর্ষণে ঐ জনতার মাঝখানে নিজেকে ভাসিয়ে দিলাম। স্পষ্ট কানে শুনতে লাগলাম নানা লোকমুখে পক্ষীতীর্থের কালান্তর-মহিমা।

কেউ বলছে, যে পাখী আসছে, সে-তো আজকার নয়—সত্যযুগের।

কেউ বলছে, সত্যযুগ কবে শেষ হয়েছে, অতকাল আগের পাখী কেমন করে হবে।

মাঝ থেকে একজন বলে ওঠে, জটায়ু-সম্পাতির কথা রামায়ণে আছে। এরা সেই জটায়ু-সম্পাতিরই জ্ঞাতি।

অমনি আশেপাশে সোৎসুক জিজ্ঞাসা ঃ জটায়ু-সম্পাতির সঙ্গে এ তীর্থের সম্পর্কটা কি ?

কাছেই ছিলেন দক্ষিণী-ব্রাহ্মণ। যাত্রী চরিয়ে যেমন অভিজ্ঞ তেমনি

গল্পে তাঁর স্বাভাবিক পটুত্ব। তিনি বলতে লাগলেন, জটায়ু-সম্পাতি দুই বিরাট বিহঙ্গ। দুজনে সূর্যের সন্ধানে নীল গগনে পাখা মেলে উড়ে চলেছিল। কখনো জটায়ু আগে, সম্পাতি তাকে পাল্লায় পরাস্ত করতে চাইছে। কখনো বা সম্পাতি বহু ঊর্ধ্বে উড়ে গেছে, জটায়ু তার নাগাল ধরতে আকাশ কাঁপিয়ে ছুটছে। ওদিকে হংসমুনি যেই না চোখ মেলে এই দৃশ্য দেখলেন, মুনির মনে ভয় হল পাছে না সূর্যদেবের কোন বিপদ ঘটে। তাই তিনি মনে মনে চাইলেন সম্পাতির যেন পাখা পুড়ে ভস্ম হয়ে যায় আর জটায়ু যেন সূর্যের তাপে ক্লান্ত হয়ে বিন্ধ্য-পর্বতে ছিটকে পড়ে। মুনির মনস্কামনা পূর্ণ হল। বিহঙ্গদ্বয় সূর্য ছুঁতে গিয়ে পরাস্ত হয়ে দুজনে দুই পাহাড়ে ছিট্‌কে পড়ল। বাপমায়ের পুণ্যে তাদের প্রাণ বেঁচে গেল। তারপর তারা পাপমুক্ত হবার পথ খুঁজতে খুঁজতে একদিন ঋষি মার্কণ্ডেয়র মুখে শুনতে পেল যে, তিরু-কলু-কুন্‌রমের পাদদেশে রুদ্রকোটিতে শিবের পূজা করলে তাদের মুক্তি হতে পারে। সেই-মত দুই বিহঙ্গ এখানে ত্রেতাযুগে তপস্যা করে শিবের দর্শন পেলে শিবই তাদের মুক্তির পথ বলে দেন।

দক্ষিণী ব্রাহ্মণ থামতে-না-থামতে আরেকজন বলে ওঠেন, জটায়ু দণ্ডকারণ্যে সীতাহরণকালে লঙ্কার রাবণের সঙ্গে লড়েছিলেন। রাবণ তাঁর ডানা কেটে পালিয়ে যান, তারপর না রাম-দর্শনে তাঁর পরিত্রাণ।

দক্ষিণী ব্রাহ্মণ বললেন, সম্পাতিও হনুমানকে সীতার সন্ধান লাভে সাহায্য করে তবে মুক্তি পান।

ভীড়ের মধ্য থেকে সহসা কে চীৎকার করে উঠল ঃ ঐ পাখী আসছে, পাখী আসছে!

সকলের চোখ আকাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কোথায় পাখী? কোন্ দিকে? কোন্ আকাশের কোন্‌খানে? ততক্ষণে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা, এমনকি সেই অত্যাধুনিকাও এদিকে ছুটে এসেছে। প্রত্যেকেই পাখী দেখতে উদ্‌গ্রীব।

কিন্তু না, পাখী এখনো আসেনি। দক্ষিণী ব্রাহ্মণটি বলছেন, কাশী

থেকে এতটা পথ উড়ে আসতে হবে-তো। অত্যাধুনিকার সে কথা কানে যেতেই সে অবিশ্বাসের হাসিতে অদ্ভুত কণ্ঠে বলে উঠল, সে কি ঠাকুর, আমরা যে দেখলাম, ওদিককার ঐ পাহাড় থেকে পাখী উড়ে আবার ঐ পাহাড়ের কোথায় গিয়ে বসলো।

ব্রাহ্মণ বিব্রত হয়ে পড়তে-না-পড়তে বুদ্ধি করে সামলে নিলেন ঃ দেখবার চোখ থাকলে তো দেখবে। যার চোখ ঐ পাহাড়ের বেশী দূর যায় না, সে কাশীর পাখী পাশের পাহাড়ে ছাড়া দেখবে আর কোথায়।

এ-কথায় অত্যাধুনিকার চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। সে কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ব্রাহ্মণের বুদ্ধি-প্রয়োগ গুণে আপাতত তাঁর যে বিজয় তারই ধাক্কায় অত্যাধুনিকাকে মুখ বুজেই থাকতে হল। এ হেন অবস্থায় পাশের একটি বাইশের তরুণ দিব্যি ইয়াঙ্কী টানে ইংরেজীতে বললে, আরে চলো, ওদিকে ঘোরা যাক। এদিকে যত রাজ্যের আজগুবি বাতে কান দেওয়ার চেয়ে ফটো নেওয়া অনেক ভালো।

এদিকে আবার পাখীর কথা। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ বেশ জমিয়ে নিয়েছেন। তিনি গল্প করছেন, ত্রেতাযুগের পরে দ্বাপরে তুই ভাই শম্ভু গুপ্ত আর মহা গুপ্ত এই মহাতীর্থে তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু তাদের তুইজনের ছিল তুই 'গোঁ'। একজন বলত শিব সবচেয়ে বড় দেবতা, আরেকজন বলত শক্তি শিবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। তুজনেই পরম ভক্ত। তুজনেই তাদের বিশ্বাসে অটল। কেউ যখন হার মানতে রাজী নয় তখন একদিন উভয়েই শিবকে ধরে পড়লেন, শিব ও শক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠতর কে?

ভক্তের প্রশ্ন শুনে শিব হেসে বললেন, তোমরা বোকার মত প্রশ্ন করছ কেন। কে না জানে, শিব-শক্তি অভিন্ন।

কিন্তু শিবের কথায় তু'ভাইয়ের একজনও সন্তুষ্ট হতে পারেনি। নিরুপায় শিব তু'য়ের দ্বন্দ্ব মেটাতে অক্ষম হয়ে তাদের তুটিকে পক্ষীদেহে রূপান্তরিত করলেন।

তারপরে চৈতন্য হলে পক্ষীরূপী তুই ভাই এই তিরু-কলু-কুন্‌রমে

দীর্ঘকাল শিবের তপস্যায় কাটিয়ে শেষে ইন্দ্রতীর্থে স্নান করে পুনরায় নরদেহ লাভ করেন।

কলিতে এখন কারা আসেন, ঠাকুরমশায়? উৎসুক কণ্ঠের প্রশ্ন শোনা যায়।

ঠাকুরমশায় মুখ খুলতে যেতেই আবার সেই ছাত্র-ছাত্রীর দলটি এসে উপস্থিত। তাদের মাঝখানে সেই অত্যাধুনিকা, ঠিক যেন মক্ষিরাণী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমনভাবে তাকাচ্ছে, দেখলে বেশ বোঝা যায় উদ্দেশ্যটা সহজ ও সামান্য নয়।

দক্ষিণী ব্রাহ্মণের চক্ষু প্রায় চড়কগাছ হবার অবস্থা এমনি দলটির হাবভাব। হঠাৎ দলের মধ্য থেকে এক নওজোয়ান এগিয়ে এসে বললে, কিহে ব্রাহ্মণ, তোমার কাশীর পাখী-না ঠিক-ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় এগারোটায় আসে? ঘড়িতে তো সাড়ে এগারো বাজে, এখনো পাখী আসে না যে। আর পনেরো মিনিট মাত্র সময় দিলাম, তার মধ্যে পাখী না এলে............

যে কথা বলছিল তার ভঙ্গীতে ব্রাহ্মণ ভ্রূক্ষেপ না করলেও অত্যাধুনিকা হেসেই খুন।

জনতার মধ্য থেকে কেউ কেউ রেগে আগুন হয়ে উঠতে চাইছিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, বাবারা, আরেকটুখানি অপেক্ষা করেই দেখ না।

তাঁর কথা শেষ হতে-না-হতে আবার আকাশে সকলের চোখ গেল। সঙ্গে সঙ্গে সবার মধ্যে কেমন এক চাঞ্চল্য। কেউ বললে, এসেছে, এসেছে। কেউ চীৎকার করে উঠল, জয় পক্ষীমহারাজ কী জয়! কেউ বা ক্যামেরা খুলে ছবি নেবার ব্যস্ততায় অন্যের পা মাড়িয়ে দিলে।

পাথরের পরে কালো মিশমিশে শরীর, গায়ে ভারি, আধা-মাথা মোড়ানো, প্রকাণ্ড টিকিধারী, পূজারী বামুন প্রসাদের পাত্র পায়ের কাছে নিয়ে বসে, সেই পাত্র থেকে প্রসাদ তুলে পাখী দুটির সামনে ধরতে, একে একে দুটি পক্ষীই সে-প্রসাদ পেতে শুরু করে দিলে।

॥ ৭ ॥ পক্ষীতীর্থে বেদগিরীশ্বর আশ্রমে

পাখীর কাছে দর্শনার্থীদের ভীড় জমতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু প্রতিটি দর্শকই দুটি পাখীকেই ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে। তাদের দেহবর্ণ বিবর্ণ সাদা, ঠোঁট দুটি হলুদের আভায় রঞ্জিত। জনতায় অভ্যস্ত শান্ত ভাব এদের প্রসাদ পাবার সময়কার, স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

দক্ষিণী ব্রাহ্মণ জয়ের দ্যুতি চোখে নিয়ে সমবেত দর্শনার্থীদের চার পাশে ঘুরে ঘুরে বলে বেড়াচ্ছেন, দেবতা-দু'জন গঙ্গাস্নান করে এত দূর-যোজন পথ উড়ে এলেন, তাই তাঁদের পরিশ্রান্ত দেখাবার কথা। তবে দেবতা কিনা, সেই কারণে দেখুন না, ভালো করেই দেখুন, কেমন সজীব দেখাচ্ছে। এখন আবার প্রসাদ সেরে ছুটবেন রামেশ্বরমে। সেখানে শিবের পূজো ক'রে রাতের মধ্যে ফিরে যাবেন হিমালয়ের পবিত্র শিখরে। দেবতা না হলে এতদূর পথ কে আর উড়তে পারে।

পাছে কেউ এতেও আস্থা পুরোপুরি না করে, তাই দক্ষিণী ব্রাহ্মণ জোর গলায় বলে যান, যারা বিশ্বাস করতে না চায়, দেখাক না তারা তাদের এরোপ্লেন একদিনে ক'বার হিমালয়-রামেশ্বরম পরিক্রমার হিম্মৎ রাখে।

একদিকে ব্রাহ্মণের আত্মপ্রসাদ প্রচার চলছিল, অন্যদিকে পক্ষী দুটি আহার শেষে আকাশে উড়ে গেল। গোটা দু-তিন ঘণ্টার উত্তেজনা, অদেখাকে দেখবার অস্থির চাঞ্চল্য ক্রমশঃ মিলিয়ে যেতে লাগল। অত্যাধুনিকাকে মাঝখানে নিয়ে 'ছুটির-মজা-লুটি' দল তাদের পথ ধরল। কেবল ভারতের হরেক প্রান্তের সাধারণ মানুষ, যারা তর্ক বিচার করতে আসেনি, এসেছে তীর্থ করতে; যা কিছু তীর্থের মহিমা, কথা, গাথা, কল্পনা, জল্পনা, কিংবদন্তী সকলি বিশ্বাস করে রেখেছে এ পথে পা বাড়াবার বহু আগে থেকে, তারাই এখন অশেষ শ্রদ্ধায় পরম ভক্তি সহকারে পাখী দুটির ঠোঁট-ছোঁয়ানো প্রসাদ গ্রহণ করতে মহাব্যস্ত। যাদের পয়সা আছে, তাদের কাছে বেশ দামে প্রসাদ বিক্রী হচ্ছে। সে প্রায় কালোবাজারের

কারবারেরই মতন কাণ্ডকারখানা। সে গলাকাটা কারবারে মাথা গলিয়ে দেবার ইচ্ছে ও আস্থা যাদের নেই তাদের চোখে এ দৃশ্য বড় বিসদৃশ ঠেকলেও কোন কোন দরিদ্র তীর্থযাত্রীর সামান্য এক ফোঁটা প্রসাদ নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারির অবস্থা যেন আরো অসহনীয়।

একে একে সবাই আশপাশ থেকে বিদায় নিয়ে কোথায় যে চলে গেল, কারো কোনো সঠিক ঠিকানা জানা হল না। পাহাড়ের গায়ে এখানটায় অনেকটা জায়গা নিয়ে যে পক্ষী-দর্শন অঙ্গন, সেই অঙ্গনে একটু আগে কি-না আনন্দ-উচ্ছ্বাস জমজম করছিল। আর পক্ষীদ্বয় বিদায় হতে না হতে এ স্থান সহসা স্তম্ভিত হয়ে গেল। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, পূজারিগণ প্রসাদ বিক্রী ও বিতরণ সেরে সিঁড়ি বেয়ে সুউচ্চ পাহাড় শীর্ষের মন্দির-গহ্বরে অন্তর্হিত হলে পরে মনে জাগল, তাই তো আমি কেবল একেলা এখানে রয়ে গেলাম।

সহসা একটি সুমিষ্ট স্বর উপর থেকে ভেসে এসে আমায় যেন ডাকলে, আয় আয় আয়। ঐ ডাকের আওয়াজ লক্ষ্য করে সিঁড়ি ধরে আমি উঠে গেলাম। পাশের একটি দরজা দিয়ে ঢুকতেই যে বহুকালের প্রকোষ্ঠটি, তার মধ্যেকার আবহাওয়ায় কেমন একটা শৈত্যের ভাব ছিল, সে অকস্মাৎ আমার সর্বাঙ্গে যেন চন্দনের প্রলেপ লেপে দিল।

মধ্যাহ্ন। চারপাশ মধ্যরাতের মত নিস্তব্ধ। পাহাড়টি রীতিমত উঁচু। তারই শিখরে এ কক্ষ! এরই জানলা দিয়ে বহুদূর নীচে রেখার মত পথটা চোখে পড়ে। সে পথও এখন জনশূন্য। চতুর্দিকে অসংখ্য সবুজ বৃক্ষরাজি। কাছে দূরে আরো কয়েকটি পাহাড়ের চূড়া। সেখানেও স্তব্ধতা।

এরই মাঝখানে মধ্যাহ্নে প্রায় অন্ধকার কক্ষে দুটি মানুষ। জানলা দিয়ে অতি সন্তর্পণে তাদের চোখেমুখে যেটুকু আলো পড়েছে, তাতে বিমুগ্ধচিত্তে তারা বাজিয়ে চলেছে নাদেশ্বরে অপূর্ব একটি সুর। নগ্ন গাত্র, পাতলা শরীর, মস্তক মুণ্ডিত, প্রকাণ্ড টিকি, এ দুটি বাদক একমনে অন্তরের সমস্ত আবেগ মন্থন করে ঢেলে দিচ্ছে নাদেশ্বরের নাদে। সুরে খাদ নেই, রাগে ভেজাল

নেই, তালে বেঠাম নেই, একটি অন্তর-নিংড়ানো আর্ত নম্র নিবেদন দেবতার চরণে অর্পণ করে চলেছে।

এ নিবেদনের মধ্যে এমন একটি অভিনব আত্মনিবেদনের সহজ ভাব ফুটে উঠেছে, সে যেন সন্তর্পণে জানলা দিয়ে ঢোকা আলোর মত সুদুর্লভ। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেছলাম। তন্ময়তা ভাঙল নাদেশ্বর থামলে।

আমার দিকে বাদকদ্বয় বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে চাইতে আমি বললাম, আরেকবার শোনান।

কথার মধ্যে কী ছিল কে জানে। অনতিবিলম্বে বাদকদ্বয় মুখে তুলে নিলে নাদেশ্বরম। কোনদিকে দৃক্‌পাত না করে নিমীলিত চোখে যখন প্রথম সুর তুললে, মনে হল, রাত্রির আবির্ভাব আসন্ন। সে আসন্নতা কাটিয়ে অকস্মাৎ এক সময় প্রোজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় সমস্ত অন্ধকার মুছে দিলে। তারপর চারপাশে সুরের আগুন বসন্তের হাওয়ায় ফুলে ফুলে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কক্ষের শৈত্য ছুটে পালাতে দিশা পেল না। কক্ষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আগুন পরিব্যাপ্ত হতে কেমন যেন সর্বাঙ্গ উষ্ণ হয়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ আবার সুরের জলপ্রপাত। অগ্নিদগ্ধ মৃত্তিকার বিদীর্ণ বুক ভাসিয়ে বয়ে গেল প্রাণদায়িনী অমৃতময় স্রোত। ঐ স্রোতের উপরে আলোকের সোনালী রেখা নেচে বেড়াতে বেড়াতে সর্বদিক অপূর্ব ব্যঞ্জনায় রঞ্জিত করে তুলল।

নাদেশ্বর থামল। আমার চোখেমুখে বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। সে বিস্ময় কাটিয়ে উঠে যে প্রশংসা প্রকাশ করতে চাইলাম, তা পূর্ণতা পাবার আগেই বাদকদ্বয় শিশু-সুলভ আনন্দের হাসিতে অবগাহন করে উঠল।

তারপর যা ঘটল সেই ঘটনা অন্তরে আজীবন উৎকট যন্ত্রণার দাগ কেটে রয়ে গেল। যারা এইমাত্র অশ্রুতপূর্ব অনির্বচনীয় আনন্দের প্লাবন বইয়ে দিলে অমৃতময়ী সুরে, যে রাগ-রাগিণীর কল্যাণে মুহূর্তে মর্ত্যলোকের বহু উর্ধ্বে এ আত্মা আরোহণ করেছিল তারই স্রষ্টারা সহসা অবসাদগ্রস্তের মত নেহাৎ আনাড়িভাবে হাত বাড়িয়ে দিলে……

দীনের এমন করুণ চাহনি এ জীবনে এমন পরিবেশে আর কখনো

দেখিনি। সুরের রাজ্যে এত তীব্র ছন্দপতন ইতঃপূর্বে কোনদিন চোখে পড়েনি। কোন্ অবস্থাতে পড়লে সুরের অমৃত পরিবেশন করবার পর মর্ত্যে সুরলোক-স্রষ্টাদের এই দুটি প্রতিনিধি সাধারণ যাত্রীর কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়, সে ভাববার বটে।

এমন অবস্থায় আমি যদি আমীর হতাম, হয়তো একটি জমিদারীই দুই বাদকের অমৃতরস পরিবেশনের মূল্যস্বরূপ দিয়ে দিতাম। আমি যদি ঐশ্বর্যশালী জমিদার হতাম, ঐ দু'জন শিল্পীর বাকী জীবনের ভার নিজের স্কন্ধে বহন করবার সুযোগ পেলে বর্তে যেতাম। পরিবর্তে চাইতাম শুধু প্রত্যহ প্রভাত-সন্ধ্যায় নাদেশ্বরের অবিনশ্বর রাগ-রাগিণীর সামান্য একটু-খানি। আমার পকেট যদি ভরা থাকত মুঠো মুঠো মণি-মুক্তায়, আমি তার মধ্য থেকে বেছে বেছে সেরা মুক্তাগুলি শিল্পীর করে অর্ঘ্য দিয়ে ধন্য হতাম।

কিন্তু হায়, যারা আমীর ছিল, সত্যিকারের আমীর, তাদের দিন গিয়েছে। যে জমিদারের ঘরে ঘরে রাত-দুপুরে 'মাইফেল' বসত, এক-এক-জন শিল্পীর খাতির করতে খাজাঞ্চীখানা এক রাত্রিতেই উজাড় হয়ে যেত, সে জমিদার জাতটাই আজ অস্তলোকের অন্তরালে আত্মলোপ করতে চলেছে। আর চলমান ভারতীয় বৈশ্য যুগে মণি-মুক্তার স্থান দখল করেছে বিদেশের আমদানী রকমারি রঙীন কাচে।

শিল্পীর মর্যাদা নয়, পারিশ্রমিক নয়, সামান্য হাত পেতে চাওয়া ভিক্ষাটুকু মেটাবার সাধ্য, সেই-বা কোথায়! পকেটে হাত দিয়ে কিছু তুলে দিতে গেলেই বিচিত্র ভাবনায় অন্তর চমকে ওঠে। এক মনের ঔদার্য বলে, এত অল্প দিয়ে, কোরো না—কোরো না অপমান। অন্য মনটি চীৎকার করে ওঠে, যাহোক কিছু দিয়ে দাও, স্মরণ রেখো, 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'!

কে যেন শিল্পানুভূতির, শিল্পী-অনুরক্তির গলাটাকে শক্ত করে চেপে ধরে। আর কে যেন হাতের মুঠো পকেটের মধ্যে গলিয়ে ক্ষুদ্র হাতে তুলে দেয়, সামান্য কিছু দান। তাই সানন্দে বাদকদ্বয় গ্রহণ করতে, বাইরে মুখটা হাসে বটে, অন্তরটা ডুকরে কেঁদে ওঠে: 'তোমায় কেন দিইনি আমার সকল শূন্য করে।'

এ কক্ষের অভ্যন্তরের সিঁড়ি দিয়ে কয়েক পদ উঠলেই মূল মন্দির। এ মন্দিরের নাম 'বেদগিরীশ্বর'। বেশীর ভাগ যাত্রীই এই মন্দির কক্ষে পদার্পণ না করে নিম্নে অবস্থিত পক্ষীতীর্থে পক্ষী দর্শন সেরে যার যার গন্তব্যস্থলে চলে যেতে পারলে যেন বাঁচে। বহু পুরাকালের এই পর্বত-শিখরশীর্ষের মন্দিরের পাথরের ইতিহাস নেওয়া তো দূরে থাক, কেউ বড় একটা এ মন্দিরকে কেন 'বেদগিরীশ্বর' বলা হয়, সে প্রশ্নও করে না। তা ছাড়া 'বেদগিরীশ্বরের' স্থাপত্যে যে একক বৈশিষ্ট্য বর্তমান সেও অনেকের দৃষ্টি অতি সহজেই এড়িয়ে যায়।

'বেদগিরীশ্বর' সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাসেরও আগের কালে এ পৃথিবীর মানুষ অধার্মিকতায় মজে গিয়ে বেদ পাঠ ভুলে যেতে বসেছিল। শিব তখন বেদকে চার ভাগে ভাগ করে ঋষিদের হাতে অর্পণ করে বললেন, এখন থেকে আপনারা বেদকে স্মৃতিতে সঞ্জীবিত রাখবেন। কিন্তু কালক্রমে ঋষি-পুত্ররা ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন, হে প্রভু, বেদকে এমন রূপ দান করুন যাতে সকলেই সমান ভাবে তাকে বরণ করে নিতে পারে। পুরাণে নাকি কথিত আছে, শিব সবার বরণীয় করে বেদকে পাহাড়ে রূপান্তরিত করলেন। তারই রূপ এই বেদগিরি। এরই অধীশ্বর স্বয়ং শঙ্কর এখানকার মন্দিরে যুগ-যুগান্তর ধরে পূজিত ব'লেই একে বলা হয় 'বেদগিরীশ্বর'।

লোকপ্রবাদ, এখানকার চারটি গিরিশিখর চতুর্বেদের প্রতীক। প্রথম শিখরটি ঋগ্বেদ, দ্বিতীয়টি যজুর্বেদ, তৃতীয়টি সাম ও চতুর্থটি অথর্ববেদ এবং এরই শিরে শিব সমাসীন।

এ রূপকের ব্যাখ্যাতারা বলেন, বেদ হচ্ছে স্বর্গের সিঁড়ি। যারা এ সিঁড়ি বেয়ে শেষ পর্যন্ত যায় না, তারা কখনও স্বর্গীয় লোকে পেঁছিতে পারে না। সত্যিমিথ্যে যার যার মনের কাছে, জ্ঞানের কাছে। তবে বহু-জ্ঞানী বহুজন দেশ-বিদেশে অসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন যে, আঁকাবাঁকা বন্ধুর পথ, পাহাড়-পর্বত, মরু-মেরু ধূ ধূ প্রান্তর পরিক্রমায় মানুষে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তার অনিন্দ্য আনন্দ স্বর্গীয় ও অক্ষয়।

বেলা যে কখন দুপুর গড়িয়ে গেছল, খেয়ালই ছিল না। মন্দির থেকে বাইরে যখন এলাম, তখন কে আর সম্বর্ধনা করবে একমাত্র উত্তপ্ত সূর্যালোক ছাড়া। প্রখর সূর্যের আলো অনাবৃত আকাশের তলে লম্বা সিঁড়িগুলো জ্বালিয়ে তুলেছিল। এর কয়েকশত সিঁড়ি অতিক্রম করে নীচে নেমে যেতে আর ইচ্ছে করল না। কাছেই কোথাও ছায়াঘেরা আশ্রয় জোটে কিনা তারই খোঁজ করতে করতে সেই কৃষ্ণচূড়াতলায় গিয়ে যখন হাজির হলাম, তখন ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে। ক্ষুন্নিবৃত্তির কোনরূপ আশা এখানে নেই দেখে, লোহার শিকের পাঁচিলের ওপাশ দিয়ে, এক রকম হাতের মুঠোয় জীবন নিয়ে নামলাম গিয়ে পক্ষীতীর্থে।

অঞ্জলি ভরে আকণ্ঠ পান করলাম পক্ষীতীর্থের তীর্থম, অর্থাৎ জল। তামিলে জলকে, পবিত্র জলকে বলা হয় তীর্থম। জল যে জীবন, সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ রইল না। ক্ষুধা কোথায় তলিয়ে গেল। পাহাড়ের সুউচ্চ এক বক্ষদেশে গভীর খাদের মধ্যে সঞ্চিত স্বচ্ছজলে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হল। সেই আমাকে জানিয়ে দিল, এই রোদে পথে বেরোলে মোটেই ভাল হবার নয়।

তাই তীর্থম মাথায় ছিটিয়ে অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে উপরে উঠে এলাম। এসেই দেখি, সেই অত্যাধুনিকা একটি দু'টি নয়, চারটি যুবকের মাঝখানে পাথরে পা ছড়িয়ে বসে আছে। কে জানে এদের আর সব এখন কোথায়।

যেখানেই হোক, এখানে আর আমার থাকা শোভা পায় না। স্বাভাবিক শালীনতায় বাধে।

এরপর সেই তপ্ত সূর্য মাথায় করে খাড়া পথ বেয়ে নীচে নামতে লাগলাম। সিঁড়ির দু'পাশে সোপানদাতাদের নাম ও দানের পরিমাণ প্রস্তরফলকে খোদিত দেখা যায়। মানুষ দানধ্যান যাই করুক, কতটা যে তার খাঁটি আর কতটাই বা নামের কামনায় এ যেন তারই সামান্যতম নমুনা।

॥ ৮ ॥ বেদগিরির আশেপাশে

পাহাড়ের পাদদেশে নেমে এই আগুনে অপরাহ্নে পথ ভেঙে আর চলতে সাহস হয় না। চোখের সামনে সেকেলে সংস্কারহীন এক 'চটি' চোখে পড়ায় সেখানেই ঢুকে পড়লাম। ভেতরে দিনের বেলায় প্রায়ান্ধকার। চতুষ্কোণ পুরাতন অট্টালিকার মধ্যস্থলে অঙ্গন। অঙ্গনের ঠিক মাঝখানটায় জলের কূপ। তার পাশে গিয়ে তলার দিকে চাইতে দেখি, কাকচক্ষু জল টলমল।

পাশেই একটি জল তোলবার সরজ্জু বালতি। আর কূপের বৃত্ত ঘিরে পাতাবাহারের টব। ওদিকের দেওয়ালে কাঠ পোড়ানো ঘন ঘন কালির দাগ নীরবে সাক্ষ্য দিচ্ছে, একদিন এখানে তীর্থযাত্রীরা ভীড় করে থেকে গেছে।

কাছে, চোখের সামনে কোন জনপ্রাণী না থাকায়, বালতির আংটা নেড়ে আওয়াজ করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ আওয়াজের পর একজন মহিলা এক দেওয়ালের দরজার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে আশ্রয়ের কথা বুঝিয়ে বলতে গিয়ে ভাষার বিভ্রাটে জড়িয়ে পড়ি পড়ি এমন সময় গায়ে একটি পুরানো পিরান চড়াতে চড়াতে এক বয়স্ক ভদ্রলোক সামনে এসে হাজির হলেন। পুরুষের উপস্থিতিতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তাঁরও চোখ দুটি সহসা উজ্জ্বল হয়ে জানিয়ে দিল যে, তিনি বিশেষ আগ্রহে যাত্রীর প্রত্যাশী।

ভদ্রলোক সাধারণ কাজ চালাবার মত ইংরেজী জানেন। কথায় কথায় জানলাম, একাধিক ভারতীয় ভাষার দশ-বিশটা শব্দ, দু'চারটে বাক্য তাঁর আয়ত্তে। এমন লোকের সঙ্গে ভাব জমাতে যে বিষয়ের ঠিক ঠিক অবতারণার প্রয়োজন তারই আশ্রয় নিয়ে বললাম, আপনি তো বাংলাও জানেন দেখছি!

কুছু কুছু!—তিনি উত্তর করলেন।

অমনি ভাব জমে গেল। অবসাদে ভারি দেহ বিশ্রাম চাইছিল।

বিশ্রামের আগে শরীরটাকে পরিষ্কার করে নিতে চাইতে তিনি বললেন, "আমি জল তুলে দেবে।"

তার প্রয়োজন ছিল না। মাটি থেকে সামান্য নীচেই জল। আমি বালতি নামাতে গেলে তিনি হাত থেকে রশিটি এক রকম জোর করে টেনে নিয়ে যাত্রীর কাজে নিজেকে লাগিয়ে তবে ক্ষান্ত হলেন।

মাদ্রাজ রাজ্যে বহু জায়গায় জলের বড় অভাব। পাহাড় অঞ্চলে জল শুনেছিলাম একরকম অমিল। কিন্তু এখানে এই কূপে দেখছি অফুরন্ত জল, যেমন ঠাণ্ডা তেমনি নির্মল।

জলের কাজ সেরে বারান্দায় রাখা কাঠের বেঢঙ বেঞ্চে বসে পড়লাম। প্রসন্ন মুখে ভদ্রলোক পাশে দাঁড়িয়ে খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন, এখন আমার কি কি প্রয়োজন।

আপাতত আমার আর কিসের প্রয়োজন, একমাত্র এখানকার চারপাশটা ঘুরে-ফিরে দেখা ছাড়া! বেদগিরির শিখর থেকে কতকগুলি মন্দিরের মত কি সব দেখা গেছল, সেগুলি কাছেই নিশ্চয় কোথাও। তাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অন্তর উদগ্রীব হয়ে ওঠায় বললাম, এখানে বেদগিরির মন্দির তো দেখলাম, আর কি কি দেখবার আছে?

চোখহু'টি ছানাবড়া করে ভদ্রলোক বললেন, বলেন কি, চারপাশে কাছে-দূরে মন্দিরের মেলা, কোন্ যুগ-যুগান্ত থেকে কে বসিয়ে রেখে গেছে, আর আপনি বলছেন কি কি দেখার আছে! চলুন আপনাকে মন্দির দেখিয়ে আনি।

তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় পা দিয়েই ভদ্রলোক বললেন, এখানে রামস্বামী আইয়ারকে চেনে না, এমন লোক পাবেন না। একবার মন্দিরে ঢুকলেই দেখবেন, পূজারী থেকে ট্রাস্টী পর্যন্ত কেমন খাতির করে চলে।

সামান্য কিছুদূর হেঁটে চারধার পাথরে বাঁধানো এক পুকুরের পাশ দিয়ে আমরা মন্দিরের সামনে এসে পড়লাম। আমি তো থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে ঘাড় উঁচু করে আকাশে তাকালাম, যদি মন্দিরের গগনচুম্বী চূড়া দেখতে পাই!

ঐভাবে তাকাতে তাকাতে ঘাড় ব্যথা হয়ে গেল, তখনো বিস্ময় শেষ হতে চাইছিল না। কি প্রকাণ্ড, কত উচ্চ এই মন্দির। আর তার সর্বাঙ্গের কারুকার্য, কে তার বর্ণনা করতে পারে!

অকস্মাৎ রামস্বামী বললেন, চলুন ভেতরে চলুন।

অবাক কণ্ঠে উচ্চারিত হল, ভেতরে!

মন্দির দেখবেন না?

এই-তো দেখছি।

এ তো মন্দির নয়। এ গোপুরম।

গোপুরম বলতে·········

সে জানেন না? 'টেম্পল টাওয়ার'।

কথাটা যেন চোখ-ধাঁধানো। এককালে বিদেশী রাজের কল্যাণে যত্রতত্র ক্লক টাওয়ারের খুবই প্রচলন হয়েছিল। তারও অনেক আগের আমল থেকে তাহলে এ দক্ষিণদেশে 'টেম্পল টাওয়ারের' চলন। সে যাই হোক, মন ঐ বিদেশী শব্দে খুশী হতে না পেরে খুঁত-খুঁত করতে থাকায় হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়ঃ সে কেমন, গোপুরমের উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে জানেন কি?

জানি বৈ-কি। রামস্বামী বলতে লাগলেন, দূর-দূরান্তের দর্শনার্থীদের কেউ কেউ জানতে চান, তাই আমাকেও না জানলে কি চলে। এই যেমন কিছুদিন আগে কলকাতার কয়েকজনকে মন্দির দেখাবার সময় তাদের গবেষণা শুনছিলাম, গোপুরম হয়ত বিশ্বজননী, যাঁর দেহে বিশ্ব-রূপের স্থান সেই গোমাতার নাম থেকেই এসে থাকবে। আসলে গোপুরম একটি সংস্কৃত শব্দ। এর অর্থ ইংরেজীতে 'টাওয়ার'।

অর্থ গোপুরমের যাই হোক, এরই তলদেশের প্রকাণ্ড দরজা দিয়ে মন্দিরের অঙ্গনে প্রবেশকালে মনে হল, প্রকৃতপক্ষে গোপুরম মন্দির-তোরণ।

অঙ্গনে ঢুকতেই সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ। এ প্রাঙ্গণকে মন্দিরের ভাষ্যে বলা হয়, প্রকারম্। রামস্বামী আইয়ার এক রকম মুখস্থের মত বলে

যান, এ মন্দিরের প্রকারম একটি নয়, দুটি। এই যে দেখছেন, এ প্রকারমের দৈর্ঘ্য পাঁচশত ফিট। এর পরে অন্দরের দিকের প্রকারমটির দৈর্ঘ্য তিনশত ফিট। প্রথম প্রকারমে প্রবেশের পথ চারটি। সেই চারদুয়ার ছাড়া ছোট আরো দুটি দরজা রয়েছে উত্তরে ও দক্ষিণে।

এই যে পূবের গোপুরম-পথে আমরা প্রকারমে প্রবেশ করলাম, ঐ দেখুন সুমুখে মাথা তুলেছে 'ঋষি-গোপুরম'। ঋষি-গোপুরমের প্রবেশপথ অতিক্রম করলেই একদিকে চোখে পড়ে একটি ছোট্ট অথচ অনিন্দ্যসুন্দর পাথরের মন্দির। এই মন্দিরটি, রামস্বামী জানালেন, বিনায়কমের।

এখানে মূর্তি দর্শন করে বুঝলাম, বিনায়কম বিঘ্ন-বিনাশন সিদ্ধিদাতা গণেশ বৈ আর কেউ নন।

বিনায়কম মন্দিরের একপাশে ষোড়শস্তম্ভমণ্ডপম্। এর ষোলটি স্তম্ভ অপূর্ব কারুকার্যখচিত। ওপাশে ভিত-তোলা আরেকটি মণ্ডপ। রামস্বামী সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, ঐ যে মণ্ডপটি দেখছেন, ওর নাম আমি-মণ্ডপম্। আমি অর্থাৎ কচ্ছপ। কচ্ছপের পিঠে ভর দিয়ে মণ্ডপের ভিতটি দাঁড়িয়ে আছে তাই এ নামকরণ।

ওখানে গিয়ে দেখি, চারিদিকে অসংখ্য দর্শনীয় কারুকার্যের সমাবেশ। এগুলিকে শিল্পের উৎকর্ষ পরিমাপের মানদণ্ডে দাঁড় করালে এরা যে-কোন মান অতিক্রম করে যেতে পারে। আমার তো মনে হয় ভারতীয় স্থাপত্যের নিখুঁত নিদর্শন হিসাবে এদের বিশ্বের দরবারে যোগ্য আসন লাভের সম্ভাবনা কেউ-ই অস্বীকার করতে পারবেন না।

দ্বিতীয় প্রকারমে প্রথমেই চোখে পড়ে, ধ্বজস্তম্ভ। ধ্বজস্তম্ভ বা পতাকাদণ্ড ঠিক ভক্তবৎসল মন্দিরের সুমুখে অবস্থিত। এ মন্দিরে শিব তেষট্টিজন ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে বিরাজ করছেন। তাদের কারো বা মূর্তি ধাতুতে গড়া, কারো-বা পাথরে কুঁদে তোলা।

আশেপাশে সোমস্কন্দ, বেদগিরীশ্বর, বিনায়ক, সুব্রাহ্মণ্য, বীরভদ্র প্রভৃতি দেবতার ছোট ছোট মন্দির ছড়িয়ে রয়েছে। এর এক একটি মন্দিরের কারুকার্য ও স্থাপত্য নিয়ে গবেষণা করতে মাসের পর মাস কেটে

যায়, খণ্ডে খণ্ডে প্রশস্তি লেখা চলে, তবু এর সত্যিকারের পরিচয় পূর্ণ হতে পারে কি না সন্দেহ।

মণ্ডপে মণ্ডপে স্তম্ভে খোদাই মূর্তিগুলি যে কোন প্রশংসার যোগ্য। কোন কোন মন্দিরের দেবতার বিগ্রহ—সেও সৌন্দর্যের আকর।

এখানে "প্রত্যক্ষ বেদগিরীশ্বরে"র মন্দিরের পূর্বদিকে যে সুন্দর সভাগৃহ, তারই স্তম্ভগুলি একে একে রামস্বামী দেখাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, এই যে দেখছেন পাথরে খোদাই করা মূর্তিগুলি, এই দেখুন হস্তীবাহিনী, এই দেখুন উষ্ট্রবাহিনী, আর এই যে অশ্ববাহিনী—এগুলির ভাষা পড়লে আপনার কি মনে হয় না যে, কোন একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি হয় সংগ্রামে নয় শিকারে চলেছেন।

সে তো হয়ই, আমি উত্তর করলাম।

রামস্বামী আরেকটি মূর্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, এই দেখছেন কিরীটভূষণ ধনুকধারী ধনুকে তীর যোজনা করছেন—ইনি পাশের এই সহচরসহ যেভাবে বীরদৃপ্ত ভঙ্গিমায় ঈষৎ ঝুঁকে দণ্ডায়মান তাতে সহজেই অনুমান করতে পারেন সামান্য কেউ ইনি নন। পুরাতন পণ্ডিতেরা বলেন, ইনিই হচ্ছেন চোলনরপতি শূরগুরু। আর অশ্ব হস্তী উষ্ট্রবাহিনী এঁরই। ঐ যে ধনুকে শরযোজনা, ঐ শর শিকার সময়ে যে সজারুকে বিদ্ধ করেছিল, রামস্বামী কণ্ঠ ভরাল করে বলতে লাগলেন, সেই সজারুর দেহ থেকে বেরিয়ে এল একটি মানুষ। এরই পাশে এই যে দেখছেন পাথরে খোদাই ভাস্কর্যাবলী, এই দেখুন তীরবিদ্ধ গাভীর দেহ থেকে বেরিয়ে এসেছেন একটি অপূর্ব সুন্দরী।

নৃপতি শূরগুরু পরপর এই পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তাঁর প্রাণ রথের চাকার তলে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এমন সময় ঐ দুটি নরনারী নরপতিকে আত্মহত্যায় নিবৃত্ত করে জানালেন যে, এ বিধিলিপি। তাঁদের পাপের ফলে তাঁরা দুজন প্রাণীদেহে দীর্ঘকাল দণ্ডভোগ করছিলেন। শূরগুরুর শরাঘাতে সে দণ্ডমুক্তি সম্ভব হয়েছে।

এমনি বহু কিংবদন্তী পাথরের 'প্যানেল'গুলিকে নিয়ে যুগযুগান্তর

ধরে চলে আসছে। 'প্যানেলের' পাথরভাষ্য পড়ে দেখলে কিংবদন্তীর কাহিনীগুলির সঙ্গে যথেষ্ট মিল দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্যি শূরগুরুর শিকারকালে অনিচ্ছায় গাভীহত্যা কর্ণের মৃগভ্রমে পুণ্যবতী পয়স্বিনী হত্যার কাহিনীর সমগোত্রীয়। কেবল পার্থক্য এই যে, কর্ণ ছিলেন পূর্বজন্মে অভিশপ্ত আর শূরগুরু অভিশপ্ত তো ননই বরং ভাগ্যবান। তাই কর্ণের মৃগভ্রম হল পয়স্বিনীকে দেখে, শূরগুরুর শরে মুক্তি পেল অপূর্বসুন্দরী।

কিংবদন্তী অপূর্বসুন্দরীর সম্বন্ধে যে আলোক দান করেছেন, সেও পুরাকাহিনীর ভাণ্ডারে সমুজ্জ্বল একটি রত্নবিশেষ।

শূরগুরুর শরাঘাতে হত গাভীর দেহ থেকে,—তিনি যখন গোহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করতে স্বীয় রথের চাকার তলায় জীবন বিসর্জন দিতে চলেছিলেন —সেই সুন্দরী বেরিয়ে এসে নিবেদন করলেন, নরপতি তিলোত্তমাকে শাপমুক্ত করেছেন।

সে কথা শুনে শূরগুরু অবাক্ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকায় শাপমুক্ত তিলোত্তমা তাঁর ইতিবৃত্ত বর্ণনা করলেন।

কিংবদন্তীর কথায়, তিলোত্তমা একবার শিবের বৃষকে তাঁর প্রতি আকর্ষিত করতে চেয়েছিলেন গাভীর রূপ ধারণ করে। কিন্তু নন্দী তিলোত্তমার ছলনা জানতে পেরে তাঁকে অভিশাপ দেন, এবার তোমার গাভীদেহই সত্য হোক।

দিনান্ত এগিয়ে আসছিল। মন্দিরের অঙ্গনে এখনো তবু আলো। এদেশে সূর্যের দাক্ষিণ্য অফুরন্ত। দিন শেষ হয়ে আসে, তখনো যেন আলো শেষ হতে চায় না।

এত প্রকাণ্ড মন্দিরে যাত্রীর ভীড় মোটেই নেই। এখানে সেখানে রোমন্থনরত গাভীর মত মন্দির-সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত লোকগুলি কেমন যেন ঝিমন্ত। স্বাস্থ্য এদের দিব্যি ভাল। কিন্তু প্রাণের দীপ্তি নেই বললেই হয়। কাজও তেমন নেই, খাটতেও কিছু একটা হয় না। সারা শরীরে চোখমুখে আলস্য ও আরামপ্রিয়তার নধর ছাপ। আর এদেরই সামনে দিয়ে ভিখিরী ছেলেমেয়েগুলি যাত্রীর পেছনে পেছনে আবেদন,

নিবেদন, যাচ্ঞা এমন কি ক্রন্দন করে ফিরছে। পয়সা দিয়ে যে বিদেয় করা যাবে তেমন সম্ভাবনাও কম। অদূরে আর আর দল ওৎ পেতে প্রতীক্ষা করছে, সঙ্কেত পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি!

এ সমস্যা না হয় একরকমে এড়ানো যেতে পারে, বিশেষ এখানে যখন পুরুত-পাণ্ডার প্রাণঘাতী দৌরাত্ম্য নেই তখন নিশ্চিন্ত মনে যতক্ষণ ইচ্ছা মন্দির দর্শন করে ফেরা যায়। কিন্তু বারবারই মনে হয়, এত বিরাট বিরাট গোপুরম, বহুবিস্তৃত মন্দির, সুবিশাল প্রাঙ্গণ আর অসংখ্য স্তম্ভের শিখরে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে যে মণ্ডপগুলি, তাদের যথোপযুক্ত পরিচর্যার বন্দোবস্ত না হলে এরা আর কতকাল টিকে থাকবে! হয়তো ভাবীকালে একদিন এদেরও দশা ঐ ভিখারীদঙ্গলের মতই শোচনীয় হয়ে উঠবে।

॥ ৯ ॥ তীর্থ-চটির অভিজ্ঞতা

পশ্চিম আকাশে অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। রামস্বামী আমায় নিয়ে ঘরের পথে পা বাড়ালেন। এই-টুকু চলাতেই তিনি হাঁপিয়ে উঠেছিলেন।

তাঁর ঘরে ফিরে দেখি সেখানে ঘনান্ধকার। সামনে সুউচ্চ পাহাড়-শিখরে বেদগিরীশ্বরের মন্দিরে বাতি জ্বলছে প্রকাণ্ড জোনাকির মত। আর তারই পাদদেশে চটি তথা রামস্বামীর আবাসে দীপ জ্বলেনি ভরসন্ধ্যাতে।

অন্ধকারে চোখ জ্বেলে রামস্বামী চতুষ্কোণ অঙ্গন পেরিয়ে ওপাশে কোথায় যেন ঢুকলেন। আমি তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে অন্ধকার ভেদ করতে চাইলাম। কিন্তু ওদিকে কালো দেওয়াল ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না। তবে কি রামস্বামী হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ কাটল। এক সময় কচি একটি মেয়ে মোমবাতি হাতে নিয়ে চতুষ্কোণ অঙ্গনে হাজির হয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল। হঠাৎ মোম গলে তার হাতে পড়ায় সে-দগ্ধহাত থেকে বাতিটি পড়ে গেল।

আবার অন্ধকার। সেই অন্ধকারে নিজেকে নিজেই দেখা যায় না, অন্যকে কেমন করে ঠাওর করব! কচি মেয়েটি সেখানে দাঁড়িয়ে, না, সেও হারিয়ে গেল, অনুমান করার জো ছিল না। কাউকে যে ডাকব তেমন অবস্থাও নেই! ওদিকে রামস্বামীরও পাত্তা একরকম নেই।

পায়ে পায়ে পথে বেরিয়ে এলাম। কি করা যায় তাই ভাবতে চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় রামস্বামী সেখানে এসে হাজির।

পথে অন্ধকার প্রগাঢ় নয়। এদিকের-ওদিকের এর-তার আলো ছিটকে এসে আরো কিছুটা অন্ধকার ঘুচিয়ে দিয়েছিল। তাই রামস্বামীর মুখ দেখতে আমার কষ্ট হবার তেমন কথা নয়। কিন্তু ঐ মুখের দিকে তাকাতেই কেমন যেন ভ্রম হল, এই কি সেই!

কিছুক্ষণ আগে যিনি সানন্দে, সহাস্যে দূরদেশী দর্শনার্থীকে মন্দির দেখিয়ে এনেছেন, এ যেন তিনি নন। ভদ্রলোকের মুখের চেহারা হঠাৎ পালটে গেছে।

কিছু একটা ঘটেছে আশঙ্কায় শঙ্কিতকণ্ঠে জানতে চাই—কি হল আপনার ?

তেমন কিছু নয়। একটু থেমে ফের বললেন, কটা পয়সা পেলে বাতি কিনে আনতাম।

আলোর অভাব পূরণ করতে হবে তাই বাতি কিনবার পয়সা দিতে আপত্তি ছিল না।

বাতি নিয়ে রামস্বামী ফিরে এলেন। সেই বাতি জ্বেলে তিনি আগে এগোতে এগোতে আহ্বান জানালেন তাঁকে অনুসরণ করে ভেতরে আসবার জন্যে।

ওদিকে দেয়ালের ওপাশে আরেকটি লম্বমান চতুষ্কোণ অঙ্গন। এর চারদিকে আচ্ছাদিত বারান্দা—মাঝখানটা আলগা। অবশ্যি যে অঙ্গনটি পেরিয়ে এসেছি তার অনুরূপ কূপ এখানে নেই। তবে দেয়ালে দেয়ালে কাঠ জ্বালিয়ে পাকের চিহ্ন। একদিকে অস্থায়ী উনুনগুলো স্তিমিত আলোকে অস্পষ্ট, যেন ঘুটমণ্ডলী পাকানো কোন জানোয়ারের কঙ্কালের মত দেখাচ্ছে।

যেদিকটায় রামস্বামী বাতি রেখেছেন, সে দিকে লম্বা করে টানা বারোহাতি শাড়ি মেলা। এককালে এ শাড়ির হয়তো রঙ ছিল একটা বিশেষ বর্ণের দাবি নিয়ে সারা জমি জুড়ে। আজ সে রঙ নেই। বিবর্ণতায় সকল বিশেষত্ব হারিয়ে শাড়িখানি এখন যেন এখানকার এমন একটি বিজ্ঞাপন জাহির করছে যা দৈন্যের দায়ে নীলামে উঠে বসে আছে।

দুকোণে দুখানি কামরা। দেয়ালের সঙ্গে এমনভাবে লাগানো যে সহসা চোখে পড়ে না। আমার চোখেও এতক্ষণ পড়েনি। তখনি পড়ল যখন ঐ পূবের দরজা দিয়ে একটি নারীমূর্তি বেরিয়ে এল।

নারীমূর্তিটি আমাদের দিকেই আসছিল। কাছে আসতে দেখা গেল, তার মাথায় কাপড় নেই, অথচ চলা রীতিমত সংযত। ভুলেই গেছলাম, মাদ্রাজে উচ্চশ্রেণীর মহিলারা মাথায় ঘোমটা দেন না।

মহিলাটির পেছনে একে একে চার পাঁচটি কাচ্চাবাচ্চা। তাদের সবাই চুপচাপ। সহসা দেখলে যেন ভ্রম হয়, বাড়ীতে শোক-বিয়োগ লেগেই আছে!

আমি ধুতি পাঞ্জাবী পরা। পোশাকে পরিষ্কার বাঙালীর জাতীয়তার নিদর্শন পরিস্ফুট। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কেমন করে যেন দেখছে। ওদের মুখগুলি খুব স্পষ্ট দেখা না গেলেও অনুমান করা যায়, অবাক ভাব কাটতে চাইছে না।

সহসা কানে আসে ঃ 'শেঠে'।

অমনি কাচ্চাবাচ্চাদের মুখে ওই—শেঠে—শেঠে—শেঠে ;······

আমি তো অবাক হয়ে রামস্বামীর মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। উদ্দেশ্য, শব্দটার অর্থ যদি তাঁর মুখ দেখে আঁচ করতে পারি। কিন্তু তেমন কোন সম্ভাবনা সহসা নজরে এলো না।

ওদিকে ভদ্রমহিলা রামস্বামীকে কি বলতে শুরু করলেন। পর্দা, আব্রু অপসারিত হওয়ায় আমি এক সময় বলেই বসলাম, জানতে পারি কি উনি কি বলছেন?

বলনা সরস্বতী, বলনা। নিজেই বল।

সরস্বতী ঠাকরুণ রামস্বামীর কথায় একটু সলজ্জ হাসি হাসলেন। সে-হাসির ইশারায় রামস্বামী স্বয়ংই বলতে লাগলেন, সরস্বতী বলছে, শেঠজী রাত্রিতে আর কোথায় যাবেন, এখানেই খাবেন তো! কিন্তু······

কিন্তু?

সরস্বতী বলছিল, শেঠজীর খেতে কষ্ট না হয় তার কি ব্যবস্থা?

রামস্বামী বললেন, আমি বলি, ঘরে যা আছে তাই খাবেন। সে কথা সরস্বতী শুনতে চায় না।

আমার জন্যে কষ্ট করবার আর দরকার কি।

যেই না এই কথা বলা তৎক্ষণাৎ সরস্বতী ও রামস্বামীর মুখ শুকিয়ে কাঠ। রামস্বামী না-হয় কথাটা আমার বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু সরস্বতী কি ইংরেজী বোঝেন। না বুঝলেও হয়তো অনুভূতিতে অনুভব করে থাকবেন। তা নইলে হঠাৎ এভাবে এতটা শুকিয়ে পড়া সম্ভব নয়। ওঁদের মুখের ভাষা পড়বার চেষ্টা করছিলাম আবার সেই ছেলেমেয়েদের শেঠে—শেঠে আওয়াজ কানে এল।

নিজেকে সামলে নিয়ে রামস্বামী বললেন, ছেলেমেয়েরাও শেঠজীর ভাল খাবার ব্যবস্থার কথা বলছে।

কথাটা নেহাৎ মিথ্যে। কেবল অতিথির মন গলাবার এ এক অভিনব পন্থা জেনেও কী কারণে যেন জোর প্রতিবাদ করতে কিছুতেই পারলাম না। শুধু নিরুপায়ের মত একবার বললাম, আমি শেঠ নই, সাধারণ মানুষ।

সে কথায় রামস্বামী উল্টো বুঝে মৃদু হেসে বললেন, সে জানি, বিনয় কি আর বুঝি না। না হয় আজকাল তেমন যাত্রী আর এ চটিতে আসেন না, তাই বলে লোক চিনতে ভুল করবে এ রামস্বামী সে পাত্রই না।

কি করে বোঝাব যে, শেঠ হওয়া দূরে থাক, এখানকার 'শেঠে-শেঠে' শব্দের আওয়াজটাই আমার সর্বাঙ্গে বিছুটির মত কাজ করছে। তবু সে কথা শুনছে কে।

মহিলাটি করুণ নয়নে চেয়ে আছেন। সে-চাহনির অর্থ বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়। বিশেষ, যে ঘরে মোমবাতি কিনতে অতিথিকে পয়সা দিতে হয় এবং যেখানে সাধারণ একজনকে কাচ্চাবাচ্চা থেকে গৃহিণী পর্যন্ত শেঠজী ঠাওরান, সেখানে দারিদ্র্য যে কোন্ স্তরে এসে ঠেকেছে সে সহজেই অনুমান হয়। কিন্তু এই পরিবেশে এখন আমার আহার্য সংগ্রহের নামেই-বা টাকা রামস্বামীর হাতে তুলে দিই কেমন করে! স্বয়ং সরস্বতীর সম্মানে যাতে আঘাত না লাগে তাই বললাম, চলুন-না বাজার করে আসা যাক্।

সরস্বতী অমনি হা হা করে উঠলেন। এতক্ষণে বুঝলাম, তিনি ইংরেজী বলুন না বলুন, বোঝেন। আমাদের কথাবার্তা ইংরেজীতেই হচ্ছিল।

সরস্বতীর হাহাকারে প্রমাদ গণলাম। মূল উদ্দেশ্যটা আরো ঘোরালো হয়ে উঠল।

মানুষের আত্মমর্যাদা বাঁচিয়ে চলা মানুষ মাত্রেরই সহজ ধর্ম হওয়া উচিত। কিন্তু মহিলাদের মর্যাদাবোধ সময় সময় যেমন সাংঘাতিক তেমনি বাস্তব স্বার্থে তাঁরা যেন কখনো কখনো অতিমাত্রায় স্থূল। এই স্ববিরোধ এড়িয়ে চলতে না পারলে পাছে সুদূর প্রবাসে কোন অঘটন ঘটে সেই আশঙ্কায় আস্তে আস্তে রামস্বামীকে ওপাশের অঙ্গনে ডেকে নিয়ে তাঁর হাতে কিছু দক্ষিণা গুঁজে দিয়ে বললাম, আমায় একটা কোন হোটেল-টোটেল দেখিয়ে দিন। আর সরস্বতী দেবীকে বলুন, আমি নিরামিষভোজী নই তাই তাঁর ঘরে একটি রাত্রির জন্যে আর ফ্যাসাদ বাঁধাতে চাই না।

যুক্তিটা কাজে লেগে গেল। রামস্বামী নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন। ঘোর নিরামিষাশী দক্ষিণী ব্রাহ্মণ-ঘরে মাছ-মাংসভোজী পাতা না পেতে তাঁদের যে সে রাতের মত বিভ্রাট থেকে অতিথি স্বেচ্ছায় মুক্তি দিলেন সেজন্যে মনে মনে কেবল রামস্বামীরই নয়, সরস্বতীরও খুশী হবার কথা।

খুশী যে তাঁরা হয়েছিলেন তার প্রমাণ, সে রাত্রিতে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই অতিথির সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলে কাটালেন। এক সময় সরস্বতী উঠলেন, কিন্তু রামস্বামী কিছুতেই উঠতে চাইলেন না।

কাচ্চাবাচ্চারা অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিল। চারদিক নিস্তব্ধ। অদূরে জনপথে জনতার চলাচল কখন থেমে গেছে। অন্ধকার চারপাশ গ্রাস করেছে। এরই মধ্য থেকে সরস্বতী উঠে গেলেন তো রামস্বামী কিছুক্ষণ চুপ করে পাথরের মূর্তির মত বসে রইলেন।

সময় একেবারে থমকে গেছে কিনা জানবার জন্য কব্জিঘড়ি কানের কাছে তুলে ধরতে গেলাম। তৎক্ষণাৎ কে আমার হাতখানি অধীরভাবে জড়িয়ে ধরল।

চমকে উঠেছিলাম। চমক ভাঙল রামস্বামীর কণ্ঠস্বরে: বাবুজী, আপনি কিছু মনে তো করেন নি? অভাবে স্বভাব নষ্ট হতে বসেছে—তাই বলছি।

কি আশ্চর্য, এসব আপনি কি বলছেন!

বলছি কি আর সাধে! পরদেশী অতিথি এলেন, কত সৌভাগ্য! অতিথি নারায়ণ, কোথায় আমরা সেবা করব, তা নয়—আপনার কাছে হাত পেতে উদরান্নের সংস্থান করতে হল।

আমার হাতখানি রামস্বামী তখনো ধরে রেখেছিলেন। সহসা তার উপরে দু'ফোঁটা তপ্ত চোখের জল ঝরে পড়ল। সে জল পক্ষীতীর্থের তীর্থবারির চেয়ে পবিত্রতায় বিন্দুমাত্র অনুজ্জ্বল যে নয়, গভীর অন্ধকারে অন্তরে তারই অনুভূতি অকস্মাৎ বিদ্যুতের মতন ঝল্‌সে উঠতে আমি আমার নিজেকে হারিয়ে ফেললাম।· ····

॥ ১০ ॥ কাঞ্চী—সেকালের আর একালের

পক্ষীতীর্থ ছেড়ে পল্লব রাজাদের রাজধানী কাঞ্চীর পথে পথে মন্দির পরিক্রমা করে একদিন আবার চিঙ্গেলপেট ফিরে এসে দক্ষিণের গাড়ীতে চড়ে বসলাম। রাতের গাড়ী হু হু করে শব্দভেদী বাণের মত ছুটছিল। তার গতির উল্লাস রাতের বুকে কান্নার ঢেউ তুলে থাকবে। সেই ক্রন্দনসুরে কান পেতে বহুক্ষণ বসেছিলাম। এক সময় মনে হয়, ও তো কান্না নয়। শুনবার ভুল বোধ হয়। আবার তৎক্ষণাৎ সেই করুণ সুরের মূর্ছনা। কে কাঁদে! কাঁদছে আমার সারা অন্তর অতীতের ঐশ্বর্যলোকের নিঃস্বতার বেদনায়।

সোনার কাঞ্চী আজ শুধু সেকালের দীর্ঘশ্বাস! মহাভারতে মূল সাতটি তীর্থনগরীকে বলা হয় সুদূর অতীত থেকে সপ্তপুরী। অযোধ্যা, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তীকা (উজ্জয়িনী). দ্বারকা, মথুরা, হরিদ্বার—এই সপ্তপুরীর কাঞ্চীপুরী পেছনে ফেলে এই যে এগিয়ে চলেছি, হাতের মুঠিতে সংগ্রহ কি তেমন কিছু করতে পারলাম, যার গৌরবে গর্ব করা চলে। এই কাঞ্চীতে একদিন চীন দেশের পরিব্রাজক হু-য়েন-সাঙ এসেছিলেন। তিনি শতমুখে এর প্রশংসা করে গেছেন। এখানেই একদিন হিন্দুধর্মের দিগ্বিজয়ী প্রচারক শঙ্কর কামকোটীপীঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রামানুজ কাঞ্চী পরিদর্শন করতে ভোলেননি। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য একদিন কাঞ্চীতে পদার্পণ করেছিলেন। মহাপ্রভুর চরিতামৃতে পাওয়া যায়,

> শিব কাঞ্চী আসিয়া কৈল শিব-দরশন।
> প্রভাবে বৈষ্ণব কৈল শাক্ত শৈবগণ ॥
> বিষ্ণু কাঞ্চী আসি দেখিল লক্ষ্মী-নারায়ণ।
> প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন ॥
> প্রেমাবেশে নৃত্যগীত বহুত করিল।
> দিন দুই রহি লোকে কৃষ্ণভক্ত কৈল ॥

কাঞ্চী, কাঞ্জীভেরাম একই নাম। কাঞ্জীভেরামকে সংক্ষেপে বলা হয় কাঞ্চী। প্রাক্‌বৌদ্ধ, বৌদ্ধ, জৈন, বৌদ্ধোত্তর হিন্দু ধর্মের বিহারক্ষেত্র কাঞ্চীতে একে একে পতাকা উড়েছে পল্লব, চোল ও বিজয়নগর নৃপতিদের। তারপর একদিন মধ্যযুগে কাঞ্চীতে মুসলমানরা তাঁদের শাসন কায়েম করেছিলেন। পরে এলেন মারাঠা, তারও পরে ফরাসীদের প্রতাপ সহ্য করতে হয়েছিল কাঞ্চীকে কিছুকাল। ফরাসী প্রাধান্যের অবসান ঘটল সতেরো 'শ বাহান্ন সনে। তারপরে ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করতে হল ভারতের আর সব রাজ্যের মত।

শত শত বৎসর যে নগরী স্বাধীন সাম্রাজ্যের অনন্য রাজধানীর খ্যাতি নিয়ে দক্ষিণের মুখ উজ্জ্বল করে দেশ-বিদেশের মোহিনীরূপে প্রখ্যাত ছিল, যে নগরী কয়েক শত বৎসর পরাধীনতার নাগপাশে জর্জরিত হল, আজ তার দিকে তাকালে আর কোন বিস্ময়ই জাগতে চায় না।

কাশীতে গেলে সেখানে তার স্বকীয় প্রভাব আজো চোখে পড়ে। অবন্তী-উজ্জয়িনীতে গেলে "মহাকালের-মন্দির" দর্শককে কম অভিভূত করে না। কিন্তু কাঞ্চী? সে যেন তার অতীত গৌরবের ভার আর বহন করতে পারছে না।

শিবকাঞ্চী, যার আরেক নাম বড়কাঞ্চী, সেখানে সুবৃহৎ শিবের মন্দির একালে তাঁর পুরানো প্রভাব হারিয়ে নিষ্প্রভ হয়ে দাঁড়িয়ে। বিষ্ণুকাঞ্চী শহরের পশ্চিমদিকে। স্থানীয় লোকেরা একে বলে, ছোটকাঞ্চী। অর্থাৎ মহাদেবের মন্দিরের মত বিষ্ণুর মন্দির এখানে অত বড় নয়, তাই এ নাম।

কাঞ্চীর যত্রতত্র মন্দির। কোনটা অবজ্ঞাত, কোন মন্দির বা আঁধার রাতের প্রদীপটির মত, তবে প্রদীপের তেল প্রায় শূন্য! এরই মধ্যে মহাজাঁকজমকে পুরানো জমিদারবাড়ীর দুর্গা পূজোর চমকের মত ঝলক দিচ্ছে একাম্বরনাথের মন্দির। এই মন্দিরে পৃথ্বীলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এর গোপুরম যেমন সুবৃহৎ তেমনি দর্শনীয়। বিজয়নগরের দিগ্বিজয়ী সম্রাট কৃষ্ণদেব রায় তাঁর অনন্য কীর্তি হিসাবে একাম্বরনাথের গোপুরম প্রতিষ্ঠা করে রেখে গেছেন।

কত কত মন্দির। কত তার কারুকার্য। স্তম্ভে স্তম্ভে ভাস্কর্যের অনিন্দ্য হাতছানি। এখানে সেখানে স্থপতির লীলার নিদর্শন। চার পাশে ভাস্করের অন্তর-নিংড়ানো অলৌকিক সৃষ্টিকর্মের ছড়াছড়ি। কিন্তু এদের পরিচয় দেবার যোগ্য লোক দূরদেশী দর্শকের পক্ষে মেলা দায়। কোথাও যে একজন অভিজ্ঞ গাইড পাওয়া যাবে, তার জো নেই। আর মন্দিরে মন্দিরে একালের পূজারীর দল—সরকারী দাপটে তাদের দৌরাত্ম্যিতে ভাটা পড়লেও—নতুন বিপদ, তারা যেন অতীতের পাথরের চেয়েও নিরেট নির্বাক।

একালের কাঞ্চী আর সেকালের কাঞ্চীতে কতই না তফাৎ। কালস্রোতে কাঞ্চীর যৌবন ধনমান সবই অপসৃত। এখন কেবল জবুথবু বৃদ্ধার মতন সেকালের কাঞ্চী নিজের শেষ সম্বল সামলাতে ব্যস্ত। যে ছিল সাম্রাজ্যদম্ভী, জ্ঞানদর্পী, ঐশ্বর্যময়ী সে তার সাম্রাজ্য হারিয়েছে, জ্ঞানের আলোক কখন তাকে পরিত্যাগ করেছে তারই অজানিতে, ঐশ্বর্যগরিমা আজ কিছু ঘর তন্তুবায়ের মাকুর সীমায় এসে ঠেকেছে।

একালের কাঞ্চীনগরী ভারতের অন্যান্য যে কোনো সাধারণ শহরের মতই। পথ-ঘাট-হাট-হট্টগোল-রিক্সা-এক্কা-ঠেলাগাড়িতে ভরাট জনপদ। মোটর, মিউনিসিপ্যালিটী, সিনেমা হল আর ইনকাম-ট্যাক্স আফিসও আছে।

নেই কেবল অতীতের কালজয়ী ঐতিহ্যের আবহমান স্রোতের বিজয়-বৈভব ও নব নব বিকাশ।

দু' সহস্র বৎসরের চলমান বিবর্তন ধারায় বুকে সাঁতার কেটে চলতে চলতে হঠাৎ ডাঙ্গা পেলাম। গাড়ী কোন একটা স্টেশনে দাঁড়াতে যাত্রী ওঠানামার বিষম-ছন্দে চিন্তার গতি স্তব্ধ হয়ে গেল।

গভীর রাত্রি। যাত্রী নিয়ে রাতের গাড়ী ফের যাত্রা আরম্ভ করল। যেখানে ডাঙ্গা পেয়েছিলাম, সেখানে আসন নিয়ে ছড়িয়ে বসতে চাইলাম। কাঞ্চীতে চীনা দেশের দার্শনিকরা নাকি সেকালে আসতেন ভারতীয় দর্শনের গূঢ়তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে। পল্লবরাজারা সকলে না হলেও, কেহ কেহ

সাহিত্য, শিল্প ও ভাস্কর্যের বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন বলে জানা যায়। যদিও পল্লব আমলের উল্লেখযোগ্য তামিল সাহিত্য সুলভ নয়, তবু দেশময় সে সময় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য যে তার বিজয়ধ্বজা তুলেছিল দিক হতে দিগন্তরে, তার প্রমাণ এই তো সবে স্বচক্ষে দেখে ফিরছি। মহাবলীপুরম, পক্ষীতীর্থ, কাঞ্জীভেরামই কেবল নয়; পথে যেতে আসতে গ্রামে গ্রামে যত সেকালের মন্দির, তার আদি ইতিহাস খুঁজতে গেলে চলে যেতে হয় খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত। ঐ তৃতীয় শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দী, এমনকি তারও কিছুকাল পর পর্যন্ত সমস্ত কাঞ্চী এলাকা জুড়ে দেউলের পর দেউল মাথা তুলেছে। কিন্তু হাজার বছর বাদে সে সব দেউলের ইতিহাস খুঁজে-পেতে সংগ্রহ করা যেমন কঠিন, তেমনি তাঁর স্রষ্টাদের পরিচয় লাভ একরকম অসম্ভব।

গাড়ীর জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখি আকাশ অন্ধকার। ঐ অন্ধকারই যেন গোটা অঞ্চলটাকে গিলে ফেলতে চাইছে। আর সে আঁধার রাহুর করাল গ্রাস থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে কে যেন কাঁদছে। তারই কান্না রাতের অসীম আকাশ, আশপাশ ব্যথিত করে তুলেছে।

ভোর রাতে চিদাম্বরম পেরিয়ে এলাম। এখানে আছেন বিশ্ববিখ্যাত নটরাজ। যাঁর নৃত্যের তালে তালে সৃষ্টির লীলা চলছে। এই রজনী শেষের শেষ প্রহরে তিনি তাঁর নৃত্যদোলে অন্ধকার কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে আলোর অভিসার সম্ভব করে তুলছেন। কবির কথায়, এই নটরাজের নৃত্যই—"ধরিত্রীর তপ্তবক্ষে মন্দাকিনীধারা", এঁরই নৃত্যচ্ছন্দে ভস্ম থেকে অগ্নি উৎসারিত হয়, প্রাণহারা প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে। সৃষ্টির পুলকে পৃথিবী প্রত্যহ প্রত্যূষে প্রাচীনত্বের খোলস ছেড়ে চিরযৌবনের রক্তবাস পরে অমৃতের পাত্র হাতে বিশ্বজনের নিদ্‌ভাঙ্গা চোখের সামনে আবির্ভূত হয়।

আজ আমার চোখে অতি প্রত্যূষের আলোতে প্রবীণা পৃথিবী চির-নবীনা সাজে এই যে একটু একটু করে দেখা দিচ্ছে, আলোকপদ্ম এই যে একটি একটি করে দল মেলে শতদলে বিকশিত হচ্ছে, যতই চলমান

গাড়ীর কামরার জানলা দিয়ে ভোরের আলোর অভিসার মুহূর্তগুলো দু'চোখ মেলে দেখছি, ততই মর্মচোখের উপরে নটরাজের নৃত্যলীলায় মুহূর্তে মুহূর্তে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর-বাইরের পরিবর্তন নির্মল আত্মপ্রকাশে অসীম রসের সরোবরে ঢেউ তুলে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

মানুষের অজেয় শক্তিতে আকাশের বিদ্যুৎ ঘরে ঘরে আমাদের হুকুম খাটছে, উৎসবে অনুষ্ঠানে রোশনীর রাজ্যটাকে আমরা আমাদের হুজুগে খেয়ালে যেমন চাইছি, তেমনি কাজে লাগাচ্ছি। মাটির তলদেশে পাতাল খুঁড়ে কয়লা এনে তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দৈত্যের শক্তি করায়ত্ত করে জলে স্থলে যানবাহন চালাতেও পেরেছি। এটম পর্যন্ত আমরা গুঁড়ো করে ছেড়েছি। কিন্তু ভোরের এই যে আলো, এর যে অনিন্দ্য কচি রূপ, আকাশে বাতাসে এর যে অমৃত সঞ্জীবনী, যার অন্তরে চিরযৌবনের সাঙ্গীতিকী ব্যঞ্জনা, তার এক কণা একালের মানুষের শক্তিমত্ত মুঠোর মধ্যে বন্দী করা সম্ভব হয়েছে কি!

বাইরে প্রকৃতির অরূপ-রূপের ছটায় ছটায় মনের কন্দরে ক্ষণে ক্ষণে যে পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে তার সুর যেন বাঁধভাঙ্গা জলধারার মত। সে সুরের ভাষা যার কানে একবার প্রবেশপথ পেয়েছে তার কাছে নটরাজের নৃত্যের অর্থ আর অস্পষ্ট থাকতে পারে না।

চলতি পথের যেখানে গাছ, সেখানেই কাকের কা-কা শুরু হয়েছে। আজ সকালে ঘুম-ভাঙানিয়া কাকের কর্কশ রবে তেমন যেন রূঢ়তা নেই। হয়ত আজ আগাগোড়া জেগে আছি বলেই এমনটা মনে হয়ে থাকবে। কিম্বা এ-দুটি চোখে আলোর প্লাবনে যে অঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছে, সে-ই কান দুটোকে রূঢ়তার মধ্যেও জাগানিয়া সুরের আভাস পাবার শক্তি দিয়ে থাকবে।

কলরুন নামে ছোট্ট একটি স্টেশন পেছনে ফেলে এলাম। এতক্ষণে এক গাড়ী লোকের ঘুম ভাঙল। সবাই যার যার অভ্যাসমত কেউ কফি, কেউ বা ছোটখাট প্রাতরাশের জন্যে পাগল হয়ে উঠল। সকালের আলোর মোহনরূপ দু'নয়ন ভরে দেখা দূরে থাক, একজনও একটিবারের

জন্য নিত্যকারের প্রাত্যহিক স্থূল জীবনকে ভোলবার চেষ্টাটিও করল না। আশ্চর্য।

পরের স্টেশনে গাড়ী দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই যাত্রীদল যার যার প্রাতরাশের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। প্রাতরাশ শেষে কফি এল। বাঙলাদেশে লোকে কি-ই-বা চা খায়! দক্ষিণের মানুষের কফি না হলে সকালটাই বৃথা।

একটার পর একটা স্টেশন আসছে, যাচ্ছে। কে একজন বলল, গাড়ী এখন তাঞ্জোর জেলার মধ্য দিয়ে চলেছে। আশেপাশে কাছে-দূরে দূর-দূরান্তরে একটানা ধানের ক্ষেত। সবুজ, কেবল সবুজ। সবুজের কত বাহার, কত বৈচিত্র্য। কচি সবুজ, কাঁচা সবুজ, ঘন সবুজ, গাঢ় সবুজ, প্রগাঢ় সবুজে মাঠের পর মাঠ ঢাকা।

ক্রমেই ছোট্ট ছোট্ট খাল দেখা যাচ্ছে। ঐ খাল ক্ষেতগুলিকে দু' ভাগে ভাগ করেছে। নইলে জমির আল ঢেকে ধানের ক্ষেত সমানে চলে গেছে সুদূরে।

সুপ্রাচীনকাল থেকে তাঞ্জোরকে বলা হয় তামিলনাদের শস্যভাণ্ডার। তাঞ্জোরের এ-খ্যাতি যে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নয়, সে এ পথে একবারটি চললে অনায়াসে অনুমান করা যায়।

একটু এগোতে হরিৎ-শ্যামল শস্যক্ষেত। মাঝে মাঝে কচি ধানের চারার পাশে পাকা ধানের সোনালি শোভা। এমন হবার কারণ, এখানে একে একে বছরে তিন-চারটি ফলন হয়। তাই এক ধান পাকে, আর ধানের 'পাতো' পড়ে।

আগাগোড়া অঞ্চলটা দেখতে দেখায় যেন সুবিস্তীর্ণ একখানি নকশা-বোনা কার্পেট।

যতই দেখি ততই এদিককার শ্যামল রূপে দৃষ্টি বিমুগ্ধ হতে থাকে। অনেক দিন বাদে জলায় কলমী ভাসতে দেখলাম। ডোবার পাড়ে খেজুর গাছও দেখছি। কত রকমের চেনা-অচেনা আগাছা এখানে-ওখানে রেল লাইনের দু'পাশে সামান্য কিছুটা অনাবাদী জায়গা জুড়ে পড়ে আছে।

বড় আফশোস, ছোটবেলায় দিদিমা পিসিমার মুখে শোনা এ সব আগাছার নাম অনেক দিন হয় ভুলে বসেছি।—কি আশ্চর্য! এখানকার বহু গাছ-গাছড়ার সঙ্গে বাঙলাদেশের মাটিতে বাল্যে কৈশোরে সাক্ষাৎ ঘটেছে। কিন্তু সেদিন ভুলেও কখনো মনে হয়নি যে, আগাছাগুলির এমন একটি অনিন্দ্যসুন্দর রূপ আছে, যা সাজানো বাগিচায় নেহাতই দুর্লভ।

এই যে ঐ অনুচ্চ আগাছার পাতায় পাতায় অনেকটা জমি ঢাকা, মনে পড়ে, ছেলেবেলায় ওরই পাতা তুলে বিনিসূতোর মালা গাঁথবার জন্যে ফেলে আসা দিনের বান্ধবীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে কতই না অজানা আনন্দ হত।

কাছেই কয়েকটি বাঁশঝাড়। ওদের পেছনে ফেলে, সামনে আগাতেই —এক জলার পাশে কেওয়াঝাড়। আর কত যে নাম-না-জানা, নাম-ভোলা গাছপালা তার ইয়ত্তা নেই। দেখে দেখে শ্রান্ত হওয়া দূরে থাক, চোখের যেন আর তৃষ্ণা মেটে না। তারপর না, এক সময় মনে অত্যন্ত বিষাদের ভার চেপে বসল। অন্তরে সুতীক্ষ্ণ একটি কাঁটার খোঁচা—এখানকার এই প্রকৃতির রাজ্যে যে সুন্দর শান্তিময় সমারোহ, আর এক জায়গাতেও তার বিপুল সম্ভার যত্রতত্র ছড়ানো ছিল। কিন্তু হায়, সেদেশে আজ যেতে গেলে 'ভিসা' চাই।

অকস্মাৎ নানা চিন্তায় অন্তর আমার আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। এমন সময় কোন এক স্টেশনে গাড়ী দাঁড়াতে চীৎকার শোনা গেল: কুম্ভকোণম, কুম্ভকোণম।

চটপট এখানেই নেমে পড়লাম। একে একে যে যার গন্তব্য পথে চলে গেল। প্লাটফরমের শেষ হকারটিও দুই একবার চার-পাশ চক্কর দিয়ে বিদায় হল। পড়ে রইলাম কেবল আমি।

আস্তে আস্তে এক সময় প্লাটফরমের বাইরে এলাম। যাকে সামনে পাই তাকেই জিজ্ঞেস করি, এখানে কোন্ দিকে গেলে থাকবার ভালো হোটেল মিলতে পারে। আমার কথা কেউ শোনে, কেউ শোনে না। দুই-একজন তো দাঁড়িয়েই গেল! তাদের চোখেমুখে বিস্ময়। তারা কেহ এর আগে এমন অদ্ভুত যাত্রী দেখেছে কিনা সেই সন্দেহ চোখে উঁকি

দিচ্ছে। আর উচ্চারণের পার্থক্যের কারণে অবাক্ হয়ে ভাবছে—এ কি বলে!

ফিরে স্টেশনে বাবুদের শরণাপন্ন হলাম। তাঁরা সাগ্রহে আমায় যথাসাধ্য সহযোগিতা দেবার প্রস্তাব জানালেন।

তাঁদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে কুম্ভকোণমের মন্দির দেখতে বেরিয়ে যখন পড়লাম তখন সূর্য মাথার উপরে। চলতে চলতে সঙ্গীর সঙ্গে আলাপ জমে উঠল। তিনি বলছিলেন কু্ম্ভকোণমের পুরাকাহিনী যা জানেন তাই একে একে।

।। ১১ ।। কুম্ভকোণমের তীর্থ-কাহিনী

সব ধর্মেই পৃথিবীর সর্বত্র মহাপ্রলয়ের কোন-না-কোন কাহিনীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রলয়কালীন মহাপ্লাবন কেবল বাইবেলেরই একচেটিয়া নয়। আমাদের দেশেও মহাপ্লাবনের কথা পুরাণে পাওয়া যায়। কুম্ভকোণমের নামের সঙ্গেও মহাপ্লাবনের পৌরাণিক কাহিনীর যোগসূত্র রয়েছে। সঙ্গীবর বলছিলেন, এই যে শহর দেখছেন, এই শহরের নামকরণ হয়েছে কুম্ভেশ্বরের মন্দির থেকে।

আমি বললাম, কুম্ভেশ্বরই বা এলেন কোথা থেকে? এক তো জানি কুম্ভমেলার কথা। আর এ দেখছি শুধু কুম্ভ নয়, কুম্ভকোণম।

কুম্ভেশ্বরের উৎপত্তি-কাহিনী অতি বিচিত্র। সঙ্গী বলতে লাগলেন, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এক সময় অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন, মহাপ্লাবনে প্রলয়কালে সকলেই যদি ধ্বংস হয় তাহলে তিনিই-বা কেমন করে সৃষ্টির নিরবচ্ছিন্ন স্রোত বজায় রাখবেন। এ চিন্তার কোন অন্ত না পেয়ে ব্রহ্মাদেব দেবাদিদেব শিবের তপস্যায় দীর্ঘকাল কাটালে পর তপে তুষ্ট শঙ্কর স্বয়ং ব্রহ্মার সম্মুখে হাজির হলেন। প্রলয়কালে সৃজন কেমন করে চালু থাকবে, এ প্রশ্ন ব্রহ্মা শিবকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টিবীজ দান করে তার সংরক্ষণ ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন।

ব্রহ্মাদেব সেই সৃষ্টিবীজ এক মাটির পাত্রে রেখেছিলেন এবং সে পাত্র যাতে মহাপ্লাবনে ভেসে না যায় সেই জন্য সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সৃষ্টিবীজ সহ পাত্রটিকে মেরুপর্বতের শিখরে রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু মহাপ্লাবন মেরুশিখর ডুবিয়ে সৃষ্টিবীজপাত্র দক্ষিণে ভাসিয়ে নিয়ে এল। ব্রহ্মা ওদিকে সৃষ্টিবীজপাত্র মহাপ্লাবনে লুপ্ত হয় দেখে আবার শিবের তপস্যায় বসলেন।

শিব আর করেন কি! সৃষ্টিবীজ উদ্ধারে স্বয়ং শিকারীবেশে ছুটে এলেন দক্ষিণে। এই আজ যেখানে কুম্ভেশ্বরের মন্দির তারই কাছে

তখন সৃষ্টিবীজের কুম্ভ ভাসছিল। শিব বিশেষ একটি কোণ থেকে শরনিক্ষেপে ঐ কুম্ভটিকে ছিদ্র করবার সঙ্গে সঙ্গে অমৃত নিঃসৃত হল। সৃষ্টি রক্ষা পেল।

সেই থেকে এই স্থান কুম্ভকোণম নামে প্রখ্যাত। শিব একটি বিশেষ কোণে কুম্ভকে তীরবিদ্ধ করেছিলেন বলে একে বলা হয় কুম্ভকোণম।

সঙ্গীবর একটু থামতেই অনেক কথা মনের কোণে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। সৃষ্টিবীজ বলতে হয়ত সভ্যতারই বীজ বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য মহৎ। আর্য-সভ্যতা একদিন তার বীজ উত্তর-ভারত থেকে দক্ষিণ-ভারতেও ছড়িয়ে দিয়েছিল। ভাসতে ভাসতে আসাটা অভিযানেরই নামান্তর। আর কুম্ভকোণমে এসে সৃষ্টিবীজের উদ্ধার, সম্ভবতঃ সেকালে দক্ষিণ-ভারতে আর্য-সভ্যতার বিশিষ্ট বাসস্থান এখানেও একদিন স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু এই সৃষ্টিবীজ মাটির পাত্রে অর্থাৎ কুম্ভের মধ্যে ব্রহ্মা সংরক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। এতবড় একটা মূল্যবান বস্তুর যোগ্যপাত্র অন্য কোনো ধাতুতে নির্মিত না হওয়ায় অনুমিত হয়, কুম্ভকোণমে আর্য-সভ্যতা যেকালে শিকড় নিয়েছিল সেকালে সবেমাত্র মৃৎপাত্রের ব্যবহার চলিত হয়ে থাকবে।

ব্রহ্মা স্বয়ং না এসে সৃষ্টিবীজের পাত্রানুসন্ধানে এলেন কিনা স্বয়ং শিব, তাও আবার খুব সুসভ্যবেশে নন—শিকারী অর্থাৎ কিরাতের বেশে। ঘটনাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য ও বিবেচনা করবার যোগ্য।

অনার্য দেবতা শিব কিরাতরূপে পূজিত। আর্য-অনার্যের সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত আর্য আধিপত্য তথা সভ্যতার সারা ভারতময় বিস্তারের কথা কার না জানা আছে। দক্ষিণদেশে অনার্যদের অপেক্ষা উন্নত দ্রাবিড়দের উপরেও আর্য-সভ্যতার উজ্জ্বল আলোক পড়েছিল। কিন্তু অনার্যদের ক্ষেত্রে যেমন বহুলাংশে আত্মলোপের নমুনা দেখতে পাওয়া যায়, দ্রাবিড়দের ক্ষেত্রে তেমনটা দেখা যায় না। এখানে বরং বহু জায়গায় আর্য-দ্রাবিড়ে সন্ধি, এমনকি কতক ব্যাপারে সমন্বয় ঘটেছিল বলে মনে হয়। তবু সন্ধি কিংবা সমন্বয় কোথাও

কোনদিন খুব সহজে হয়নি। তাই অনার্য ও অনার্য-উত্তরসূরী দ্রাবিড়দেশে আর্য-দেবতাদের শিকারীবেশে অর্থাৎ অনার্য-দেবতার ছদ্মবেশে পদার্পণ করতে হয়েছিল প্রথমদিকে। পরে ক্রমে ক্রমে দ্রাবিড়-আর্যে সন্ধি হল, সমন্বয় হতে লাগল। সেই সন্ধি ও সমন্বয়ধারায় যে অমৃত ছিল তারই পূর্ণপাত্র পান করে সুপ্রাচীনকালে এই কুম্ভকোণম দক্ষিণ-ভারতে মাথা তুলে থাকবে।

আমরা কুম্ভেশ্বরের মন্দিরের সামনে এসে পড়েছিলাম। সঙ্গীবর বললেন, এ তো দেখছেন শিবের মন্দির, ওদিকে বিষ্ণুভক্তদের যে মন্দির রয়েছে 'রামস্বামীর' সেও সারাদেশে বিখ্যাত।

আমি আকাশ-উচ্চ গোপুরমের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। সুবিশাল দশ তলা বিশিষ্ট সুবৃহৎ গোপুরমের দিকে যতই দৃষ্টি দেওয়া যায়, পৌরাণিক কাহিনীর ভাস্কর্যে রূপায়ণ ততই মনকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে ফেলে। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে কেমন যেন মনে হতে লাগে, এই সুবিশাল গোপুরমের সামনে কেবল আমিই নই, আমার সঙ্গীবর নন, গোটা কুম্ভকোণমের সমগ্র জনসমাজ, এই শহর, এর পথঘাট, সবি একেবারে তুচ্ছতার আড়ালে আত্মগোপন করতে পারলে বাঁচে।

আর গোপুরমের ওপাশে কুম্ভেশ্বর যে মন্দিরে আসীন আছেন, সে মন্দিরের গর্ভগৃহ পর্যন্ত পৌঁছুবার পথে কত কত বাধা। প্রাঙ্গণ, মণ্ডপ, নাট-মন্দির, জগমোহন, আরও কত কি। এত-শতের আড়ালে, আবডালে দেবতা স্বয়ং আত্মগোপন করছেন কিংবা তথাকথিত ভক্তরা দেবতাকে তাদের স্বার্থে লাগাতে মন্দিরে মন্দিরে ঐভাবে সুগোপনে রেখে দিয়েছে, কে জানে! কারণ যাই হোক, এভাবে প্রায় অভেদ্য গর্ভগৃহে যিনিই দেবতার আসন পাতুন না কেন, কেমন যেন মন বলে—ভক্তের দেবতা বিগ্রহরূপেও এতটা দূরত্ব বজায় রেখে কেমন করে ভক্তাধীশ হতে পারেন?

সঙ্গীবর শাক্ত নন, শৈব নন,—পরম বৈষ্ণব। তাই তাঁর টান রামস্বামী মন্দিরের দিকে। পথে যেতে যেতে তিনি আবার বলতে লাগলেন, এখানকার নাগেশ্বর মন্দিরের গঠন এমন চমৎকার, স্থাপত্য

এমন সুন্দর যে, কোন কোন ঋতুতে সূর্যরশ্মি সোজা নাগেশ্বরের শিরে এসে পড়ে। নাগেশ্বর মন্দিরের একপাশে পাথরের রথ পড়ে আছে। এই রথের পাথুরে চাকা শিল্পকারুকার্যের এক আশ্চর্য নিদর্শন।

রামস্বামীর মন্দিরে নয়, সঙ্গী নিয়ে উপস্থিত করলেন সারঙ্গপাণির মন্দিরে। এখানেও সেই আকাশচুম্বী গোপুরম। এগারো তলায় শেষ হয়েছে। কারুকার্যের রূপ কুম্ভেশ্বরের গোপুরমের অনুরূপ। সঙ্গীবর তরতর করে সারঙ্গপাণির মন্দির-অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। তাঁর ভক্তির আতিশয্য আর একটু আগে কুম্ভেশ্বরের মন্দিরে যে ব্যবহার—দুইয়ের ব্যবধান দেখে বেজায় হাসি পেয়ে গেছল। কিন্তু হাসি সামলে নিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম সঙ্গীবরের ভক্তির বাড়াবাড়ি কোথায় গিয়ে ঠেকে!

সঙ্গী সাষ্টাঙ্গে মন্দির বিগ্রহের সামনে প্রণাম নিবেদন করে বেশ কিছুক্ষণ পড়ে রইলেন। পরে উঠে তীর্থম গ্রহণ করে প্রথমে পান করলেন, তারপর সেই হাত,—যে হাতে তীর্থম গ্রহণ করেছিলেন, মাথায় বুলাতে লাগলেন। এতই যখন ভক্তি তখন মন্দিরের পূজারীরা কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশা করবেন বৈ-কি। ওই বেলায় সঙ্গীবরকে খুব বেশী উদার হতে অবশ্যি দেখা গেল না।

মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে সঙ্গীর মুখে খই ফুটছিল। তিনি এই সারঙ্গপাণির মন্দির সারা দেশের বৈষ্ণবদের যে কত বড় তীর্থক্ষেত্র তাই আমাকে এমনভাবে বোঝাতে চাইছিলেন যেন আমি তাঁর সদ্য প্রাপ্ত শিকার। আর যাতে হাতছাড়া হয়ে অন্য কোন ধর্মবিশ্বাসে না ভিড়ি তার জন্যে তাঁর সে কি অসীম প্রয়াস। শেষটা যখন বললাম বাংলার ঘরে ঘরে 'হরিহর একাত্মা', তখন সঙ্গীটি এমনভাবে আমার দিকে চাইলেন যেন নিষিদ্ধ ফলের স্বাদ নিয়ে আমি মহাপাপ করে সেই পাপ-গুণগান রূপ গরল তাঁর কানে ঢালতে চাইছি।

এরপর ভেবেছিলাম সঙ্গীবর চুপ হবেন। কিন্তু একটু বাদেই আমার ভাবনা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হতে চলল। তিনি নব উৎসাহে বৈষ্ণববাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগলেন। কি জানি কট্টর কোনো

শৈবের সঙ্গে এভাবে ঘুরলে হয়ত তিনিও আমায় শৈবমতবাদের দীক্ষা দিতে লেগে যেতেন।

রামস্বামীর মন্দিরে সত্যিই দেখবার মত ভাস্কর্য চোখে পড়ল। এখানকার নৃত্যভঙ্গিমাগুলি অনন্য। জগমোহনে রাম-সীতা লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন মূর্তি যেমন আকারে বিরাট তেমনি সুন্দর শিল্পকার্যের নিদর্শন। অদূরে একহাতে বীণা অন্য হাতে রামায়ণ নিয়ে রামগুণগানরত পরম ভক্ত হনুমান। এই বিশেষ ভঙ্গীতে হনুমানের মূর্তি সত্যিই দেখবার মত। কিন্তু রামস্বামী মন্দিরের সীতার যে মূর্তিটি অনিন্দ্য-সৌন্দর্যে অপূর্ব রাজকীয় অলঙ্কার-সজ্জায় যৌবনভারাবনতা অবস্থায় স্মিতহাস্যে ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গিমায় বিদ্যমান দেখতে পাওয়া যায় তার তুলনা এ পর্যন্ত এ চোখে আর কোথাও পড়েনি। এই একটি আশ্চর্য সুন্দর ভাস্কর্য নিদর্শন দেখবার জন্যে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে কুম্ভকোণমের রামস্বামীর মন্দিরে আসা চলে। কিন্তু বহুদূর-দূরান্তের যাত্রীরা উল্কার বেগে দক্ষিণের তীর্থ দেখতে এসে প্রায়শঃই কুম্ভকোণম না দেখে ছুটে চলেন অন্য তীর্থের উদ্দেশে। যাঁরা বিশেষ করে পাথরের মূর্তিতে প্রাণের রস খোঁজেন তাঁদেরই বা কজন কুম্ভকোণমে নেমে থাকেন।

বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছল। পথে এক হোটেলে সঙ্গীসহ অতিকষ্টে আহার জোটানো গেল। এমন হবার কারণও ছিল। এদেশে হোটেল-গুলিতে কেবল একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভোজনের ব্যবস্থা চালু। তারপর এসে শত মাথা কুটলেও মাধ্যাহ্নিক কিংবা নৈশ আহার কখনো কেউ সরবরাহ করতে চায় না। এখানে সর্বত্রই যে নিয়মের রাজত্ব, সঙ্গীবর গর্বভরে তারই নমুনাস্বরূপ ব্যবস্থাটির সপ্রশংস উল্লেখ করলেন।

আহারশেষে কুম্ভকোণম ঘুরে দেখতে বেরিয়ে পড়া গেল। পথে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুই নজরে এলো না। তবে সঙ্গীবর জানালেন যে, প্রাচ্যের ধনদৌলত ঐশ্বর্যের আড়ম্বর যা কিছু এককালে সারা জগৎ-জোড়া নাম কিনেছিল, একালেও কুম্ভকোণমে 'মাসি মাঘম্' মহোৎসবকালে সে সবই এই শহরের রাজপথে দেখা যায়। আর প্রতি বার বৎসর

অন্তর এখানে যে 'মহামাঘম্' মহোৎসব লাগে তখনকার তুলনা চলে এক· উত্তরভারতের কুম্ভমেলার সঙ্গে।

ভারতবর্ষের যেখানে মন্দির, সেখানেই উৎসব। যেখানে দেবতা, সেখানেই বিশেষ কোন-না-কোন দিনে মহোৎসব লেগেই আছে। আগের কালে সর্বত্র উৎসবের যে ঘটা শোরগোল সমারোহ ছিল, এখন তার অনেক বিবর্তন ঘটেছে। অনেক জায়গাতে আজকাল উৎসব উঠে যাবারই মত। কিন্তু কোথাও কোথাও আজো মন্দির আর মানুষ উৎসব-অন্ত-প্রাণ। উৎসবের যে সামাজিক আর্থিক ও নৈতিক বিশেষত্ব ছিল, কালধর্মে বহু পরিবর্তন-মাধ্যমে সে বৈশিষ্ট্য বর্তমানে বিস্মৃত বিলুপ্ত হবার পথে। এরই মধ্যে প্রায়-অপরিবর্তনীয় দক্ষিণদেশে মন্দিরে মন্দিরে দেব-বিগ্রহকে কেন্দ্র করে সেকালের উৎসব একালে কিভাবে আত্মরক্ষা করে বেঁচে আছে, সে দেখবার বড়ো বাসনা। কিন্তু হায়, তার সময়-সুযোগই বা কোথায়। এই তো চলার পথে একটু নেমেছি, একটি দুপুর গড়াতে না গড়াতে কে তাড়া দিচ্ছে, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। দূরে বহুদূরে মন্দিরে মন্দিরে পাথরে পাথরে কোলাহল। তাদের অন্তর দীর্ণ হয়ে আহ্বান হাওয়ায় উড়ে আসছে—আয়, আয়রে ছুটে আয়, অন্তরের অতলে তলিয়ে ছাখ্ একবার এখানে জমিয়ে বসতে পারিস কিনা।

।। ১২ ।। কুম্ভকোণমের পর তাঞ্জোরে

ঘরে যখন থাকি তখন বাহির কেঁদে যায়, তার দিকে তাকাবার তেমন আগ্রহই হয় না। আর এই যে এখন বেরিয়ে পড়েছি—বাহির এমন করে দিনরাত টানছে যে, ঘরের কথা মনেই আনবার অবসর দিচ্ছে না।

দিনের পর দিন চলেছি তো চলেছি। কোথায় কলকাতা, কতদূরে সে পড়ে রয়েছে। কালীঘাটের কালীমন্দির, দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী, বেলুড়ের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, এসব একালের মন্দির। এঁদের দর্শন সেরে বঙ্গের প্রতিবেশী কলিঙ্গের ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, পুরী, কোণারকের প্রখ্যাত মন্দিরশৈলী, যার কেবল পুরাণত্বই নয়, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিশ্ব-বিখ্যাত—সেও কবে কখন শত শত মাইলের দূরত্বে পেছনে পড়ে গেছে। কলিঙ্গ পেরিয়ে অন্ধ্র, তার সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ ছাড়িয়ে তামিলনাদের পল্লব-প্রভাবে প্রভাবিত অত্যাশ্চর্য স্থাপত্য-ভাস্কর্য-বিমণ্ডিত মহাবলীপুরম, পক্ষীতীর্থ-প্রত্যক্ষ-বেদগিরীশ্বর, কাঞ্চীর একাম্বরনাথ দর্শন সেরে কুম্ভকোণমে রামস্বামী মন্দিরে সীতারামের যে গৃহীরূপ দেখলাম, সেও ঘরের পানে আকর্ষণ না করে কেমন যেন আরো দূরে ঠেলে দিতে চাইল।

একটু যে থামব, কদিন থেকে দিব্যি জমিয়ে বসব, সে জো নেই। সকালে এক জায়গায় নামি, মন্দিরপানে প্রাণপণে ছুটি। তিনতাড়াতাড়িতে দেখেশুনে তৃপ্তি হয় না, রসের পানপাত্র কোথাও বা একটু পূর্ণ হয়, কোথাও আবার শূন্য থেকে যায়। মন বলে,

"রংমহলের পুঁজি খুলে দেখরে পাগল মন।"

কিন্তু সময় কোথায় পুঁজি খোলবার। প্রায়ই রংমহলের অন্দরে প্রবেশপথ পাবার আগেই নতুন পথের ডাক আসে। অমনি মনে হয়, এ মহলের ভেতর-অঙ্গনে যতবড় রূপসাগর রসে টইটম্বুর হয়ে থাক না

কেন, অন্তর এখন যে আমার চাতক। বলতে গেলে বাউলের সুর জাগে,

"আমার মন হয়েছে পবনগতি
উড়ে বেড়ায় দিবারাতি।"

এই তো মাত্র একটি দিন আগে এখানে নেমেছিলাম। চব্বিশ ঘণ্টা যেতে না যেতে আবার চলার পথে রওনা হলাম। কয়েক মিনিট অন্তে দক্ষিণী সভ্যতার এক অতীত পীঠস্থান চোখের আড়ালে পড়ে গেল। শিবভক্তদের তীর্থক্ষেত্র, বিষ্ণুভক্তদের পুণ্যভূমি, রামভক্তদের বিহারক্ষেত্র, এ কালের গণিতভক্তদের স্মরণীয় গাণিতিক লোকোত্তর প্রতিভাশালী রামানুজের জন্মভূমি পুরাণ-ইতিহাসখ্যাত কুম্ভকোণম কত অনায়াসে পেছনে ফেলে এলাম। একবার প্রাণটা কেঁদে উঠতে চাইল। কিন্তু কিসের জন্য কান্না! কার জন্য! মন্দির তো দেখলাম, দেখলাম শ্রীরামের পট্টাভিষেক মূর্তি, দু'পাশে এক ভাইয়ের হাতে ছাতা, অন্য ভাইয়ের হাতে চামর। আর জনকনন্দিনী জন্মদুঃখিনী সীতার সাময়িক প্রোজ্জ্বল সুন্দর হাসি-হাসি মুখ। এ সবের পাশাপাশি যদি রক্তমাংসে গড়া মানুষের সাক্ষাৎ পরিচয় পেতাম, কিংবা পেতাম কারো এক কণা স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা, হয়ত আজীবন কুম্ভকোণমের জন্যে সর্বস্ব পণ করে বসতাম।

গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর, ক্ষেতের পর ক্ষেত, মাইলের পর মাইল পথ ছাড়িয়ে চলেছি। প্রকৃতিতে নূতনতর রূপ। যে রূপ অন্ধ্রের ওয়ালটেয়ারের, সে রূপ তামিলনাদের কাঞ্জীভেরামের নয়। আর কাঞ্চীর রূপের সঙ্গে মিলছে না তাঞ্জোরের রূপে। এখানে চলন্ত নূতনত্ব। কিন্তু কাঞ্চীতে, চিংগেলপেটে মানুষের যে রূপ দেখেছি, সে রূপে এখানে কোন নতুনত্বের সন্ধান পাচ্ছিনা তো। স্টেশনের পর স্টেশনে গাড়ী থামছে। যাত্রী নামছে, উঠছে। আবার গাড়ী ছাড়ছে। কামরার নতুন ভীড়ে নতুন মুখ, নতুন পোশাক, নতুন শাড়ি, নতুন বৈচিত্র্য খুঁজতে চাইছি। কিন্তু খোঁজাই সার। সেই চিংগেলপেট, কাঞ্চীতে যেমনটি দেখেছি, তেমনি এক ছাঁচে ঢালাই করা সব। এমন কি শাড়ির সঙ্গে পর্যন্ত মিল। না আছে নতুনত্ব, না আছে বৈচিত্র্য।

তাই প্রকৃতির দিকে ফিরে তাকাই। খালের পর খাল মাইলের পর মাইল জমিকে সরস করে বয়ে চলেছে। এই সকল খাল বহুকালের পুরাতন, এরা জলধারার জোগান যুগযুগান্ত থেকে পেয়ে আসছে দক্ষিণের দয়াশীলা পবিত্র নদী কাবেরী থেকে। কোন্ সেকালে চোল রাজারা কাবেরী থেকে খাল কেটে এনে তাঞ্জোরের মাটির সকল তিয়াস চিরতরে মিটাবার ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

এখন শ্রাবণ শেষ। এদিকে রীতিমত বর্ষা হয়ে গেছে। কাবেরী দুকূল ছাপিয়ে বইছে। তার উদ্বৃত্ত জলভার খালগুলিকে কানায় কানায় পূর্ণ করে তুলেছে। সেই পূর্ণপ্রবাহ দেখলে অন্তরে বুঝি ক্ষণে ক্ষণে পূর্ণজীবনের পিপাসা জেগে ওঠে।

বেশ কিছুটা বেলায় তাঞ্জোরে পেঁছালাম। স্টেশনের বাইরে এসে দেখি, সারে সারে গরুতে টানা ঝটকা দাঁড়িয়ে আছে। উত্তর ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ যেমন ঘন ঘন ঘটেছে তেমনটা দক্ষিণের বেলায় ঘটেনি। তাই বিদেশী ঘোড়ারা স্বদেশী হয়ে উত্তরে এক্কা, টাঙ্গা, ঝটকা টানে। আর বিলাসিতার কারণেও কোন কোন ঘরে ঘোড়া পোষার রেওয়াজ বাঙলাদেশ পর্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু মাদ্রাজ মহানগরী ছাড়ালে পর ঘোড়া প্রায় অমিল। মন্দের ভাল বলতে হয়, ঘোড়া অভাবে সম্ভবতঃ এদেশের লোকে ঘোড়া রোগে কম ভোগে।

গরুতে টানা ঝটকা অনভ্যস্ত চোখে কেমন যেন লাগে। তবে দুর্জয় ব্রাহ্মণত্বের তেজের জন্যে যেদেশ আজো প্রখ্যাত, সে দেশের সবাই যখন গরুর ঝটকায় চড়তে অভ্যস্ত তখন আমিই বা বাদ যাই কেন।

এ গরু আবার তেমনি। উত্তর ভারতের পেল্লাই বলদে টানা গাড়ী দেখলে রথ ভ্রম হয়, আর এখানকার এই ষাঁড়গুলো দেখলে গোজাতিতে বামন অবতারের উপস্থিতি অনুমান করা যায়। কিন্তু ঝটকা নিয়ে এরা প্রায় টাট্টু ঘোড়ার মতই ছোটে। দেখতে ছোট হলে কি হয়, গায়ে শক্তি রাখে।

স্টেশন থেকে সোজা পথ ধরে শহরে প্রবেশ-তোরণের কাছে এসে

একটি 'ব্রাহ্মিণ হোটেলে' আশ্রয় নিলাম। ব্রাহ্মিণ হোটেল বলতে আগের দিনের প্লাটফরমের 'হিন্দু চা', 'মুস্লিম চা'-এর মতন মার্কামারা হোটেল। অর্থাৎ এ হোটেলে ব্রাহ্মণের পাক, এখানে দক্ষিণী ব্রাহ্মণ সকল ভোজ্য তালিকা শাস্ত্রসম্মত বলে বিধান দিয়ে থাকেন কেবলমাত্র তারই দর্শন পাওয়া যায়। আর অনেকেই বোধ হয় জানেন. খাস দক্ষিণের ব্রাহ্মণ মাত্রেই মাছ-মাংসকে গোমাংসের সামিল বলেই ধরেন। শুনেছি বটে, সারস্বত ও কোকনী ব্রাহ্মণরা মাছ-মাংস অতটা অশাস্ত্রীয় মন করেন না। কিন্তু তাঁরা যে খাস দক্ষিণী নন !

হোটেলের কথাই যখন উঠল তখন হোটেল পর্ব শেষ করে ফেলাই ভাল। আহারবৃত্তির আধার দক্ষিণী দেশে দু'রকমের হোটেল। তার এক রকম ওই ব্রাহ্মিণ হোটেল, আরেক রকম মুস্লিম ও মিলিটারি হোটেল। প্রথমটি নিরবচ্ছিন্ন নির্মম নিরামিষ, দ্বিতীয়টি নেহাৎই আমিষ। কিন্তু এদেশে, সত্যি বলতে কি, নিরামিষ অর্থাৎ ব্রাহ্মিণ হোটেলগুলি যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তেমনি জনসমাগমে সকল সময় পরিপূর্ণ। তাই বলে কেউ যেন মনে না করেন, দক্ষিণের ব্রাহ্মিণ হোটেল একেবারে বঙ্গবিধবার পাকঘরের মত তকতকে, ঝকঝকে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পবিত্র।

'রেট' সস্তা, অতএব সস্তার নানান চরম অবস্থা। মাত্র দেড় টাকায় চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে একখানি কামরা পেয়ে যতটা পুলকিত হয়ে উঠেছিলাম, স্নানের জন্যে বাথরুমের সন্ধানে বেরিয়ে চারপাশের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখে ততটা নিরাশ হয়ে কোনরকমে কাকস্নান সেরে এক রকম ছুটতে ছুটতে দোতলার ঘরে এসে নিঃশ্বাস নিলাম। বেশ কয়েক বছর আগে গয়াতে গরমের দিনে সারারাত-জাগা কুলিদের দিবানিদ্রাকালে মাছিতে সারা দেহ ঢাকা রূপ দেখেছিলাম। পুরীতে স্বর্গদ্বারে যাবার পথে দু'পাশে মল ও ময়লা নিঃসরণের জায়গাগুলো কিছুদিন আগেও নাকচোখ বুজে না পেরোলে অনেক সময় অনেকেরই আহারে বসতে গা বমি বমি করত বলে জানতাম। জানি না, এখনো পুরীর দশা তেমনি

আছে কিনা। খাস কলকাতার কোন কোন এলাকার কথা আর বলতে চাইনে, পাছে পৌরসভার মাননীয় সদস্যরা মানহানির মামলা রুজু করে বসেন। আর তাঞ্জোরের ব্রাহ্মিণ হোটেলের প্রস্রাব-পায়খানার যে রূপ, সে যেন একালের ব্রাহ্মণত্বকে বত্রিশটি ময়লা দাঁত মেলে সকল সময় মুখ ভেংচাচ্ছে। এতক্ষণে বুঝলাম, যে মহান ব্যক্তি বলেছিলেন 'কালচারের' পরিচয় পাওয়া যায় পায়খানায়, তিনি কত বড় সত্য স্বদেশকে উপহার দিয়েছিলেন।

দুপুরে কোন কাজ ছিল না। পড়ে পড়ে চোখ বুজে হয়ত আলনস্করী স্বপ্ন বুনছিলাম, কিংবা কোন অলস কল্পনায় বলাকার পাখা মেলে সুদূর মানস সরোবরে উড়তে চাইছিলাম, এমন সময় ভেজানো দরজায় টোকা পড়তে মনে হল, অসময়ে আমার দ্বারে কোন্ অতিথি এল।

ত্বরিতে উঠে দ্বার মুক্ত করে সামনে যাকে দেখলাম, তাকে দেখে প্রত্যাশী মনের খুশী হবার কথা নয়। তাই কেমন যেন বেসুরে বেরিয়ে গেল, কি চাই।

শ্রোতা আমার প্রশ্ন কী বুঝলে তা সে-ই জানে। কেবল হাত মুখ নেড়ে আরেকটি ঘরের দিকে দেখিয়ে প্রাণপণে আমায় যা বোঝাতে চেষ্টা করলে তার কিছু বুঝি বা না বুঝি এইটুকু ঠিকই অনুমান করলাম যে, ওদিকের ওই ঘর থেকে আমার ডাক এসেছে।

কে ডাকে এ অসময়ে! যেই ডাকুক, হয়ত এরই পেছনে কোন সূক্ষ্ম নাটকীয় ইঙ্গিত আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠে থাকবে। তাই কোন এক অনাস্বাদিত প্রেরণায় লম্বা লম্বা পা ফেলে সবে এগোতে যাব এমন সময় ওদিক থেকে স্বয়ং এক শ্রীমান এসে সহাস্যে বললে, বোর্ডে নাম দেখেই অনুমান করেছি, এ আমাদের···সেই না হয়েই যায় না। তা কতদূর যাবার ইচ্ছে এবার?

আমি বললাম, 'আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে', বন্ধু, সে জানে কেবল সেই সুন্দরী। আমি তো জানি না 'কি আছে হোথায়—চলেছি কিসের অন্বেষণে।'

শ্রীমান আমার এক কালের বিশেষ বন্ধুবর। নামটিও চমৎকার। একটু সেকেলে, তবে সচরাচর এমনটা মেলে না। শ্রীঅচিন্ত্যচরণ। এখানে এমন আকস্মিকভাবে কোথায় কোন্ প্রিয়বান্ধবীর দেখা হয়ে যাবে, তার চেয়ে ভাল হয় যদি কোন নায়িকার সঙ্গে অকস্মাৎ মুখোমুখি হওয়া যায়, তা নয়—দেখা কিনা সঙ্গে অচিন্ত্যচরণের।

মুখে আয়ত হাসি টেনে বলি, তাহলে এখন, তুমি আর আমি একা।

বন্ধুবর বললেন, সঙ্গে মাসিমা আছেন।

তিনি আবার কে ?

কেন, মায়ের বোন। চল্ দেখবি এই বুড়ো বয়সে তীর্থ দেখার কী তীব্র বাসনা।

এমন গম্ভীর সুরের মধ্যে বন্ধুবর ফেলে দিলে যে জোর করেও আর চপল হওয়া চলল না।

বেলা পশ্চিমে হেলে এসেছিল। এমন সময় অচিন্ত্য একরকম ধরে নিয়েই চলল মাসিমার কাছে।

এই দেখুন মাসিমা, কাকে ধরে এনেছি।

এরই কথা বলছিলে না ? এস বাবা, এস। তোমার কথা অচিন্ত্যর মুখে শুনে শুনে তোমায় বহু আগে থেকেই চিনে ফেলেছি।

অচিন্ত্যর কথা বিশ্বাস করবেন না কিন্তু। ও নিশ্চয়ই আপনাকে অনেক বাড়িয়ে বলে থাকবে।

সে পরে হবে। আগে তো বসো।

মেঝেয় তকতকে দুটি বিছানা পাতা। তার যেটি অচিন্ত্যর তার উপরে অচিন্ত্য আমায় বসিয়ে দিয়ে নিজে পাশে বসে বললে, শুনেছিলাম, মাদ্রাজ আসা হয়েছে। ভাবলাম, একবার যখন দক্ষিণমুখো পা বাড়িয়েছিস তখন কি আর এদেশটা স্বচক্ষে না দেখে থাকবি। তা এমন হঠাৎ এখানে দেখা হয়ে যাবে এত বড় সৌভাগ্য কিন্তু ভুলেও কল্পনা করিনি।

প্রশংসায় স্বয়ং ভগবান কাবু হন, সাধারণ মানুষ হয়ে আমার না হবার কথা নয়। তবু প্রতিবাদ করলাম, সৌভাগ্য আর কিসে।

মাসিমা ওদিকে এক কোণে যে সামান্য এক টুকরো জায়গা রয়েছে সেখানে ছোট্ট একটি বঁটি পেতে শশা কুটতে কুটতে বলে উঠলেন, সৌভাগ্য কেন নয় বাবা, বিদেশ-বিভূঁয়ে অচিন্ত্য পেলো বন্ধুর দেখা আর তারই দৌলতে আমার তীর্থের রাস্তা এখন তো বলতে গেলে একরকম নিরাপদ।

ঃ আমার সঙ্গে দেখা না হলেও আপনার তীর্থের পথ চিরনিরাপদই হত মাসিমা।

কথা বলছেন, সঙ্গে সঙ্গে শশার খোসা ছাড়িয়ে চাকা চাকা করে দুটি প্লেটে রেখে দিচ্ছেন। সেই ফাঁকে আমি চটপট ঘরের চারপাশটায় চোখ বুলিয়ে নিলাম। আমারই ঘরের সমান একখানি ঘর। কিন্তু দুটি ঘরের রূপই যেন আলাদা। এ ঘরের যেদিকে তাকানো যায় দিব্যি গোছগাছ, এমনকি মায় রাত্রিতে কোথায় কোথায় মশারির দড়ি খাটানো হবে তার জন্যে রীতিমত পেরেক পোঁতাও সারা। আর এককোণে ছোট্ট একটি সোরাহীতে পথে পথে পান্থজনের পিপাসা মেটাবার জল রাখা রয়েছে। সোরাহীর মুখটি আবার পরিষ্কার এক টুকরো কাপড় দিয়ে ঢাকা। এ কোণে বালতির মধ্যে যত রাজ্যের সাংসারিক নিত্য-ব্যবহার্যের বস্তুভার ঠাসা। ওদিকে দেখছি, ছোট্ট একটি স্পিরিট ল্যাম্প। নেহাৎ কিছু খাবার-দাবার না মিললে 'ক্লিম'-কে মিক্স করে নেওয়া চলতে পারে, না হয় চমৎকার হরলিকস্ তৈরি করা যায়। পথ চলব অথচ কোন কিছুর অসুবিধায় ভুগতে হবে না, এ যেন সেই ব্যবস্থা। এবং এমন চমৎকার ব্যবস্থা চালু রাখবার যোগ্যতা যাঁর আছে তিনি স্বয়ং উপস্থিত। এখন কে বলবে আমরা হোটেলের কামরায় হঠাৎ তিনজন মুসাফির একত্র হয়েছি?

মাসিমা শশা শেষ করে নারকেল কুরে প্লেটে রাখছেন। তারপর কলা ছাড়াবার পালা। সেটি শেষ হলে প্লেট দুটি আমাদের দুজনের কোলে এগিয়ে দিয়ে বললেন, অচিন্ত্য, ধোয়া হাতে দু'গ্লাস জল ভরে নাও।

আমাদের এক প্লেটেই হবে মাসিমা।

না না, সে কি হয়, আমার যে উপবাস।

এর পর আর কথা চলে না। তবু একবার বলি, উপবাসে ফলাহার তো দূষণীয় নয়।

সে কথা কি মাসিমা শুনতে চান। শেষটা অনেক পীড়াপীড়িতে তিনি বললেন, বেশ তো তোমরা দু'বন্ধুতে এটুকু খেয়ে ফেল। আমি প্রয়োজন হলে, আরো তো রয়েছে, নিয়েই খাব।

॥ ১৩ ॥ তাঞ্জোর প্রাসাদের অভ্যন্তরে—১

একটু বাদেই তাঞ্জোর প্রাসাদ দেখতে রওনা হওয়া গেল। বেলা থাকতে থাকতে এইবেলা এ কাজটা সেরে রাখা ভালো।

সোজা রাস্তা। স্টেশন থেকে একরকম সিধে চলে গিয়েছে প্রাসাদের সিংহদ্বারে। আমরা তিনজনেই এবারে এক তাঞ্জোর ঝটকায় বসে চলেছি। পথের এক পাশে একটানা বেশ উঁচু প্রাসাদ পাঁচিল। প্রাসাদশীর্ষ দেখতে গেলে ঘাড় ব্যথা করতে হয়।

পথের দিকে পাঁচিলের গায়ে সেকালে ছোট-বড় যে সকল দরজা ছিল, আজ সেগুলি বন্ধ। কিছুদূর এগিয়ে প্রাসাদের গায়ে কিসের একটা সাইনবোর্ড দেখেছিলাম, আজ সঠিক মনে পড়ছে না। কেবল এইটুকু স্মরণ আছে যে, সে সাইনবোর্ডের সঙ্গে রাজপ্রাসাদের চৌদ্দপুরুষের কোন সম্পর্ক থাকবার কথা নয়।

আরো এগিয়ে গিয়ে সিংহদ্বার। তার অভ্যন্তরে ঢুকে তো চক্ষু চড়কগাছ! প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে আমাদের স্বদেশী সরকারের 'অধিক খাদ্য ফলাও বিভাগ' রীতিমত ফলাও করে কলের লাঙ্গলগুলোতে মরচে পড়বার দায়িত্ব নিয়ে বেশ বহাল তবিয়তে জাঁকিয়ে বসে আছেন। আর একপাশে প্রাসাদের গায়ে পাঠশালা চলছে। সেখানে সেকালের মারাঠা রাজাদের রক্ত যারা একালেও বহন করছে তাদের কোন কোন বংশধর পাঠ নিচ্ছেন বই তো নয়।

পাঠশালার দরজা পেরিয়ে যেই না আরেকটি অঙ্গনে ঢুকছি, সেখানে সবাই গাইড। কেউ কেউ আবার খোদ প্রাসাদ-মালিক। তাজ্জব ব্যাপার! মারাঠা রাজপ্রাসাদের এতগুলো মালিকের মধ্যে থেকে আসল মালিক চিনে নিতে হলে দুই-একজন আলীবর্দী খাঁ-এর প্রয়োজন! আমরা তো একান্তই অভাজন। অতএব সোজা যেদিকে দু'চোখ যায়, সেদিকে এগিয়ে চললাম। কয়েক পা এগোতেই বেশ বুঝলাম, প্রাসাদের

মালিকরা আমাদের আর আমল দিচ্ছে না। বাঁচলাম, একেই রাজপ্রাসাদ, তার এতগুলো মালিক, এদের নেকনজরে পড়ে গেলে আর কি রক্ষে ছিল !

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি কি না ফেলেছি—পেছন থেকে এক খঞ্জ এসে দিব্যি হেসে বললে যে, সে সব ঘুরিয়ে-ঘারিয়ে দেখিয়ে দিতে প্রস্তুত। আর তার অনুমতি ছাড়া 'আর্ট গ্যালারির' দরজা তো খোলা হবেই না।

খঞ্জের মুখে এত বড় বিপদভঞ্জন বাণী শুনে মাসিমা খুশী হয়ে বললেন, তাহলে অচিন্ত্য, একেই সঙ্গে নাও।

অতঃপর খঞ্জ আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে দাঁড়ালো। যদিও নীতিকথার অন্ধের ঘাড়ে চড়া তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল না, তবুও অচিন্ত্য বলল, এবার ইনি ঘাড়ে চাপলেন কিন্তু।

প্রাসাদের অভ্যন্তরে আমরা একরকম অন্ধই বলতে গেলে। আমরাও যেমন প্রাসাদও তেমন আমাদের কাছে অন্ধকারময়। এ প্রাসাদ তো আজকার নয়। এর কোন কোন অংশ নিঃসন্দেহে অতি পুরাকালের। হয়তো যেকালে এখানে পুরা কাহিনীর কল্পনায় আঞ্জন দৈত্য আশপাশ বিধ্বস্ত করে ফিরত সেকালের প্রাসাদ এ নাও হতে পারে। কিন্তু প্রাচীন চোল রাজাদের আদি আমলে যে এ প্রাসাদের কোন-না-কোন অংশের ভিত্তি গাঁথা হয়ে থাকবে, সে কথা সম্ভবতঃ বললে ভুল হবে না।

খঞ্জ আমাদের মারাঠা আমলের দরবার-হলে নিয়ে তুললে। হলের চার পাশে মারাঠা রাজাদের তৈলচিত্র আজকাল বিবর্ণ, ধ্বংসের অবস্থায় উপনীত। সেদিকে তাকিয়ে দেখছি এমন সময় খঞ্জ তার কাহিনী বলতে আরম্ভ করল।

—এই যে উত্তর দেওয়ালে ছোট্ট দরজাটি দেখছেন, ঐ পথে এককালে নায়েক রাজারা কোন্ রূপমহলে ঢুকে পড়তেন তার খোঁজ আজ আর কে রাখে। নায়েক রাজাদেরও আগে চোল রাজারা এদিকটায় বড় একটা আসতেন না। কিন্তু মারাঠা আমলে এপথে আনাগোনা যাদের চলত, তাদের দেহে রাজরক্তের চিহ্ন খুঁজতে গেলে বেকুব বনে যেতে হত।

খঞ্জ বেশ গল্প বলে। তবে মাসিমার বড় তাড়া। কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব গল্প শুনে সময় খোয়াতে যায়। আমার অবশ্যি মত অতটা কড়া নয়। কারণ জমিদার ঘরের খোঁজ-খবর ধোপা-নাপিতে যতটা রাখতো, ততটা স্বয়ং খোদ কর্তাও রাখতেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে; তেমনি তাঞ্জোর-চোল-নায়েক-মারাঠার রাজপরিবারের প্রকৃত কাহিনী যদি কিছু থেকে থাকে, সে রয়েছে এই সব খঞ্জ, দুঃস্থ প্রাসাদের দাবীদারদের বিশুদ্ধরুচি-অননুমোদিত স্বতঃস্ফূর্ত সহজ কাহিনীতে। কিন্তু সে কাহিনী নিয়ে গবেষণার মনোবৃত্তি আপাতত নেই।

ওদিক থেকে মাসিমার তাড়া, চল অচিন্ত্য। বন্ধুকে ডাক।

এদিকে খঞ্জের আগ্রহ, চলুন স্যার, দক্ষিণের দেয়াল দিয়ে ঢুকে পড়লেই হল একবার, দুটো পাথর সরাতেই মাটির তলায় পাতাল ঘর দেখতে পাবেন। জানেন, আগে ঐ পথে হাঁটতে শুরু করলে পঁচিশ মাইল দূরে শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের একেবারে পেট ফুঁড়ে বেরোন যেত।

এই পর্যন্ত বলে খঞ্জ একটু থেমে চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে যেন একটু সঙ্কোচ ও ত্রাসে চরমতম গোপন খবর কেবল তার মক্কেলের কাছেই ফাঁস করতে চাইছে এম্নি ভঙ্গিতে বললে, জানেন এই সেবারও ওই সুড়ঙ্গ পথে একদল গুপ্তধন খুঁজতে গিয়েছিল।

আমি তখন উৎকর্ণ। কিন্তু খঞ্জ আর মুখই খুললে না। কেমন যেন মনে হল, কে তার মুখটা আঠা দিয়ে এঁটে দিয়েছে। এবারে আর কিছু খোঁজ-খবর বের করতে হলে অতি আগ্রহে এই মক্কেলকেই ওই আঁটা মুখ টেনে খুলতে হবে। তা হবে বৈকি, আপন মনেই কথাটা বলি আর প্রশ্ন করি, যারা গুপ্তধন খুঁজতে গেল তারা পেলটা কি?

উঁহু…

খঞ্জ চোখ-মুখের এমন একটা ভাব করলে, যার মানে হল, ব্যাপারটা সহজ নয়। এমনভাবে মাথা নাড়তে শুরু করে দিলে, যেন কোন রোগে ধরেছে তাকে। বেশ করে তাকিয়ে দেখি, মাথা ডাইনেও নড়ে বাঁয়েও

নড়ে। ভয় হয় পাছে—আগে-পিছে না নড়তে আরম্ভ করে। তাই উদ্বিগ্ন হয়ে বলি, মশায়, বলুন না গুপ্তধনের আসল রহস্যটা।

খঞ্জ এবারে নিজের পরিচয় দিলে, আসল রহস্যটা মুলতুবী রেখে। বললে, হাতে এই চিহ্ন আঁকা দেখছেন, এর অর্থ কি জানেন?

হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। এখন অর্থ, অনর্থ, পরমার্থ যথার্থই এই খঞ্জের হাতে।

অবস্থা সঙ্গীন। ওদিক থেকে অচিন্ত্যর আবার ডাক এল। পাছে রহস্যটা মাঠে মারা যায়, সেই ভয়ে খঞ্জ আস্তে আস্তে বলে উঠলে, গুপ্তধন সন্ধানীরা আর ফেরেনি।

এরপর দাঁড়িয়ে থাকা আর সাজে না। সটান চলতে শুরু করলাম। আমায় যে ফিরতে হবে।

আমাদের চলার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ খঞ্জ ত্রস্তব্যস্ত হয়ে ছুটে এল। ততক্ষণে গুপ্তধনের সন্ধানীদের সকল রহস্য আমার অন্তরে ভস্ম হয়ে গেছে। সে গেলে কি হয়! খঞ্জ আবার সুযোগ চায়, যদি রোমাঞ্চটা শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া যায়।

আর্ট গ্যালারি একালের ব্যাপার। বাইরে থেকে ইমারতটি দেখে বেশ বোঝা যায়, এটি বেশীদিনের পুরনো নয়। কিন্তু ভেতরে ঢুকতেই চোখে ধাঁ-ধাঁ লাগে। এ যে দেখি যুগ-যুগান্তের রত্নের খনি।

মানুষ পাথর কুঁদে ভাস্কর্য সৃষ্টি করছে গতকাল থেকে নয়, বহু শত বৎসর থেকে। বলতে গেলে, পাথুরে ভাস্কর্যের যুগ প্রায় শেষ হয়ে এল। অমরাবতী, কোণারক, মমল্লপুরম (মহাবলীপুরম), কাঞ্চী, অজন্তা ইলোরা, এলিফ্যান্টার ইতিহাস আজকাল গবেষকের খাতার পাতায় স্থান পেয়েছে। পাথর কুঁদে মূর্তি গড়া তো দূরে থাক, প্লাস্টার অব প্যারিস-ও একালে খুব কম ভাস্করকে ছুঁতে দেখা যায়। এখনকার কোন কোন ভাস্কর আবার চাইছেন কাদার প্যাঁজ একটু চেপে-চুপে তাকে ভাস্কর্য বলে চালিয়ে দিতে। এই যখন চালু হতে চলেছে, তখন হঠাৎ যদি কাউকে সীমাহীন সৌন্দর্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, তার কি

আর বাক্‌স্ফূর্তি হবার জো থাকে! এ যেন সেই হঠাৎ আলোর ঝলকানি। না-না, এ যেন ঠিক সৌন্দর্যপিপাসু তৃষিত আত্মার সমুখে অমৃতের পূর্ণকুম্ভ তুলে ধরা। যথার্থই যেন রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধনের' নায়ক মৃত্যুঞ্জয়কে মরিচাপড়া লোহার দ্বার খুলে কত কত শতাব্দীর সঞ্চিত গুপ্তধনের ঠিক মাঝখানটিতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া।

"এ দুটি চোখ ফণির মাথার মণির মত জ্বলতে লাগল। ইচ্ছে হল, চীৎকার করে ঘোষণা করি, এসব আমারই।" ভাল করে চোখ মেলে দেখি, পাথরের মূর্তিগুলি সব হাসছে। কোন দূর শতাব্দীর আদিতে নিয়ে আমায় কে যেন কানে কানে বললে, এই সামনে যাকে দেখছ, চিনতে পারছ ? ইনি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা।

পিতামহ ব্রহ্মা, তাঁর সামনে এমন চুপি চুপি কথা বলবার কি প্রয়োজন। হঠাৎ অন্তরের কোন্ তলদেশ থেকে চিরকচি মনটি বেরিয়ে এসে বললে, এই যে দাদু, সারা দেশ ঘুরে এতদিনে তোমার সাক্ষাৎ পেলাম। ব্যাপার কি বল তো ? দেশজোড়া শিব আর বিষ্ণুর মন্দিরের মেলা। কেবল তোমার বেলাতেই যত রাজ্যের অবহেলা।

দাদু আমার কি কথা বলবেন! হয়তো পৌত্রের চপলতায় চুপটি করে মনে মনে হাসছিলেন। কিংবা ভাবছিলেন, সত্যিই তো সংসারে সংহার ও পালন কর্তা এ দুজনের পূজোর কি ঘটা! শুধু সৃষ্টিকর্তার বেলাতেই কোন আড়ম্বরের বালাই নেই।

পিতামহকে প্রদক্ষিণ করে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। যেমন সামনের মুখটি সুন্দর তেমনি পেছনেরটিরও। আর কি চমৎকার দেহের গঠন। যেন পাথরে ছন্দোবদ্ধ দেহের দুর্লভ কবিতা। প্রতি অঙ্গ নিখুঁত পরিমাপে কুঁদে তোলা। সর্বশরীরে স্বাস্থ্যের দীপ্তি। মাংসে সুষম কিন্তু কোথাও একবিন্দু মেদের আভাস নেই। চিত্তহারী সর্বাঙ্গে নয়নরঞ্জন অলঙ্কারের ছড়াছড়ি অথচ এক ফোঁটাও বাড়াবাড়ি দেখতে পাওয়া যায় না। কিরীটভূষণ, কর্ণে কুণ্ডল, গলে রত্নহার, হাতে কঙ্কণ, বাহুতে বলয়, পায়ে মঞ্জীর। প্রত্যেকটি অলঙ্কার নিপুণ কারুকলার চাতুর্যেও চমৎকারিত্বে অভিনব।

সামনে এগোতে যাব, কিউরেটার বললেন, এটি কিন্তু কোন্‌-কালে কলকাতার যাত্বঘরে গিয়ে উঠত। এর আবিষ্কারও করেছিলেন কলকাতারই পুরাতত্ত্ব বিভাগের কোন একজন কর্মচারী করন্থি পল্লীতে। কিন্তু যেই তিনি মূর্তিটি কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইলেন, সেই যেন স্থানীয় লোকদের চৈতন্যের উদয় হল। যে মূর্তি ছিল অবজ্ঞাত অবহেলিত এক নদীর পাড়ে পড়ে, হঠাৎ তাকে পূজা করার ধুম পড়ে গেল। পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। এখানকার আর্ট গ্যালারি প্রতিষ্ঠার কাল থেকে পিতামহ ব্রহ্মা বহাল তবিয়তে এখানেই আছেন।

ওপাশ থেকে মাসিমা ডাকেন। সেখানে যেতেই তিনি বলে ওঠেন, দেখ দেখ, গণেশের নাচ দেখ। সেই কথায় বলে,

শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র,
গোকুলে গোপিকা নাচে পাইয়ে গোবিন্দ।

এ দেখছি একেবারে নাচের চরম, স্বয়ং নাচছেন গজানন।

আর্ট গ্যালারিটি খুব যে বিশাল তা নয়। এখানকার সংগ্রহে হয়তো ভারতের অতুলনীয় ভাস্কর্য-নিদর্শনগুলির সেরা সংগ্রহ তেমন কিছু নেই। সেগুলি কলকাতা, মাদ্রাজ যাত্বঘরে বহুকাল আগে স্থান লাভ করেছে। কিন্তু একটি জেলা শহরে এতগুলি অনিন্দ্য সংগ্রহ দেশের আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

আর্ট গ্যালারির চারদিক ঘুরতে ঘুরতে যে ভাস্কর্যগুলি বিশেষভাবে মনকে নাড়া দেয়, তাদের সকলের প্রতি সুবিচার করতে গেলে ক্রমাগত ভাস্কর্য-পুরাতত্ত্বের কথায় গা ভাসিয়ে না দিলে নিরুপায়। তাই কেবল তাদের স্মরণ করতে নাম ত্ব'-চারটি উল্লেখ করতে চাই। গজসংহার, দক্ষিণামূর্তি, ভিক্ষাদান, নারায়ণী, অন্নপূর্ণা, শিবপার্বতী আর ঋষিপত্নীর প্রতি দৃষ্টি পড়লে সে দৃষ্টি আর সহসা ফেরানো যায় না। বিশেষ, ঋষি-পত্নীদ্বয়ের বিবসনা মূর্তিতে বাস্তব জীবনের স্পর্শ যেন ফরাসী সাহিত্যের জীবন-চেতনার মত জীবন্ত।

পাথরের মূর্তিগুলির অনুরূপ ধাতুমূর্তি যেগুলি আর্ট গ্যালারিতে রাখা

হয়েছে, তাদের মধ্যে দক্ষিণের নিজস্ব নটরাজ দর্শকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আরেকটি বস্তু এই আর্ট গ্যালারিতে কাঁচের আধারে রাখা আছে, যা দেখে আমরা সকলেই চরম ধোঁকা খেয়ে গেছলাম। ঝকমকে কাঁচকে অনেক সময় অনভিজ্ঞ চোখে হীরক ভ্রম হয়, কিন্তু সোলার কাজকে হাতীর দাঁতের কাজ বলে ভ্রম হওয়া সত্যিই কি তাজ্জব নয়! দু-একজনের চোখে এ ভ্রম জাগলে কথা ছিল না। কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা যেমন বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে কাঁচাধারে রাখা দক্ষিণের মন্দির ও গোপুরমকে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, কি বিস্ময়কর হাতীর দাঁতের শিল্পকাজ! তেমনি দেশ-বিদেশের আরো অনেকে কিউরেটর আসল সত্য ফাঁস না করা পর্যন্ত ধরতেই পারেনি যে, সামান্য সোলা দিয়ে এমন অসামান্য শিল্প সৃষ্টি হতে পারে। সত্যি বলতে কি, বাঙ্‌লাদেশের সেরা সোলার টোপর যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাও তাঞ্জোরের সোলার কাজ দেখে 'থ' বনে যাবেন।

কতক্ষণ যে এক দৃষ্টিতে ঐ শিল্পকর্মের দিকে সবাই তাকিয়েছিলাম, কোন খেয়াল ছিল না। খেয়াল হল সেই খঞ্জের তাড়ায়। সে বললে, তাড়াতাড়ি চলুন। একটু বাদেই সঙ্গীতমহল বন্ধ হয়ে যাবে।

এই ধরণের গাইডরা এদেশে কেন, সারা ভারতেই সমান। এরা যত বেশী দর্শনার্থী বাগাতে পারে, ততই বর্তে যায়। তাই দর্শকের দেখবার মাঝপথে, কি আগ্রার দুর্গে আর কি তাঞ্জোরের আর্ট গ্যালারিতে ঘন ঘন দরজা বন্ধের সতর্ক-বাণী এদের সব সময়ই মুখে বাঁধা। ব্যাপারটা আমার অজানা ছিল না। এও জানা কথা, 'যেখানে রুটি সেখানেই জুটি'-র দল। কাজেই, কিছু বলাও বৃথা। তবু আমার সেই মুহূর্তে সঙ্গীতমহলে ঢুকে পড়বার কোন তাড়াই ছিল না। কিন্তু অচিন্ত্য নেহাৎই নাছোড়বান্দা, সে আজ সন্ধ্যার আগেই সঙ্গীতমহল তো সঙ্গীতমহল, পূরো তাঞ্জোর দেখে শেষ করতে পারলে বাঁচে।

॥ ১৪ ॥ তাঞ্জোর প্রাসাদের অভ্যন্তরে—২

এতক্ষণে মনে পড়ে, সেই যেদিন আগ্রার দুর্গের অভ্যন্তরে ঘুরতে ঘুরতে বার বার অনুভব করেছিলাম হারানো অদ্ভুত এক অনুভূতি—এইখানে কোথাও সঙ্গীতসম্রাট তানসেন নিশ্চয়ই মাইফেল শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে একটু আড়ালে বসে কি জানি কি ভাবতেন। হয়তো, নূতন রাগ-রাগিণী সৃষ্টির কল্পনা তাঁর অন্তরে আলোর মত ঝলমলিয়ে উঠত কিংবা মনের কোন নিভৃতে বাসনা জাগত, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।' সুন্দর ভুবনকে সঙ্গীতে যাঁরা সুন্দরতম করে তুলতে চেয়েছেন তাঁদের দিগ্বিজয়ী সম্রাট তানসেন, বিটোফেন আর ত্যাগরাজ—এই তিন দিকপালের দুই দিকপাল জন্মেছেন এই ভারতেরই দুই প্রান্তে। তাঞ্জোরে এই যে মাটিতে পা দিয়ে এখন হাঁটছি এরই রেণুতে রেণুতে মিশে আছে দক্ষিণের তানসেন ত্যাগরাজের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস।

আজ থেকে একশ' বছরের কিছু বেশী হল ত্যাগরাজ মরদেহ ত্যাগ করেছেন। একশ' বছর আর মহাকালের চলার পথে কতটুকু কালই বা। এই সদ্য সেকালে তা হলে এই মাটিতে ত্যাগরাজের পায়ের ধূলো মিশেছিল। কে বলতে পারে, সে ধূলো মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেছে। হয়তো সে ধূলিস্রোতে আজকার দিনের পিপাসু মনের দীর্ঘশ্বাস এই মুহূর্তে মিশে গেল। তাই বুঝি অন্তর হঠাৎ কার বিরহে নীরবে কেঁদে উঠল।

অদ্ভুত দুঃখদৈন্যের জীবন ছিল ত্যাগরাজের। বেদনার অন্তহীন বন্যা কাবেরীর বন্যার মত তাঁর অন্তর অমৃতরসে চিরসঞ্জীবিত করে তুলেছিল।

তিন পুরুষ আগে নিদারুণ দৈন্যের দায়ে ত্যাগরাজের পূর্ববর্তী প্রপিতামহ এই তাঞ্জোর জেলায় ভাগ্যান্বেষণে এসেছিলেন। তাঞ্জোরের অদূরে তিরুভালুর পল্লীতে ত্যাগরাজ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু মাত্র পাঁচ বৎসর যেতে না যেতে বালক ত্যাগরাজকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর পিতৃদেব

তিরুভায়ুর পল্লীতে যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য, সেখানে সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

তখনকার দিনে তিরুভায়ুরে সংস্কৃত শিখবার খুব তোড়জোড় ছিল। বড় বড় পণ্ডিতেরা রাতদিন সংস্কৃত চর্চায় লিপ্ত থাকতেন। তাঁদের পায়ের তলায় বসে শ্রীমান ত্যাগরাজ কালে মস্ত বড় পণ্ডিত হবেন, এই ছিল ত্যাগরাজের পিতার একমাত্র আশা। কিন্তু যিনি ভাবীকাল জয় করবেন রাগ-রাগিণীর আলোকচ্ছটায়, তাঁর সংস্কৃত শিক্ষা খুব বেশীদূর এগোয়নি। তিরুভায়ুরের আরেক নাম ছিল 'পঞ্চনাদক্ষেত্র'। এই নামের গুণে, না সেখানকার 'নাদে'র প্রভাবে ত্যাগরাজ ভাবীকালের দক্ষিণী তানসেন হবার পথে পা বাড়িয়েছিলেন কে জানে।

দুর্ভাগ্যক্রমে অতি অল্প বয়সে ত্যাগরাজকে সংসারে ফেলে তাঁর পুণ্যবান পিতৃদেব জীবনের পরপারে পাড়ি জমালেন। এর পর কোথায় রইল তাঁর সংস্কৃত পড়া, কোথায় বা গেল স্নেহময় পরিবেশ!

সংসারে তখন আপন বলতে মাথার উপরে এক ভাই। সে না বোঝে ত্যাগরাজের স্নেহের খাঁই, না শুনতে চায় প্রাত্যহিক কাজকর্মের প্রয়োজন ছাড়া আর কোন কথাটাই। এর উপরে আর এক ফ্যাসাদ! ত্যাগরাজ শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করেন,,দাদা তাঁর মনে করে, অপদার্থ ভাইয়ের খেয়েদেয়ে আর কোন কাজ নেই, কেবল দিনরাত রামকে নিয়ে পড়ে পড়ে আলসেমি করা। 'হুঁঃ', দাদাটি মনে মনে সঙ্কল্প আঁটে, 'একবার ফাঁক পেলে ওই পুতুলটাকে কাবেরীর জলে যদি ছুঁড়ে না ফেলি তবে' ...ক্রৌঞ্চের বুকে ব্যাধের শরাঘাত বাল্মীকির কবিত্বলাভে সাহায্য করেছিল। ত্যাগরাজের সঙ্গীত-উৎসের রুদ্ধদুয়ার খুলতে আরেক বেরসিক টান মেরে ত্যাগরাজের পূজিত শ্রীরামমূর্তি কাবেরীর জলে ফেলে দিয়ে সেই ব্যাধেরই মত কাজ করল। যে বেদনার আঘাতে বাল্মীকির কবিত্ব হৃদয়-নির্ঝরের বুক ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল, তেমনি আর এক বেদনার আঘাতে ত্যাগরাজের কণ্ঠে বিধুর কর্ণাটিক বেহাগ ক্রন্দসীর মত ডুকরে কেঁদে উঠল।

তারপর ?

শুরু হল ত্যাগরাজের সঙ্গীত-অন্বেষণা। পায়ে হেঁটে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। কোন্ সঙ্গীত-তীর্থের উদ্দেশ্যে কে জানে! পথে পথে ঘোরেন, মন্দিরে গিয়ে বসেন। বিগ্রহের দিকে চাইতে হৃদয় নব নব আনন্দে বিগলিত হয়ে ওঠে। সে আনন্দের ধারায় অবগাহন করে বেরিয়ে আসে নূতনতর রাগ-রাগিণী। সুরের অতলসমুদ্র মন্থন করে অমৃতের পাত্র ত্যাগরাজ তুলে ধরেন রসতিয়াসীদের মুখের সুমুখে।

একদিন বহুদূর থেকে ভেসে এল ত্যাগরাজের সঙ্গীতখ্যাতি। তাঞ্জোররাজের কানে উঠল। অমনি মহারাজ দূত পাঠালেন ত্যাগ-রাজকে সাদরে রাজসভায় বরণ করে আনতে।

তানসেন সম্রাট আকবরের সভা আলোকিত করেছিলেন। আর ত্যাগরাজ আলোকিত করলেন তঞ্জোরের রাজপ্রাসাদ।

ত্যাগরাজ শ্রী, কল্যাণী, তোড়ি, বেহাগ প্রভৃতি রাগে যেসকল সৃষ্টি করে গেছেন, আজ শতবর্ষ পরেও সে সঙ্গীত অম্লান হয়ে রয়েছে। আর দক্ষিণ দেশে তিনি শুধুমাত্র সঙ্গীতস্রষ্টাই নন, পরম ভক্ত, অনন্য-সাধারণ সাধুসন্তরূপে চিরস্মরণীয়।

কর্ণাটিক সঙ্গীত জগতে ত্যাগরাজের কীর্তন কেবল স্মরণীয় ও বরণীয়ই নয়, দুর্লভ রত্নরাজির মত যুগে যুগে রক্ষণীয়। কে বলতে পারে অতীতে একদিন এই সঙ্গীতমহল তাঁর সুরলহরীতে পরিপ্লুত হয়ে ওঠেনি!

সঙ্গীতমহলের দরজার সামনে দাঁড়াতে কি জানি কেন যেন বুক দুরদুর করতে শুরু করে দিল। মনে হল, কি সৌভাগ্য! একদিন ভক্ত কবীরের দেশে দাঁড়িয়েও ঠিক এমনি মনে হয়েছিল। আরেকদিন সন্ত তুকারামের দেশের মাটিতে পা দিতেই সারা অন্তর পুলকিত হয়ে উঠেছিল। আজ এইখানে এ সঙ্গীতমহলে ঢুকতেও অন্তর তেমনি আশ্চর্য পুলকে ক্ষণে ক্ষণে দুলছে।

ত্যাগরাজ গেয়েছিলেন, মন্ত্রতন্ত্রের কি তেমন কোন প্রয়োজন আছে ?

গঙ্গা-কাবেরীতে ডুব দিলেই কি পাপীর মনের সমস্ত পাপ ধুয়ে যায়? তপ করলেই কি কামনা-বাসনা, ক্রোধ-পিপাসা মিটতে পারে? এই যে জিজ্ঞাসা এ তো আমার মত সকল সাধারণ মানুষেরই মনের কথা।

সবার উপরে ত্যাগরাজ ছিলেন রক্তমাংসে গড়া মানুষ। এই শ্রীরামভক্ত তাই শ্রীরামকে অবতারের আকাশ-উচ্চ আসন থেকে ডেকে এনেছেন ঘরের কোণে। অঙ্গনে শিশু রামের সঙ্গে সুরের লহরীতে তিনি যে খেলা খেলেছেন, সে খেলা আমাদেরই ঘরে ঘরে নিত্যকার।

কিন্তু ত্যাগরাজের সঙ্গীত সাধারণ মানুষকে ঊর্ধ্বলোকে তুলে আনবার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে। সে সঙ্গীত শুনলে মনে এক অপাথিব আনন্দের সঞ্চার হয়। কেবলই মনে হতে থাকে, এই স্থূল জীবনে অমৃতের সন্ধান যদি না পেলাম, পশুর সঙ্গে মানুষের তবে আর তফাৎ কি রইল।

ততক্ষণে সঙ্গীতমহলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছি। মহলটি পুরাতন সন্দেহ নেই। যদিও সদ্য সদ্য চূণকাম করায় আপাতদৃষ্টিতে একে প্রাচীন বলে ভাবতে পারা বড় সহজ নয়।

লম্বা আকৃতির মহলের একদিকে মঞ্চ। ওই মঞ্চের উপরে বসে বিনা মাইকে যে কোন সঙ্গীত এখানে পরিবেশিত হতে পারে। অথচ আলাপের একটুকরো কারো কর্ণ থেকে অশ্রুত থাকবার জো নেই। স্বর বিস্তার ও বিন্যাসের এমন চমৎকার হলঘর শোনা যায়, একমাত্র জার্মাণীতে একটি রয়েছে। কিন্তু সেখানেও কাঠের আচ্ছাদনের নাকি বাড়াবাড়ি। আর এখানে কাঠের তেমন ব্যবহার কোথাও নেই।

সঙ্গীতমহল সঙ্গীতছুটদের কাছে কিছুই নয়, শুধু একটা ইটের ইমারত। কিন্তু সুরস্রষ্টা এবং সঙ্গীতবোদ্ধাদের কাছে এ এক মহান্ তীর্থমন্দির। তাই সাত সমুদ্র তের নদী পার থেকেও বহুজন এ তীর্থমন্দির দর্শনে এসে থাকেন। তাঁরা সশ্রদ্ধ বিনয়ে তাঞ্জোরের সঙ্গীতমহলের দ্বারে একবার মাথা ঠেকিয়ে মনে মনে নিজেকে ধন্য

মেনে বারেক দক্ষিণের তিন সঙ্গীতসম্রাটের নাম স্মরণ করতে ভোলেন না। সে সময় সহসা তাঁদের কানে বুঝি সুরের পর সুর সুমধুর ঝঙ্কার তুলে বলে, ত্যাগরাজ, শ্যামশাস্ত্রী, মুথুস্বামী দীক্ষিতার চির অমর।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল। আমরা খঞ্জকে বিদায় করে হাঁটা পথে হোটেলের পথ ধরলাম। মাথার উপরে জ্বলছে বিদ্যুতের আলো। দুই একখানি মোটরগাড়ী মনের খেয়ালে হর্ণ দিতে দিতে ছুটে গেল। নির্জীব, নিস্তব্ধ প্রাসাদ কোনরূপ প্রতিবাদের ধার দিয়েও গেল না। আগের দিন হলে কি যে ঘটে যেত সে সেকালের লোকেরাই জানে।

যে পথ দিয়ে একদিন চোলরা চলেছিল, নায়েকরা দর্পভরে যে পথের বুক কাঁপিয়ে তুলেছিল, যে পথে মারাঠারা বিজয়ীবেশে প্রাসাদে ঢুকেছিল, এসেছিল যে পথে একদিন সাম্রাজ্য-স্বপ্ন নিয়ে ফরাসীরা, তারপর যে পথ দিয়ে মদদর্পী ইংরেজ সৈন্যবহর একদিন তার ইউনিয়ন জ্যাক উড়িয়ে, "গড সেভ্ দি কিং" ব্যাণ্ডে সুর তুলে সোজা এগিয়ে গেছল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায়, সেই পথে হাঁটতে হাঁটতে কত কত রোমাঞ্চকর অনুভূতিই না অন্তরে সাড়া জাগায়।

একবার নায়েক রাজাদের বারতলা প্রাসাদ-শিখরের দিকে তাকালাম। সেখানে আজ প্রায় অন্ধকার। কথিত হয়, ঐ শূন্য লোকে দাঁড়িয়ে তাঞ্জোররাজ বিজয়রাঘব নায়েক প্রত্যহ প্রভাত-সন্ধ্যায় ভক্তিভরে শ্রীরঙ্গমের মন্দির দর্শন করতেন। হয়তো এই সময়টিই ছিল মহারাজের সান্ধ্যকালীন শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির দর্শনের কাল।

॥ ১৫ ॥ তাঞ্জোরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা

হায়, কালধর্মে ওই রাজপ্রাসাদের শীর্ষে বাতি দেবার আজ লোকাভাব। সত্যি, মহাকালের মনোবৃত্তি অতি অদ্ভুত। ভাবতে গেলে ভয়াবহ রকমের দার্শনিকতা এসে পড়ে।

কি ভাবছিস ?

এতক্ষণে বন্ধুবর কথা কইলে। এমনিতে অচিন্ত্যচরণ কথা বলে কম। তায় মহাকালের মায়ার খেলার সে কোন ধারই ধারে না। সাতে-পাঁচে, শিল্পে-সাহিত্যে, সংস্কৃতি-সভ্যতার মার-প্যাঁচে সে ভুলেও মাথা গলায় না। এ সংসার-সমুদ্রে পাড়ি দেবার জাহাজও সে চায় না। শুধু একটা কাঠের ভেলা পেলে বেজায় খুশী। আর কিছু হোক না হোক, অন্ততঃপক্ষে তার দুবেলা দুটি মোটা আহার চাই। এতে যতক্ষণ কেউ প্রতিবন্ধক না হচ্ছে, ততক্ষণ সে সহজেই সন্তুষ্ট। তাই আমি কি ভাবছি না ভাবছি তা নিয়ে তার তো মাথা ঘামাবার কথা নয়। কাজেই একটু চিন্তিত হয়ে ফিরে চাইলাম।

রাতে খাওয়ার কথা কিছু ভেবেছিস? আমি কিন্তু ঘাস খাবার পক্ষপাতী আর নই।

ওঃ, তাই বল্! যেভাবে কথা আরম্ভ করেছিলি, ভাবনায় পড়ে গেছলাম।

মাসিমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে দুজনে আমিষ হোটেল আবিষ্কার করতে বেরিয়ে পড়লাম। পথ চলতে চলতে মনের পর্দায় মুহূর্তে মুহূর্তে কত ছবি ভেসে উঠতে লাগল।......

তখন শীতকাল। কলকাতায় পৌষের শীত। সন্ধ্যা থেকে আবছা কুয়াসায় সারা নগরী রেশমীজালে মুখ ঢেকেছে। আর বেশ একটু রাতে তার সর্বাঙ্গে কুয়াসা ভেদ করে চাঁদের আলোতে এমন এক রহস্যময় রূপের বান ডেকেছে যে, অন্তর আপনা থেকে এ রাতে

মেছুর হয়ে আসে। দুটি তরুণ প্রাণ রাত এগারোটায় হাত ধরাধরি করে মনের আনন্দে ঘরের পথে পাড়ি জমিয়েছে। বুকে তাদের ভবিষ্যতের সোনালি সম্ভাবনা। সহসা একজন অন্যকে জিজ্ঞেস করলে, কলেজের শেষ ধাপ পেরিয়ে কি তার পরিকল্পনা। উত্তরের প্রত্যাশায় না থেকে প্রশ্নকারী নিজেই বলে যায় যে, সে যাবে সাগরপারে। দুনিয়াকে দুটি চোখ মেলে দেখবে। আ:' দেশে ফিরে দেশবাসীকে উপহার দেবে সারা দুনিয়ার সেরা সেরা হীরা-চুনি-পান্না।

হঠাৎ অন্যজন বলে ওঠে, আমার কিন্তু বড় ইচ্ছে, দেশে ফিরে ব্রাহ্মণবাড়িয়াটা একবার ঘুরে আসা।

কোথায় সারা দুনিয়া, আর কোথায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া! আজ সেই দুজনেই তাঞ্জোরের পথে পাশাপাশি হাঁটছে—

শেষ পর্যন্ত হোটেল একটা আবিষ্কার করেই ফেললাম। একটা ব্রিজের পাশে এক মিলিটারী হোটেল। অন্ধকারময় বারান্দায় দুজনে এক অদ্ভুত টেবিল দখল করে বসা গেল। পাশ দিয়ে কাবেরীর শাখানদী তীব্র স্রোতে বয়ে চলেছিল। কোন কোন সময় সহসা মনে হয় এই বুঝি ঐ মুখর স্রোত পাড় ভেঙ্গে এই বারান্দাসহ আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

কিন্তু তাতেও ক্ষতি নেই। বহুকাল বাদে আজ সন্ধ্যায় বহুদূরে ফেলে আসা আজন্মের সঙ্গী আমাদের নদীমায়ের অবিরাম ডাক তো শুনছি। এই ডাকে মিশে আছে মেঘনা, মধুমতী. পদ্মা. জলঙ্গী, রূপসা, শিবসা, ইছামতী, ভৈরবের ডাক।

আহারশেষে বেরিয়ে পড়লাম। এখন আকাশে আধফালি চাঁদ। রাজপথে বিজলী বাতি আছে, তারই ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলোর ছায়া। বেশ স্বচ্ছ, অথচ বিশেষ স্পষ্ট নয়। অভিনব ব্যঞ্জনাময়।

একেই মাদ্রাজে বার মাসে সুস্পষ্ট ঋতু বলতে দুটি। এক চরম গ্রীষ্ম, আর এক স্বল্প-গ্রীষ্ম। এখন যদিও বর্ষাকাল, আকাশে মেঘের

আনাগোনা কোথায়। যেটুকু জল ইতিমধ্যেই ঝরে গেছে, তার করুণা-ধারায় কোথাও কোথাও মাটি এখনো ভিজে। কিন্তু হাওয়ায় ঠাণ্ডার লেশমাত্র নেই। এই সময় পথ হাঁটবার পক্ষে অত্যন্ত উপাদেয়। তবে তামিলনাদে রাত আটটার পরেই মধ্যরাত। পথে তাই লোকজন তেমন নেই। এমন চমৎকারিত্বে ভরা আজকার রাত। এ রাতে এরই মধ্যে যারা বিছানাকে সার করতে পেরেছে তাদের জীবনে আর যাই থাক বৈচিত্র্যের নেহাৎই অভাব।

সে অভাব আমরা পুষিয়ে নিতাম, তবে হোটেলে এক ঘরে মাসিমা একলাটি পড়ে রয়েছেন। তা ছাড়া যে শহরে সন্ধ্যে লাগতে না লাগতে লোকজনের রাত তুপুর, সেই অজানা অচেনা জায়গায় পথে পথে কাঁহাতক আর ঘোরা যায়।

এক সময় নিতান্ত অনিচ্ছায় হোটেলে ফিরেই দেখি, কে একজন লোক বাঙ্গালী-বাবুদের প্রতীক্ষায় ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

যদিও বিজলী বাতি, বালবটি যা দেওয়া হয়েছে সে একরকম কাণা মামারই মতন। বলবার জো নেই যে, বাতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু বিশেষভাবে ঠাহর করে না দেখলে নিজের হাতই ভাল করে দেখা যায় না। এমন অবস্থায় প্রতীক্ষাকারী হাতে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিলে।

কামরার দরজা খুলে বাতি জ্বেলে অচিন্ত্যকে চটপট মাসিমাকে দেখা দিয়েই এদিকে চলে আসতে বললাম। আর কাগজটির দিকে দৃষ্টি রেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম—এ যে দেখছি মৌনীবাবা! লিখে জানাচ্ছেন, তু'বছরের জন্যে তিনি মৌন অবলম্বন করেছেন। লিখিত পদ্ধতিতে আমাদের আপত্তি না থাকলে তু'চারটে কথা বলে খুশী হবেন।

আপত্তি আর কিসে! একেই রাতের আহার সেরে আসা গেছে, তায় হাতের কাছে করবারও কিছু নেই। এমন সময় মৌনীবাবার সঙ্গ পাওয়াই যে সৌভাগ্যের কথা। তা কেবল সঙ্গই নয়, মৌনীবাবা লিখে লিখে আলাপও করতে চান। এ যে দেখছি, একে তো জোয়ার, তার উপরে ভরা পাল।

সাগ্রহে মৌনীবাবাকে আসন নিতে আহ্বান জানালাম। তিনি বেশ পরিপাটি হয়ে বসলেন। অনুমান হল, সহসা নড়বার চেষ্টাটি করবেন না।

এমন সময় অচিন্ত্য ফিরে এল। অমনি মৌনীবাবা একটি চিরকুটে লিখে আমাদের তুজনের নাম জানতে চাইলেন।

চিরকুটটি অচিন্ত্যকে দেখাতেই সে বললে, পাকা ইংরেজী লেখা দেখছি। মৌনীবাবা, অচিন্ত্য একটু খাটো স্বরে কথা শেষ করে, টিকটিকি নয় তো ?

পরাধীন যুগে হলে কথাটা ভাববার ছিল বটে। কিন্তু এটা না ব্রিটিশ আমল, না আমাদের কেউ কালাবাজারের কালসাপ। কাজেই সোজা নাম তুটি বলে দিয়েই খালাস।

তারপর মৌনীবাবার সঙ্গে চমৎকার আলাপ জমে উঠল। আমরা মুখে বলি, তিনি লিখে দেন, লেখার মারফতে কত কথাই না জানতে চান। কথায় কথায় অনেক রাত হল। অচিন্ত্য তার আস্তানায় যাবার জন্যে ছটফট করছিল। তার ছটফটানি লক্ষ্য করে মৌনীবাবা চট করে লিখে ফেললেন তু'ছত্র ইংরেজী কথা।

চিরকুটটি তুজনেই পড়লাম। শেষটা সহসা একসঙ্গেই তুজনে হেসে উঠলাম।

আমাদের হাসিতে মৌনীবাবা চমকে উঠে জানতে চাইলেন, হাসবার এতে কি হল।

অচিন্ত্য ততক্ষণে উঠে পড়েছে। তাই উত্তর দেবার দায়িত্ব পড়ল আমারই ঘাড়ে। আমি আর কি করি, বললাম, মৌনীবাবা, স্বনামখ্যাত তুই ইংরেজ কবির তুটি লাইন আপনার তো লিখতে একটুও দেরি হল না। কিন্তু আমাদের অবস্থা যে সেই,

> "তুমি কোন্ গগনের ফুল,
> তুমি কোন্ আকাশের চাঁদ।"

শুনে মৌনীবাবা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ কি ভেবে খচ্ খচ্ করে কাগজে কি সব লিখতে লাগলেন। লেখা

শেষ করে কাগজটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে সহসা উঠে দাঁড়িয়ে দরজামুখো পা বাড়ালেন।

আমি তো থতমত খেয়ে গেছলাম। সে অবস্থা সামলে নিয়ে প্রায় চীৎকার করে উঠলাম, কোথায় যান।

পরমুহূর্তে মৌনীবাবা বাইরে থেকে দরজা টেনে দিলেন।

কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে চাইছিলাম। কিন্তু চিন্তার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় যেই বসতে গেলাম অমনি চোখে পড়ল,

"ফাগুন গয়ী হয়, বহুরা ফিরি আয়ী হয়্
গয়েরে যোবন, ফিরি আওত নাহি।"

পরিষ্কার দেবনাগরীতে লেখা। আমার আশ্চর্য হতে আর কিছুই বাকী ছিল না। কেবলি মনে হচ্ছিল, কি অদ্ভুত! লোকটি কি হাসির ঝলকে কেবল মনের কাটা দাগ আবিষ্কার করে ফেরে!

।। ১৬ ।। কালজয়ী বৃহদেশ্বর মন্দির

রাত্রি যায়, দিন আসে। ভোরের পাখীরা যার যার নিজের কথায় গান গায়। প্রকৃতির কবিসত্তা কয়েকটি রঙের টানে ওই গানের প্রতিদানে আকাশ রাঙিয়ে তোলে।

তামিলনাদের সাধারণ মানুষ খুবই সকালে ওঠে। অভ্যাসবশে অনেককাল থেকে এই যে তাদের অতিভোরে ওঠা, এর সঙ্গে শিল্পীমনের ছোঁয়া লাগলে তো আর কথাই ছিল না। তা হলে তার ঘরে ঘরে রঙের কারিগরের হাট মিলে যেত। চিত্রশিল্প অসাধারণত্ব অর্জন করত। কিন্তু কোথায় সে অসাধারণত্বের নিদর্শন।

তিন সকালেই উঠে পড়েছিলাম। অচিন্ত্যকেও ডেকে তোলা গেল। চটপট উঠে পড়ে মাসিমা নূতন স্বরে কথা কইলেন, চল না তোমরা, নদীতে স্নান সেরে আসা যাক।

স্নানের ঘাটে গিয়ে দেখি, ব্রাহ্মমুহূর্তে অনেকেই এসে হাজির হয়েছেন। কেউ বা জলে নেমেছেন, কেউ বা নামবেন নামবেন করছেন। স্নানার্থীদের মধ্যে সকল বয়সের নরনারী রয়েছেন। কিন্তু বঙ্গ-ললনারা আজিও বহুক্ষেত্রে খোলামেলা ঘাটে বহু পুরুষের সুমুখে স্নানে অভ্যস্ত নন। তাই মাসিমার স্নানের ব্যবস্থা নিয়ে রীতিমত বিপাকেই পড়তে হল।

অনেক খুঁজে পেতে একটি ঘেরা ঘাট মিলল। সম্ভবতঃ এটি সলজ্জ আর পর্দানশীন মহিলাদেরই জন্য। এই ঘাটে মাসিমাকে ছেড়ে আমরা খোলা জায়গায় জলে নেমে পড়লাম। তখন সবে পূব আকাশে সূর্যি-ঠাকুর চোখ মেলছেন।

দূরের পাহাড়ে জলের ঢল নেমেছে। সেখান থেকে প্রবল স্রোতে ছুটে আসবার পথে কাবেরীর এই শাখা নদীটি এখন উদ্দাম। আর কি তার রং! ঘন গৈরিকে খয়েরি আভা। ওরি বুকে মত্ততার আহ্বান।

কিন্তু সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে মেতে উঠবার মত বুকের পাটা কারো বড় একটা দেখা গেল না।

ওপার থেকে বৈদিক মন্ত্রে সূর্য-বন্দনা ভেসে আসছিল। মেয়েদের মত লম্বা চুল রাখা ব্রাহ্মণ দল সমস্বরে স্তোত্র পাঠে প্রভাতের এই পরিবেশ মুখরিত করে তুলছিলেন। কিন্তু তারপরই তাঁরা যখন শুধুমাত্র কৌপীন সম্বল করে দিনের আলোতে নির্বিবাদে তটে উঠে দাঁড়ালেন, সে দৃশ্য নাগা সন্ন্যাসী হলেই মানাত।

বহুদিন বাদে নদীর আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করে সহসা তার আলিঙ্গন ছেড়ে উঠতে মন চায় না। মাসিমা হয়তো অপেক্ষা করছেন, তা করুন না। আমরা আর কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে কাবেরীর উদ্বৃত্ত জলরাশিতে নদী-বিচ্ছেদের দীর্ঘ বিরহজ্বালা মিটিয়ে নিই।

বেশ সাঁতার কাটছিলাম। হঠাৎ চীৎকার ওঠায় সন্ত্রস্ত হয়ে ঐদিকে তাকিয়ে দেখি, তীব্র স্রোতে কে একজন ভেসে চলেছে। লোকটি উন্মাদ, না বেপরোয়া। দুটির একটি না হলে এই মরণস্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেবে কেন।

দেখতে দেখতে মাঝখান থেকে সরে এসে ক্রমে কূল ধরে সে উজান ঠেলে ফিরতে শুরু করায় যারা প্রথমে চীৎকার করে উঠেছিল তারা সকলেই শান্ত হল। আর খানিকক্ষণ বাদে কিছুটা অগ্রসর হতেই আমরা আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। এ যে দেখি, মৌনীবাবা! বাবার সাহস আছে বটে।

দক্ষ নাবিক যেমন তরী তীরে ভিড়ায়, তেমনি স্বাচ্ছন্দ্যে মৌনীবাবা আমাদের পাশটাতে জলের তলার মাটিতে পা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

আমরা কি সব বলতে গেছলাম। মৌনীবাবা সঙ্কেত করে নিষেধ করলেন। মাসিমা ততক্ষণে তটে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাই আর দেরী না করে উঠে পড়া গেল।

স্নান সেরে মাসিমা পরেছেন গরদের শাড়ী। মাথা ঢেকে কপালের প্রান্ত ছুঁয়ে তাঁর ঘোমটা থমকে আছে। হাসিমুখে সকালের আলোক এসে

মুখখানিতে পরিয়ে দিয়েছে অপূর্ব ব্যঞ্জনার রূপসজ্জা। বয়স হয়েছে। কিন্তু শরীরে যেমন লাগেনি মেদ, তেমনি প্রৌঢ় বয়সের প্রৌঢ়ত্ব যেন হার মেনে গিয়েছে। গায়ের রং গৌর। মনটিও রঙে রঙে এখন যেন ভরপূর। কিন্তু তার কোথাও বিন্দুমাত্র আতিশয্য নেই, আর নেই সামান্যতম সেই আভাস, যা ভক্তিভাবের পক্ষে বেমানান লাগে।

কঙ্কণবিহীন হাত। সিন্দূরবিহীন সিঁথি। কিন্তু জীবনের পরম পূর্ণতার ছাপ এত সুন্দরভাবে পরিস্ফুট যে মনে হয়, এ তো বর্ষা নয়, হেমন্তের শ্রী। আপনা থেকে অন্তরে পবিত্রতার স্নিগ্ধ একটি অনুভূতি জেগে ওঠে মাসিমাকে প্রভাতের আলোতে এই প্রৌঢ় পূজারিণী বেশে দেখে।

আমরা সোজা মন্দিরের পথে পা বাড়িয়েছিলাম। মাসিমা কাল থেকে উপবাস করে আছেন, মন্দিরে পূজা না দিয়ে দাঁতে কুটোটি কাটবেন না। তাই যত সকাল সকাল পারা যায় পূজো শেষ করাই সকলের মত। এজন্যে আগে থেকে জামা-কাপড় সঙ্গেই আনা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের পেছনে পেছনে মৌনীবাবাও ছুটে আসছেন। তাঁর পরনে সেই সিক্ত-বসন। সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপও নেই। যেন বোবা-বাণীতে বলতে চাইছেন, পরোয়া কিসের।

তাঞ্জোরের মন্দির বলতে একটিই। কাঞ্চীর যেমন পথে পথে মন্দির, কুম্ভকোণমে যেমন কাছে কাছে মন্দির, তাঞ্জোরে তেমনটি নয়। এখানে বৃহদেশ্বরের মন্দিরই একমেবাদ্বিতীয়ম্ এবং এই মন্দিরের স্থাপত্য দক্ষিণের বহু মন্দিরের থেকে পৃথক্।

মন্দিরের কথা পরে। প্রথমেই গোপুরম পড়ে। এ গোপুরম যেমন অতিমাত্রায় আকাশস্পর্শী নয়, তেমনি একে অনুচ্চ বলাও চলে না। গোপুরম পেরিয়ে অঙ্গন। ভারতের অনন্য বৃষ এখানে মন্দির-অঙ্গনে বসা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। পাথরে যে শিল্পী এই আশ্চর্য সুন্দর ভাস্কর্য সৃষ্টি করেছেন, তাঁর তুলনা খুঁজে মেলা ভার। আর বৃষের ব্যঞ্জনাময় অবস্থান এত চমৎকার যে পাথরে কুঁদে তোলা একখণ্ড কাব্য বলেই মনে হয়।

মহাবলীপুরমে বৃষ দেখেছি। তাঞ্জোরের বৃষ যদি সেরা ভাস্করের সৃষ্টি বলে ধরা যায়, তা হলে মহাবলীপুরমের বৃষ সেই ভাস্করের সৃষ্টি যিনি সবে শিক্ষানবিশী শুরু করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, পরে রামেশ্বরমেও বৃষ দেখেছিলাম। কিন্তু তাঞ্জোরের এই সেরা ভাস্কর্য নিদর্শনটিকে সেরা অপেক্ষা আরো অধিক কিছু বলতে পারলে তবেই যেন এর প্রতি সুবিচার করা হয়।

ভারতবর্ষ আজিও কৃষিজীবী দেশ। উনিশ শ' চুয়ান্ন সনের শেষ-দিকেও তাঞ্জোর কোন একটি ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ শিল্পের আশ্রয়স্থল বলে দাবী করতে পারে না। একালেও এখানকার কৃষির সুখ্যাতি। এবং এই কৃষির প্রথম ও প্রধান সহায়ক বৃষ। তাই তামিলনাদের এই শস্যক্ষেত্রে এত চমৎকার বৃষ ভাস্কর্যে জীবন্ত হয়ে যেন দুনিয়াকে জানিয়ে দিচ্ছে, আমি আছি তাই তাঞ্জোরের সমৃদ্ধি।

ভারতীয় সমৃদ্ধির পরিচয় হস্তীতে। কিন্তু বৃষের সঙ্গে যোগাযোগ যত-না ঐশ্বর্যের তার চেয়ে অনেক বেশী অন্নের। ঘরে যদি অন্ন থাকে, বিনা সম্পদেও বেশ শান্তিতে কাটে। সংসারে সাদামাটা অন্নের সংস্থান যখন নিত্য নবান্নে উত্তীর্ণ হয়, তার বেশী সমৃদ্ধি কে চায়। অন্তত এদেশের সাধারণ মানুষ কখনো তা চাইত না! তাই বোধ হয়, এখানকার এই বৃষ সত্যি সত্যি সমৃদ্ধির সেরা নিদর্শন।

তাঞ্জোরের বৃষটির উচ্চতা কমপক্ষে বার ফিট। লম্বায় এটি উনিশ ফিটের কম নয়। এই বৃহৎ মূর্তিটি যে প্রস্তরখণ্ড থেকে কুঁদে সৃষ্টি করা হয়েছে তার ওজন অন্ততঃ ত্রিশ টনের উপরে তো ছিলই। একক জন্তুর ভাস্কর্য-মূর্তির বহু নিদর্শনের মধ্যে কেবলমাত্র আকারের দিক দিয়ে তাঞ্জোর বৃষের সঙ্গে মহাবলীপুরমের পাণ্ডব রথের হস্তীর কিছুটা তুলনা চলতে পারে। আর তুলনা চলে মহীশুরের বৃষের। সে আকারে আরো বৃহৎ।

শিবের বাহন বৃষ। তাকে ছাড়ালে সামনেই বৃহদেশ্বরের মন্দির। এই মন্দিরের অভ্যন্তরে যে শিবলিঙ্গ পূজিত হয়ে থাকে, আসল সোমনাথের

মন্দিরে যে শিবলিঙ্গ অবস্থিত ছিল স্বচক্ষে না দেখায় বলতে পারি না, কি তার আকার ; কিন্তু বৃহদেশ্বরের মন্দিরে যে শিবশিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, এত সুবৃহৎ লিঙ্গের দর্শন ভারতবর্ষের আর কোথাও মেলে না।

গর্ভগৃহে পূজারীদল পূজারত। তাদের সাত-আটজনকে বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি। কিন্তু না জানি আর কতজন পূজারী জ্যোতির্লিঙ্গের আড়ালে পড়ে গেছেন।

মাসিমা পূজা দিতে ব্যস্ত ছিলেন। সেই অবসরে মন্দিরের আশপাশ বেশ করে দেখে নিলাম। এখানকার প্রকারম লম্বায় পাঁচশত ফিট আর চওড়ায় দু'শত পঞ্চাশ ফিট অর্থাৎ লম্বার আধাআধি।

সাধারণতঃ দক্ষিণের মন্দিরগুলি সর্বত্রই উচ্চতায় তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, যদিও গোপুরম-শিখর দেখতে গেলে ঘাড় ভেঙ্গে যায়। কিন্তু বৃহদেশ্বরের মন্দির সত্যি সুউচ্চ। এর উচ্চতা মেঝে থেকে একশ' আটষট্টি ফিট। সে যেন একটি বিরাট সৃষ্টিকাণ্ড শূন্যে মাথা তুলে নভোলোকে যুগ-যুগান্ত ধরে আদি সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে ফিরছে। মন্দিরের মাথায় শিরোভূষণরূপে যে পাথরের কলসীটি শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রত্যহ সূর্যাভিবাদন করছে, সেটি নির্মিত হয়েছে একখণ্ড গ্র্যানাইটে যার ওজন আশি টনের চেয়ে বেশী। অত ঊর্ধ্বে শূন্যপথে বৃহদেশ্বরের মন্দিরের মুকুটমণি কলসখানি কি করে যে তোলা হল, সে আধুনিক বিজ্ঞানেরও বিস্ময়।

শোনা যায়, বৃহদেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রথম রাজরাজা চোল এবং ইতিহাস বলে, তাঁর রাজত্বকাল ছিল খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। কোথায় একাদশ শতাব্দী আর কোথায় বিংশ-শতাব্দীর পঞ্চম দশক। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেছে, চোল রাজবংশ ইতিহাসের পাতায় প্রায় অবলুপ্ত হতে চলেছে। তবু বেঁচে আছে বৃহদেশ্বরের মন্দির। দেশ-বিদেশে কালে কালে আলোচনায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠতে চাইছে এ মন্দিরের যুগজয়ী ভাস্বর স্থাপত্য। আগামীকালে হয়তো একদিন এ মন্দিরের দেবমহত্ত্ব (যা এখনি কতকাংশে ক্ষীয়মাণ) শুধু

সেকালের গল্প হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু সেই অনাগত দিনেও বৃহদেশ্বরের মন্দিরের সৃষ্টিকলায় যে অলৌকিক নৈপুণ্য, তার আকর্ষণ অন্তর্হিত হবে না। মানুষের সৃজনশক্তির জয়ধ্বজা হিসাবে বৃহদেশ্বরের মন্দির-কলস আগামী বহুকাল পর্যন্ত দেশ-বিদেশের দর্শকের কাছ থেকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন লাভ করবে।

প্রকারমের এক ধারে সুব্রাহ্মনিয়ম অর্থাৎ শিবতনয় দেব-সেনাপতি কার্তিকের একটি ছোট্ট মন্দির রয়েছে, যা সহসা কারো তেমন চোখে পড়তে চায় না। কিন্তু একবারটি চোখে পড়লে আর চোখ ফেরানো যায় না—এমনি আশ্চর্য সুন্দর এই মন্দিরের কারুকার্য। স্বয়ং ফার্গুসন সায়েব এ মন্দিরকে পাথরের কারুকার্যের দিক দিয়ে একটি অমূল্য-রত্ন বলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন।

মাসিমা পূজা সেরে ফিরলেন। আমরা সোজা হোটেলে ফিরতে চাইছিলাম। কিন্তু কোথা থেকে একটি লোক এসে মাসিমাকে পাকড়াও করলে, চলুন তাঞ্জোরের বাসনপত্র দেখবেন।

মাসিমার আত্মীয়স্বজনের কথা বুঝি এতক্ষণে মনে পড়ল। হঠাৎ বোধহয় একে ওকে এটা-সেটা দেবার কথা মনে হল। আর কি হোটেলে ফেরা এত সহজ! আমরা তাঞ্জোরের বাসনপত্র খাস-শিল্পীদের বাড়ীতে দেখতে চললাম।

আগের দিনে প্রাসাদ মন্দির সমস্ত মিলে ছিল একটি প্রকাণ্ড দুর্গ। সে দুর্গপ্রাকার প্রাচীর এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। তবু এদিকে সেদিকে তার কিছু-কিছু নিদর্শন এখনো আছে। আমরা সেগুলি দেখতে দেখতে সেই মহল্লায় গিয়ে পৌঁছলাম, যেখানে ধাতুপাত্রের কারিগররা বাস করে।

॥ ১৭ ॥ তাঞ্জোরের গ্রন্থমেলা সরস্বতী-মহলে

সরু গলিপথ। দু-পাশে গায়ে গা ঠেকানো বাড়ীর পর বাড়ী। যেন কাশীর গলির ক্ষুদ্র একটি সংস্করণ। দাওয়ায় দাওয়ায় এ-ও-সে বসে। কোন ঘরের দরজায় গৃহবধূর উঁকি দেওয়া চোখ পথের 'পরে হুমড়ি দিয়ে পড়ছে। এ-ঘর ও-ঘর থেকে ধাতুপেটার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

আমরা যেখানটায় গিয়ে পৌছলাম, কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢোকা গেল। ঢুকতেই ভেতরের অর্ধনগ্ন পুরুষগুলো. একটি অপরিচিত মহিলার সামনে কেমন যেন সংকুচিত হয়ে পড়ল। আমরা যে ক্রেতার দল, আমাদের পথ-প্রদর্শক সে কথাটি সমঝে দেওয়ায় গৃহকর্তা কি করে যে সমাদর করবেন তাই যেন কিছুতেই ঠিক করে উঠতে না পেরে মুহূর্তের জন্যে থতমত খেয়ে গেলেন।

সে অবস্থা উত্তীর্ণ হতেই বসবার জন্য এদেশী মাদুর এল। গৃহকর্তা যে একফোঁটা কাঠের পিড়েখানায় বসেছিলেন সেখানি আমাদের দিকে ব্যস্ততার সঙ্গে এগিয়ে দিলেন।

ঘরের মধ্যে আলো ঢোকবার তেমন কোন ব্যবস্থা না থাকায় ঘরটি প্রায়ান্ধকার। এরি মধ্যে এক কোণে ধাতু-গালাইয়ের ব্যবস্থা, আরেক কোণে কাঁচে ময়লা-ধরা বহুকালের শো-কেসে নানা আকারের বিচিত্র কারুকার্য খচিত পাত্রাদি রাখা আছে। তারই কয়েকটি আমাদের দেখানো হল। দেখে পছন্দ না হবার কিছু ছিল না। কারণ জিনিসগুলি সত্যিই সুন্দর। কিন্তু একেই আমাদের সামনে এখনো সুদীর্ঘ চলার পথ, এতটা পথ জিনিস-গুলি বহন করা সঙ্গত হবে কিনা সে বিষয়ে মাসিমা মনঃস্থির করতে পারলেন না, তায় তাঁর কাছে এখানকার ধাতুপাত্রগুলির দাম বেশ কিছুটা বেশীই মনে হচ্ছিল। তবে কুটীর-শিল্পে প্রস্তুত নিখুঁত কারুকার্য-খচিত ধাতুপাত্রের দাম একটু বেশী না হলে কারিগর ও শিল্প-পরিচালকের পড়তায় পোষাবে কি করে।

আমাদের ইতস্ততঃ করতে দেখে গৃহকর্তা ভাবলেন, এগুলি সাধারণ কাজ, তাই বোধ হয় দামী খদ্দেরের মন উঠছে না। তিনি লোক পাঠিয়ে দিলেন তৎক্ষণাৎ তাঁর জামাইয়ের ওখান থেকে কিছু সেরা মালের ‘স্যাম্পল্’ আনবার জন্যে।

আমরা সবাই প্রমাদ গণলাম, উঠে পড়তে চাইলাম। অমনি গৃহকর্তা সেকালের বাংলা কবিতার মত ‘হায় হায়’ করে উঠলেন।

আর আমাদের পথ-প্রদর্শকটি সকাতরে অনুরোধ জানাতে লাগলেন, যেন আমরা আরেকটু অপেক্ষা করি। কি আর করা, মনের বিরুদ্ধে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ বাদেই সুন্দর সুন্দর রেকাবি এসে পৌঁছাল। তামার উপরে রূপোর কাজ করা। কাজগুলি সত্যিই মনোরম। কিন্তু দাম আর বহনের সমস্যা উভয়ই দুর্লঙ্ঘ্য। তাই আমরা সবাই চলবার জন্যে প্রস্তুত হলাম।

খরিদ্দার হাতছাড়া হয়, এ যেন গৃহকর্তার মোটেই মনঃপূত নয়। তিনি প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলেন যে, আজকাল এসব জিনিসের কদর কে আর করে। তারপরে ব্যবসা-বাণিজ্যে ভয়ানক মন্দা। মজুরি পোষাতে চায় না। তবু যদি আমরা পছন্দ করি, না হয় দাম কমিয়েই তিনি দেবেন।

অনেক করে বলা হল, আমাদের এখন নেবার উপায় নেই। কিন্তু, সেকথা কি তিনি কানে তোলেন। না তুললেই বা কি করা! আমরা তখন নেহাতই নিরুপায়।

গলি-পথে চলতে চলতে কেবলি মনে হচ্ছিল, এইসব শিল্পীর দিন বুঝি শেষ হয়ে এল। দেশ এদের এভাবে আর কতকালই বা ধরে রাখবে। কিন্তু যেদিন এরা থাকবে না, সেদিন হয়তো সবাই ভাববে, কি বস্তুই না হারালাম।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, মৌনী বাবাজী আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরছেন। সেই যে তিনি সিক্ত-সজ্জায় মন্দিরে গেছলেন, তারপর তাঁকে

যেন ভুলেই বসেছিলাম। এখন দেখছি, আমরা ভুলতে চাইলে কি হয়, তিনি আমাদের ভুলতে দিতে নারাজ!

হোটেলে পৌঁছাতে বেশ বেলা হল। এত বেলায় কি আর করা! ঘরে বসে থাকতেও ইচ্ছে করে না। তাই ভাবছিলাম। এমন সময় আবার সেই মৌনীবাবার চিরকুট—চলুন না, সরস্বতী-মহল লাইব্রেরী দেখে আসা যাক।

প্রস্তাবটি মন্দ নয়। আমি তো বেরিয়ে পড়তে পারলেই বাঁচি। অচিন্ত্যচরণ এখন রাজী হলে হয়।

অচিন্ত্যকে লাইব্রেরীর কথা বলতে সে একরকম খেঁকিয়েই উঠল, খেয়েদেয়ে কাজ নেই, কেবল ঘুরঘুর করা।

তা হলে মৌনীবাবার সঙ্গে একলাই বেরোতে হল দেখছি। ঠিক হল, সরস্বতী মহল দেখে যত শীঘ্র সম্ভব ফিরে আসব। তারপর দীর্ঘকালের ফেলে আসা বন্ধুত্ব বেশ করে ঝালিয়ে নেওয়া যাবে।

এবারে মৌনীবাবাকে নতুন বেশবাসে দেখবার মতই হয়েছে বটে। পরনে গেরুয়া ধুতি, গায়ে গেরুয়া আলখেল্লা, মাথায় একটি গেরুয়া টুপি। ঠিক যেন কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রচারক।

সরস্বতী মহল মারাঠারাজ সর্ফোজীর সৃষ্টি এক সুমহান্ কীর্তিবিশেষ। যেকালে রাজা-রাজড়া আর যাতেই মাতুন ভুলেও কখনো পুঁথিপত্তরে দন্তস্ফুট করতেন না, সেকালে রাজা সর্ফোজী কিনা গড়ে তুললেন দেশবিদেশের অমূল্য গ্রন্থরাজির এক গ্রন্থালয়।

রাজা সর্ফোজীর আমলে নামে তিনি তাঞ্জোর শাসন করলেও প্রকৃতপক্ষে তাঞ্জোরের আসল শাসনকর্তা ছিলেন ইংরেজরা। যাঁরা চীনকে অহিফেন বিষে জর্জরিত করে আর ভারতবর্ষের দেশীয় রাজাদের শরাবে আর চরম দুর্নীতিতে ডুবিয়ে দিয়ে শোষণ ও শাসনের মহান্ ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের আওতা থেকে নিজেকে সর্ফোজী কেবল মুক্তই করেননি, প্রায় অলঙ্ঘনীয় সংকটের মধ্যে থেকে নীরবে এদেশের স্থায়ী মঙ্গল চিন্তা করে গেছেন।

এই মারাঠা রাজা শৈশবে রাজপরিবারের পরিবেশে তেমন আসেননি, কারণ সর্ফোজী জন্মসূত্রে রাজপরিবারে জন্মাননি। তিনি মারাঠা রাজপরিবারে এসেছিলেন দত্তকরূপে। এভাবে হঠাৎ ঐশ্বর্যের মাঝে এসে পড়লে মানুষের কি আর মাথার ঠিক থাকে! কিন্তু সর্ফোজী ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া। পড়ে-পাওয়া রাজ-ঐশ্বর্যের স্রোতের বিলাস-ব্যসনের তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে না গিয়ে তিনি মনে মনে সোনার স্বপ্ন বুনে চলেছিলেন আমৃত্যু।

মারাঠার হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের কোনরূপ দুরাশা তিনি পোষণ করেননি, তাই বলে চিরকাল এ ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নাগপাশে বন্দী থাকবে, এমন অসম্ভব কথা তাঁর চিত্তে কখনো স্থান পায়নি। কালের যাত্রার ধ্বনি তিনি শুনেছিলেন এবং মহাকালের ক্ষমাহীন সিংহাসনের অবশ্যম্ভাবী নির্দেশ মেনে নিয়ে দেশকে শিক্ষার আলোকে নূতন শক্তির সাধনায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। আমাদের হতাশ মনের শেষ গতি যেমন সতত পেছনপানে দেশকে টানে এবং তারস্বরে চীৎকার করে বলতে চায় "সবি বেদে আছে", সেই পেছুটান সর্ফোজী কখনো চাননি। অথচ এদেশের ঐতিহ্যময় অতীতের অজস্র অবদান তিনি হেলাফেলা করতেও রাজী হননি! পূর্ব ও পশ্চিমের জ্ঞানসমুদ্র মন্থনে সর্ফোজী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে, বর্তমানকে মেনে নিয়ে ভবিষ্যতের গতিপথ নিয়ন্ত্রণে অগ্রসর হতে হবে। এ কাজে পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান এদেশকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করবে। তাই তিনি নিজেকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ভোলেননি। স্বদেশের জ্ঞানৈশ্বর্যরূপ অমূল্য সম্পদ লুকিয়ে রয়েছে যে সকল পুরাতন পুঁথিপত্তরে, তার সন্ধান ও সংগ্রহে তাঁর কখনো ক্লান্তি দেখা যায়নি। কেবল নিজেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যায় বহুদর্শী করেই সর্ফোজী থামেননি। তিনি দেশের লোকের মধ্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা পরিব্যাপ্ত করতে চেয়েছিলেন। সেই ইচ্ছার ফলস্বরূপ গড়ে তুলেছিলেন সরস্বতী-মহল। এই গ্রন্থাগারে বর্তমানে আঠারো হাজারের উপর শুধু সংস্কৃত গ্রন্থ ও পুঁথিপত্তরের সংগ্রহই রয়েছে এবং তার

আট হাজারই হচ্ছে তালপাতার পুঁথি। এ ছাড়া পাশ্চাত্যের সেরা সেরা দুর্লভ ও দুর্মূল্য গ্রন্থরাজির সংখ্যাও সরস্বতী-মহল গ্রন্থাগারে যথেষ্ট, অন্ততঃ পাঁচ সাত হাজারের কম তো নয়।

যে রাজা ধনের দিকে তাকাননি, রাজ্যের প্রতি লোভ করেননি, সেই অন্ধকার যুগে যখন সমগ্র দেশ বিদেশীর চাবুকে ও তলোয়ারের আঘাতে পুরোপুরি লাল হতে চলেছে—যে লাল, প্রভাতের রক্তসূর্যের আভা নয়, প্রাণঘাতী অন্ধকারের পূর্বাভাস, তখন সর্ফোজী একান্ত মনে নিজের চোখ দুটি জ্ঞানালোকে জ্বেলে নিয়ে দেশের এক প্রান্তে যে আলোক ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তারই দূরদর্শিতা এতদিনে সুফল প্রসব করেছে সরস্বতী-মহলে। চার পাশে দেশ-বিদেশের অপূর্ব সংগ্রহ। এরই মধ্যে থেকে তালপাতার পুঁথিগুলো যেন হাত বাড়িয়ে আমায় ডাকছিল। ওদের অব্যক্ত আনন্দ কিছুতেই যেন দূরদেশী দর্শকের সাক্ষাতে আর চাপা থাকতে চাইছিল না। আনন্দ হবে না? সারা ভারতের হাজার হাজার পুঁথি পুরাণ যেকালে বিদেশীরা লুটে পুটে নিয়ে গেছে, বর্বররা তচনচ করতে ইতস্ততঃ করেনি, দেশের লোকেরা কেহবা অবহেলায় কেহবা অজ্ঞানে জ্ঞানের রাজ্যে অনাচারের বান ডাকিয়ে ছেড়েছে, সেই ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে সর্ফোজী এই জ্ঞানের দীপগুলিকে সাদরে, বহু যত্নে অশেষ আগ্রহে সংগ্রহ না করলে এদের ভাগ্যে কি দুর্ঘটনা ঘটত কে বলতে পারে।

কেবল পুঁথি নয়, অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থের বিলুপ্তি এ দেশে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম আমলে ঘটে গেছে। যা কিছু রক্ষা পেয়েছে তার বেশীর ভাগ সাগরপারের গ্রন্থাগারগুলিতে যথাযোগ্য স্থান লাভ করেছে নিঃসন্দেহ! কিন্তু আমরা যে আমাদের সংস্কৃতির বাহন, সভ্যতার নিদর্শন সংস্কৃত সাহিত্যের অসংখ্য রত্নরাজিকে অবহেলা, অনাদর ও অজ্ঞতার আঘাতে আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ছেড়েছি এবং স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের পরেও যে এদেশ থেকে লুণ্ঠিত ও অপসারিত সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডারকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবার প্রচেষ্টায় এখনো বিমুখ, সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত

কবে শুরু হবে কে জানে! সর্ফোজী আমাদের হয়ে পথ দেখিয়ে গেছেন। পথনির্দেশক রাজমনীষীকে তাই সহস্র নমস্কার!

কতক্ষণ যে সরস্বতী-মহলে কেটে গেছে, কোন খেয়ালই ছিল না। প্রাসাদের ঘড়িতে কখন দশ, এগারো, বারোটা বেজে গেল, খেয়াল হল মৌনীবাবার চিরকুট হাতে পড়ায়। তাই তো, এবার তা হলে চলতে হয়।

চলব বললেই কি আর চলা যায়! পা চালিয়ে দিয়েছিলাম, সহসা লেখার ভাষায় মৌনীবাবা জানতে চাইলেন, দাবাখেলা জানেন কি?

বেলা বারোটা বাজে। এ সময় মৌনীবাবা আর কোন প্রশ্নই খুঁজে পেলেন না!

দাবাখেলা জানতাম না সে কথা জানিয়ে দিতেই তিনি হাতে আরেকখানি চিরকুট এগিয়ে দিলেন। তাতে লেখা, অসকার ওয়াইলডের পিকচার অফ ডোরিয়ান গ্রে পড়েছেন কি?

কি আশ্চর্য! চলতে চলতে উত্তর করলাম, হ্যাঁ। যেই না হ্যাঁ বলা, সঙ্গে সঙ্গে মৌনীবাবার চিরকুট এগিয়ে ধরা সারা। এতে অদ্ভুত এক প্রশ্ন ঃ জীবনে কোন্‌টা চান—ঐশ্বর্য-ভোগবিলাস না শান্তি?

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কোথায় তাড়াতাড়িতে হোটেলে ফিরব, তা না—মৌনীবাবা এখানেই যেন বসিয়ে দিতে চান। চারদিকে একবার ভাল করে দেখে নিলাম। ওই যে দেখা যায়, ন'তলা অস্ত্রাগার। দূরে কেন, কাছ থেকেও দেখতে দ্বিতীয় একটি বৃহদেশ্বরের মন্দিরের এক আশ্চর্য সংস্করণ—এই দেখে কি মৌনীবাবার মন এখন অন্য রকম? ঐখানে কক্ষে কক্ষে সেকালে তাঞ্জোর রাজাদের অস্ত্রশস্ত্রের যে অফুরন্ত ভাণ্ডার সুরক্ষিত থাকত, তার সাহায্যে শান্তির রাজ্যটা চারপাশে বহুদূর পর্যন্ত তুরমুজ করে ছাড়া যেত। সেই জন্যে কি মৌনীবাবার শান্তি নিয়ে এত নাড়ানাড়ি? প্রশ্নটা সঠিক বুঝতে না পেরে সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলাম, কোন্ শান্তির কথা বলছেন মৌনীবাবা!

এতক্ষণ বাদে মৌনীবাবা কাগজ পেন্সিল ধরলেন। আগের প্রশ্ন-গুলো তা হলে আমি যখন সরস্বতী-মহলে সংস্কৃত পুঁথি নিয়ে মশগুল, সেই সময় চিরকুটে তিনি আখর কেটে তৈরি করেছেন। এখন দেখছি মৌনীবাবার আলখেল্লার পকেটে আর কিছু থাক-না-থাক, কাটা কাটা কাগজ আর পেন্সিল সব সময় মজুত আছে।

—যুদ্ধ বনাম শান্তি নয়, সাংসারিক-মানসিক শান্তি।

চিরকুট পড়ে বলে উঠলাম, ও তাই বলুন! যে শান্তিই হোক, অশান্তি চাই না।

মৌনীবাবা বেশ আশ্বস্ত হলেন বলেই মনে হল। কারণ অতঃপর তিনি পথে বেরিয়ে নাকসোজা চলতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে চলা আমার বেশ কষ্টকর হয়ে উঠেছিল এত দ্রুত তিনি পা ফেলছিলেন। কিন্তু এক-জন তরুণকে হারিয়ে দিয়ে তিনি হাঁটার ব্যাপারেও জয়ী হবেন, সেটি কিছুতেই হচ্ছে না। সুতরাং দ্বিগুণ তেজে পা চালিয়ে মৌনীবাবার চলার তালে তালে তাল মেলাতে লেগে গেলাম। আস্তানায় হাজির হবার মুখে হঠাৎ মৌনীবাবা হাত এগিয়ে দিলেন। বলার প্রয়োজন নেই যে, সে হাতে ছিল আরেকখানি চিরকুট।

এবারকার প্রশ্ন আরো অদ্ভুত। কেবল প্রশ্নই নয়, সঙ্গে আরেকটু তার লেজুড়। সবটা বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়,—

আপনি কি বিয়ে করেছেন? না করে থাকেন তো এইটুকু শুভেচ্ছা জানাই, আপনার ভাবী পত্নী সুন্দরের সমজদার হোন!

উত্তরের প্রত্যাশা না করে মৌনীবাবা সেই দুপুর রোদ্দুরে হনহন করে সমানে হাঁটতে লাগলেন।

আশ্চর্য, লোকটি ছিটগ্রস্ত না বহুদর্শী!

॥ ১৮ ॥ ত্রিচীর ঐতিহাসিক পাহাড়-দুর্গে

মাদ্রাজ থেকে মন্দিরের পথে যাত্রা করেছিলাম—যাত্রী আমি একা। তাঞ্জোর থেকে ত্রিচীর 'রকফোর্টের' মন্দিরমুখো যাত্রার সময় পথের সাথী পেলাম বন্ধুবর অচিন্ত্যচরণ ও তার মাসিমাকে। পথ বেশী নয়। গাড়ীতে এসময় ভিড়ও কম, তাই বেশ ছড়িয়ে বসে ত্রিশ মাইল পথ সানন্দে এগিয়ে গেলাম।

মাঝারি লাইনের যে দক্ষিণী রেলপথ, তার অন্যতম সেরা জংশন এখন ত্রিচী। আগে এটি ছিল এস. আই. আর.-এর মূল কেন্দ্রস্থল। সুড়ঙ্গ-পথে প্লাটফরমের বাইরে এসে দেখি, সেকালের রাজবাড়ীর অঙ্গনের মত আশপাশ তকতক ঝকঝক করছে। শিয়ালদা, হাওড়া, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, নাগপুর, ওয়ার্ধা, বম্বে, ওয়ালটেয়ার, মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল—এই সব স্বনামখ্যাত টারমিনস ও জংশনের শ্রী-চেহারা সবি যেন ত্রিচীর কাছে নিষ্প্রভ।

রকফোর্ট জংশনের কাছে নয়, এখান থেকে কিছুটা দূরে। ওই অদূরেই বাজার-হাট-জনারণ্য। এদিকটাতে বসতি ফাঁকা, লোক-চলাচল নামমাত্র। জনকোলাহল শূন্য। জনপথে জনতার দর্শন দুর্লভ।

কাছেই নানান রকমের কয়েকটি হোটেল। তার মধ্যে স্পেন্সার ইংরেজ আভিজাত্যের শেষ নিদর্শন, এখন সে আভিজাত্যের দিন শেষ হয়ে আসায় শেষ দিন গুণছে। আর তারি অদূরে আধুনিক ভারতীয় বণিক সভ্যতার ধ্বজাধারী নতুন হোটেল 'অশোক-ভবন' অশোকচক্র-লাঞ্ছিত ত্রিরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়িয়ে গণতন্ত্রের জয়গানে মুখর।

যথারীতি আস্তানা নিয়ে কিছুটা বিশ্রাম সেরে অপরবেলায় রওনা হলাম রকফোর্টের মন্দিরের উদ্দেশে।

পথ চলতে চলতে ইতিহাসের চলমান দৃশ্যপট অতীতের অন্ধকার থেকে চোখের সামনে ভেসে আসে। প্রথমে নজরে পড়ে—সতেরো শ' পঁইত্রিশ সনের শেষ ভাগ। তখন ত্রিচিনোপল্লী অর্থাৎ এই ত্রিচীতে

হিন্দু রাজাদের রাজত্ব সগৌরবে চলছে। কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক গগনে মেঘের ঘনঘটা। দেশের যেখানে সেখানে মুস্লিম রাজত্ব, সামুদ্রিক বন্দরে বিদেশীর ক্রমাধিপত্য বিস্তারের নানান অপচেষ্টার বিরাম নেই। এমন সময় ত্রিচীর হিন্দু রাজা অপুত্রক অবস্থায় এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। এমনটি হলে হিন্দু পরিবারে চিরকাল যা ঘটে থাকে, এখানেও তার ব্যত্যয় হবার নয়। রাণী যেমন হলেন তাঁর মৃত স্বামীর সিংহাসনের দাবীদার, তেমনি আত্মীয়স্বজনের মধ্য থেকে সিংহাসনের আরো অনেক দাবীদার গর্জিয়ে উঠতে দেরী হল না। অবস্থা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠল। শত্রুরা হাসল। তারা এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করছিল। মিত্ররা ম্রিয়মাণ হল। তারা এমনটা যাতে না হয় সে আশা করলেও ঘটতে চলল যে তারই বিপরীত।

বিধবা রাণী ডেকে পাঠালেন কর্ণাটকের নবাব দোস্ত আলীকে—এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিন্দুরা কতবার যে খাল কেটে কুমীর এনেছে, তার হিসাব আমার জানা নেই। কিন্তু ত্রিচীর রাণী স্বামীর মৃত্যুর পর আত্মীয়-বিরোধের অবসান করতে কর্ণাটক থেকে দোস্ত আলীকে আহ্বান জানিয়ে আরেকটিবার যে সেই চরম ভুল করে বসেছিলেন, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ত্রিচী গ্রাসের এমন চমৎকার সুযোগ দোস্ত আলী কি আর ছাড়তে পারেন! তিনি সানন্দে নিজের ছেলে সফ্‌দার আলীর অধীনে একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। .ত্রিচিনোপল্লীতে সৈন্যদল যখন পৌঁছাল, দেখা গেল দলের নায়ক দোস্ত আলীর ছেলে সফ্‌দার আলী নয়, প্রকৃত নায়ক তাঁর জামাই চাঁদা সাহেব। কর্ণাটক থেকে ত্রিচী আসবার পথে গোল-মেলে হিন্দু রাজত্বের গণ্ডগোল মেটাবার নামে দুর্জয় ভাগ্যান্বেষী চাঁদা সাহেব পুরো ত্রিচী রাজ্যটাই গ্রাস করে ছাড়লেন। এখন বাকী রইল কেবল রাজধানী ত্রিচী ও তার অজেয় পাহাড়ী দুর্গ।

দুর্বারবেগে চাঁদা সাহেবের সৈন্যদল এগিয়ে আসতে আসতে যখন দুর্গতোরণের সামনে এসে দাঁড়াল, তখন কারো কারো চৈতন্য হয়ে

থাকবে। তাই চাঁদা সাহেব সহসা দুর্গে প্রবেশের অধিকার পেলেন না। রাণীও সম্ভবতঃ ভেবে থাকবেন, আর কেন—এবারে ওরা ফিরে যাক না। কিন্তু চাঁদা সাহেব এতদূর এসে কাজ হাঁসিল না করে ফিরে যাবেন সেরকম পাত্রই নন।

যেমনটি ঘটেছিল চিতোরের রাণী পদ্মিনীকে নিয়ে আলাউদ্দীনের প্রবঞ্চনা, তেমনি ত্রিচীতেও চাঁদা সাহেব পুরনো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করে প্রমাণ দিলেন, প্রবঞ্চনার পচা রক্ত আলাউদ্দীন থেকে তাঁরও শিরায় শিরায় প্রবাহিত। চিতোর আর ত্রিচীতে ইতিহাসের জঘন্য বেইমানী সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি যে জঘন্যতর, সেই হিসাবনিকাশ আজো শেষ হল না। চিতোরে আলাউদ্দীন এসেছিলেন রাণা ভীমসিংহকে সাহায্য করতে নয়, তাঁকে পরাস্ত করে তাঁর গৃহলক্ষ্মীকে করায়ত্ত করতে। কিন্তু রাজপুত বীরদের পরাস্ত করা অত সহজ ছিল না। তাই হীনতম ছলনায় আলাউদ্দীন সাহেব রাণা ভীমসিংহকে বন্দী করে চিতোর বিজয়ের পুরস্কার পেয়েছিলেন জহরব্রতের কয়েক মুঠো ছাই। আর চাঁদা সাহেব এসেছিলেন এক বিপন্না রাণীর বিপদে সাহায্যের আহ্বানে সাড়া দিতে। কিন্তু রক্তে যার ছলনার বিষাক্ত বীজাণু, সে কি কখনো পারে প্রাণ গেলেও কোন মহৎ কাজে নিজের শক্তিকে লাগাতে! যে কাজে রক্তপাত ও সৈন্যবিসর্জনের প্রয়োজন পড়ত, সেই কাজ কত অনায়াসেই না সফল হতে চলল ছলনার সাহায্যে! চাঁদা সাহেব মহত্ত্বের আহ্বানে সাড়া দেবার নামে রাণীকে বলে পাঠালেন যে, তাঁর অমিতবল সৈন্যদল রাণীসাহেবারই খিদমৎ করবে।

পরের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত। কাবেরীর বন্যার মত মুসলমান সৈন্যদল ছড়িয়ে পড়ে দেখতে দেখতে রাজধানী দখল করে ফেলল।

—নামুন। ত্রিচী শৈলের পাদদেশে ট্যাক্সি থামিয়ে ড্রাইভার দরজা খুলে ধরলে। এবার আমাদের সিঁড়ি ভেঙ্গে চড়তে হবে পাহাড়ের চূড়ায় গণেশ মন্দিরে।

পথে নেমে যেদিক চাই, দোকানপাট। দূরে পথের বাঁকে তোরণ। ওরি ওপাশে একালের গীর্জা। তাই বলে আজকার নয়, বহুদিনকার। গীর্জাকে পাশে রেখে ফোর্টের মধ্যে ঢুকেছি। ইতিহাসের পাতায় পাতায় মন নিবদ্ধ থাকায় লক্ষ্যই করিনি।

সিধে পথ একটানা চলে গেছে। দুপাশে পসরা সাজিয়ে বসে আছে রোমন্থনরত গাভীর মত একালের ব্যবসায়ীরা। অভাব কিছুরই নেই কেবল ক্রেতা ছাড়া।

সিঁড়ি ভেঙ্গে পাহাড় দুর্গে চড়ছি, মাথার উপরে ছাদ, দু'পাশে দেয়াল —আধুনিককালের কারিকুরি।

কিছুদূর চড়ে চেয়ে দেখি, একতলা-দোতলা বাড়ীর উপর দিয়ে পথ। পথ সামলে আবার একসারি বাড়ী আর তারি মাঝ দিয়ে পথ কেটে চলে গেছে মৃদু হাসি হেসে যেন স্বর্গে চড়ার সিঁড়ি।

সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে ক্রমেই নজরে আসে, দু'পাশে মণ্ডপের পর মণ্ডপ। কোনটা বা বসন্তমণ্ডপ, কোনটা শতস্তম্ভ মণ্ডপ। কোথাও এর নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান-আসর বসে আসছে যুগ-যুগান্ত ধরে, কোথাও বা ধর্মব্যাখ্যার স্থান নির্বাচিত হয়ে আছে সুদূর অতীত থেকে।

এরি মধ্যে এক জায়গায় হস্তীশালা নজরে পড়ে। আরো উপরে পথ যেখানে ঘুরে গেছে সেখানে এক পাশে দেব-দেবীর রকমারি মন্দিরে ঢোকবার দরজায় কপাট আঁটা। দেয়াল ঘেঁসে সেখানে বসে একজন ব্রাহ্মণ দর্শনার্থীদের কাছ থেকে দর্শনী কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিয়ে তবে বারেক কপাট খুলছেন। দেবতার দর্শন নিয়ন্ত্রণ যেখানে মানুষের হাতে এত দৃঢ়-সংবদ্ধ, সেখানে সাধারণ মনেও প্রশ্ন জাগে, তা হলে আসলে শক্তিমান কে? দেব না মানব!

দর্শনী অবশ্যি অতি সামান্যই এবং সেটি সরকার থেকে বেঁধে দেওয়া। তবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখতেই আমরা চাক্ষুষ দিব্যজ্ঞান লাভ করলাম। অশিক্ষিত, অজ্ঞ পাড়াগেঁয়ে ভক্তদের ঠকিয়ে ব্রাহ্মণ দিব্যি

পকেট পূরণ করছেন! মাঝে মাঝে শিক্ষিতদের দেখলেই বকধার্মিকটি সেজে তালা-আঁটা লোহার সিন্ধুকে সরকার নিয়ন্ত্রিত দর্শনী যথাযথ রাখতে ব্যস্ত হয়ে উঠছেন।

দুটি দল দর্শন সেরে ফেরবার পরে বেশ কিছু ভীড় হলে তবে তৃতীয় দলের সঙ্গে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করলাম। কত দেবদেবী যে দেখলাম, মনে হতে লাগল, সারা ভারতের দেবদেবীর সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করলে শেষে না তেত্রিশ কোটি ছাড়িয়ে অনেক বেশিতে গিয়ে দাঁড়ায়!

এখানেও শিবের বিরাট একটি লিঙ্গ পূজিত হয়। যে সুপ্রশস্ত হলটি অতিক্রম করে দ্বিতল মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়, তার নাম চিত্রমণ্ডপম্। শিব শুধু নৃত্যের দেবতাই নন, চিত্রেরও দেবতা। তাই তাঁর জন্যে চিত্র-মণ্ডপও চাই।

সমতলে দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি বৃহৎ মন্দির পরিক্রমা করে বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারা যায়নি, মন্দিরগুলির অভ্যন্তরের জটিল কুটিল কক্ষ-সমাবেশ লক্ষ্য করে। এখনো বৃহত্তর মন্দির দেখা হয়নি। সেগুলির অভ্যন্তরে নিশ্চয়ই রহস্যের অজস্র উপাদান যত্রতত্র নানা ছদ্মবেশে ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু পাহাড়ের নানাদিক ঘিরে এই যে মন্দির, এর অভ্যন্তর, সে যেন শত রহস্যের রোমাঞ্চকর আগার। দেখলেই অনুমান হয়, এককালে এগুলি আত্মরক্ষা ও অত্যাচারের বড় জবরদস্ত শিবির ছিল।

যেকালে দেবপ্রতাপের পরাক্রম ছাপিয়ে পূজারীদের অত্যাচার দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছিল, সেই কালে কত প্রাণ এখানকার অন্ধকার কারাগারে লোকচক্ষের অন্তরালে নিঃশব্দে নিঃশেষ হয়ে গেছে—কোন্ ইতিহাস তার সঠিক হিসাব রাখে!

এখানে ওখানে গুপ্ত কক্ষ। এদিকে-সেদিকে প্রবেশপথ, তার অনেকগুলি ভক্ত দর্শকদের ব্যবহারের পক্ষে নিষিদ্ধ। কোথাও একটু আলো, কোথাও বা দিবালোকেও অন্ধকার। এর কোণে কোণে কোন-না-কোন দেববিগ্রহ। মন্দির গাত্রে কোথাও বা পুরাকালের লিপি,

কালের হস্তক্ষেপে ক্রমশঃ অবলুপ্ত, কোথাও বা সেকালের মূর্তি মহাকালের স্রোতে লুপ্তাঙ্গ।

এ মন্দির অভ্যন্তর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে সুমুখে যে পথ শৈলশিখরে উঠে গেছে সেই পথের মুখে দিনের আলো এসে পড়েছে। এই পথে কয়েক পা এগোলেই কয়েকটি গুহা-গৃহ। এগুলির স্তম্ভগাত্রে পদ্ম খোদিত। কোন স্তম্ভে বা নানা প্রকৃতির মূর্তির নকসা। মেঝেতে কতকগুলি গর্ত। এখানকার লোকদের কথায়, আগের কালে বারুদ গুঁড়ো করার গর্ত এগুলি।

আমরা এখন মাটি থেকে বহু ঊর্ধ্বে। আমাদের পায়ের তলায় শহরের সর্বোচ্চ ইমারৎ। এখান থেকে দেখতে দেখায় অতি ক্ষুদ্রাকার। কেবল ইমারৎ কেন, কাক-চিল যে-আকাশে ওড়ে তাদের সেই পরিচিত আকাশ এখন আমাদের তলায়। পাহাড়ের এত ঊর্ধ্বে মানুষের রহস্যজনক কার্যকলাপ কোন্ সেকাল থেকে শুরু হয়েছে, অদ্ভুত অদ্ভুত দেবদেবীর আবাস ও অতিমানবীয় শক্তির আগার হিসাবে এ জায়গাকে কবে থেকে ব্যবহার করা হচ্ছে, সে সত্য জানতে বড় ইচ্ছে হয়। কিন্তু তার চেয়ে যা রহস্যময়, এ কি কেবল দেব-আরাধনা ও মোক্ষলাভের গৈরিক প্রত্যাশায়।

পায়ে পায়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে আরো উপরে উঠছি। মাসিমা প্রৌঢ়া হলে কি হয়, কিছুতেই হার মানছেন না। তাঁর বয়সী মহিলার পক্ষে এত উঁচু পাহাড়ে চড়া একটুখানি কথা নয়। কিন্তু যে অদম্য আকাঙ্ক্ষায় বহুকাল থেকে নর-নারী দুর্গম তীর্থপথের দুঃসাহসী যাত্রী, সেই অলৌকিক মহত্ত্বপূর্ণ দেবদর্শনের দুর্দম বাসনায় মাসিমা এগিয়ে চলতে গিয়ে কিছুতেই থামতে চাইছেন না।

কেবল মাসিমাই নয়, পল্লী রমণী বক্ষে সন্তান নিয়ে পাহাড়ে চড়ছেন। গ্রাম্য ঠাকুর্দা লাঠি ঠুকে ঠুকে শৈলশীর্ষে মহাদেবনন্দন গজানন দর্শনে চলেছেন। আগে পিছে, ডাইনে বাঁয়ে তাঁর তিনপুরুষ নাতনি-নাতি যত দল বেঁধে ছুটতে ছুটতে চলেছে। গা দিয়ে শ্রান্তির ঘাম

ঝরে পড়ছে, তবুও চলায় ক্লান্তি নেই। সবার মুখে দেবতার কাহিনী। চোখ হাসছে সাফল্যে, কপোল চিকচিক করছে সূর্যালোকে, সেও যেন সাফল্যের সানন্দ-দীপ্তি !

পাহাড়ের এক অংশের মাথায় উঠতে ঝিরঝিরে হাওয়ায় শ্রান্ত শরীরটি জুড়িয়ে গেল। এখানে বেশ কিছুটা ফাঁকা জায়গা। চমৎকার ঘুরে ফেরা যায়। আর চারপাশ কি অনিন্দ্যসুন্দর দেখায়! শহরের দিক ছেড়ে যেদিকে চাওয়া যায়, স্নিগ্ধ সবুজ-সমারোহ। সবুজের শ্যাম-সমারোহের মাঝ দিয়ে চলে গেছে সর্পিল গতিতে পর্বতনন্দিনী কাবেরী। দেখতে দেখতে চোখ ভরে ওঠে।

আমরা এখন নভোলোকে। নীচের পৃথিবীতে শহরের দিকে চোখ মেলে চেয়ে দেখি, আমাদেরই মতন রক্তমাংসের নর-নারী সব পিঁপড়ের সারি। চোখ ফিরিয়ে কাবেরীকে দেখতে আশেপাশের প্রকাণ্ড বৃক্ষ-রাজি দেখায় যেন সবুজের গালিচা একখানি।

॥১৯॥ শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণুমন্দিরে

এখনো বেশ কিছুটা উঠতে বাকী। উঠতে যাব এমন সময় দূরে চেয়ে দেখি, শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণুমন্দিরের চূড়া সবুজ বনরাজির স্বল্প ঊর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্য অভিজ্ঞতায় জানা যায়, নভোলোক থেকে যে বৃক্ষসকল বনরাজির ভ্রম সৃষ্টি করছে, সে বনের বৃক্ষ নয়—জনপদের মাঝে মাঝে লোকালয়ের পথে পথে মানুষের হাতে পোঁতা নানা রকমের গাছপালা মাত্র।

সহসা কেমন যেন মনে হয়, এ-জানাটা এমন করে এ সময় চোখ না ঠারলে কিছু ক্ষতি ছিল না।

আরো ঊর্ধ্বে গণেশ মন্দিরের অলিন্দে চড়ে গজাননকে আর কি দেখব, রূপময়ী প্রকৃতি আমার মন ভুলিয়ে দিলে। দিনের আলো আকাশ থেকে পৃথিবীর পথে নামতে নামতে মাঝখানে শূন্যে আমারি কাছটাতে ক্ষণিক থমকে দাঁড়িয়ে যেন সর্বাঙ্গের কানে কানে কূজন করে উঠল, "আমি শরতের বাণী নিয়ে এসেছি।" তারপর তরতর করে আমাকে তার স্বচ্ছ ঝর্ণাধারার অকৃপণ পরশ দিয়ে পৃথিবীর পথে নেমে যেতে লাগল। বেশী নয়, কিছু উপর থেকে হালকা হাওয়া বইতে বইতে কৌতুক-হাসি হেসে দৌড়ে গেল। বলে গেল, "তীর্থের দরজায় দাঁড়িয়ে কেন?"

তাইতো এত করে, এতটা পথ পেরিয়ে এসে, এত ঊর্ধ্বে চড়ে গণেশ মন্দিরের একধারে দাঁড়ানোতেই যেন আনন্দ। জীবনে কামনা-বাসনার কারো অন্ত নেই—আমারো এমন কোন বৈরাগ্য আসেনি যার দৌলতে হঠাৎ বলে বসতে হবে, আমি সংসারে কিছুই চাই না। কিন্তু মন যে বলে, এই যে দুনিয়াটাকে দু'চোখ মেলে দেখা, এর চেয়ে মহত্তর কি শূন্যলোকের শৈলশীর্ষের দোর-আটকানো মন্দির-অভ্যন্তরের ওই সিদ্ধিদাতা-দর্শন?

না, সিদ্ধিদাতা ছুনিয়ার বাইরে তো নন, তাই মন্দিরে ঢুকে পড়লাম। হাজার হাজার দর্শক যুগযুগান্তর ধরে যেভাবে দর্শন সেরে বেরিয়ে আসে তেমনি বেরিয়ে আসতেই মনে হল, পুণ্য কি মন্দিরের অন্ধকারে, না বাইরের এই আশ্চর্য আলোক-স্নাত পৃথিবীর মুখ-দর্শনে ?

ছুর্লভ দর্শন-চিন্তায় কোন্ রাজ্যে ভেসে চলেছিলাম, সহসা চমকে উঠলাম অচিন্ত্যের ত্রস্ত-কণ্ঠস্বরে—

এতক্ষণে হুঁশ হল, আরেকটু হলে আর রক্ষে ছিল না। অন্যমনস্কতার মাশুল দিতে থেঁতলে গুঁড়ো হয়ে যেতে হত! ভাগ্যিস অচিন্ত্য সামলে দিলে।

অতঃপর বেশ দেখে-শুনে পা সামলে গণেশ মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলাম। সামনে খোলা জায়গায় বসে কে একজন নিবিষ্ট চিত্তে ছবি আঁকছে। মাথার উপরে থাকায় কেবল "ইজেল" নয়, লোকটাকেও কিছু কিছু দেখা যায়। চোখে কম দেখছি, না দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে। এ ছুটির কোন্‌টি সত্যি, তাই ঝালিয়ে দেখতে দ্রুতপায়ে নেমে গিয়ে কাছে যেতেই দেখি, সত্যিই যে তাঞ্জোরের সেই মৌনীবাবা! তন্ময় হয়ে মন্দিরের ছবি আঁকছেন, কোনদিকে কোন হুঁশ নেই। আমরা যে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি তাও টের পাননি। টের পেলেন মাসিমার বিস্ময়স্বরে, 'দেখছ, কেমন রং লেগেছে আলো করে'!

মৌনীবাবা ফিরে চাইলেন। আস্তে আস্তে ছবি আঁকার সাজ-সরঞ্জাম গুটিয়ে নিলেন। তারপর একটু হাসলেন। ভাবখানা যেন, কেমন আমাকে ফেলে কতদূরে গেলেন!

মুক্ত আলোয় ঝলমলে সিঁড়িগুলো পেরিয়ে এসে অন্ধকার পথে প্রবেশ করে ক্রমে যেন জীবন্ত সমাধিক্ষেত্রের তলায় নামতে লাগলাম। এই পথেই উঠে এসেছিলাম। তখন অন্ধকার এত গভীর ছিল না, এখন যতটা। কিন্তু তখনকার চেয়ে যাত্রী চলাচল এখন অনেক বেশী। আর এরি মধ্যে দেখি সিঁড়ির মোড়ে মোড়ে পূজাসামগ্রী

নিয়ে ব্রাহ্মণদল হাজির। কোথাও-বা কোন কোন ব্রাহ্মণ অদ্ভুত-দর্শন কোন-না-কোন দেবতার বংশানুক্রমিক পূজারিত্বের দাবীদার রূপে যাঁর যাঁর আসনে এখন বহাল হয়ে বসেছেন। বহুকালের পাহাড়দেহ কালের করাল রূপ নিশ্চিন্ত নয়নে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেই চলেছে, এখনো যেন তার নয়ন দুটি ক্লান্ত হয়নি। তেমনি তার প্রকাণ্ড শরীর একটুও যেন নড়েনি-চড়েনি। যেন আ৷ স্তিকালের আদি পিতামহ, অনাদিকাল থেকে কালের যাত্রা দাঁড়িয়ে দেখছেন আর মহাকালকে মাঝে মাঝে অঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছেন।

নীচের দিকে সিঁড়িতে সিঁড়িতে বৈকালিক দোকানপাটের মেলা বসেছে। আর মেলা ভিখিরীদের। তাদের তারস্বরে ভিক্ষা চাওয়ার সুর ছাপিয়ে হঠাৎ কড়া ঢোলের বোল কানে আসতেই সবাই উৎকর্ণ হয়ে উঠল। পরমুহূর্তে বসন্তমণ্ডপে হুড়মুড় করে পালে পালে লোক ঢুকতে লাগল। কি জানি কি ব্যাপার! কৌতূহল চরিতার্থ করতে আমরাও বসন্তমণ্ডপের ভেতরে গিয়ে হাজির হলাম। দেখতে দেখতে দেখতে ভীড় আমাদের মিশিয়ে নিল।

ভীড়ের ভেতর থেকে চোখ গলিয়ে কিছুই তেমন দেখতে পেলাম না, একমাত্র একটি সুসজ্জিত বেদী আর মানুষের গা ঠেসে দাঁড়ানো মানুষ ছাড়া। আর একটু নজরের কসরৎ করে দরজার দিকে চোখ ফেরাতে দেখি, পিল পিল করে লোকজন আসছে তো আসছেই। নর-নারী, যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, সকল বয়সের, নানান রুচি ও নানা বৃত্তির এক বিচিত্র জনস্রোত বসন্তমণ্ডপের ভেতরে এসে যেন গায়ে গায়ে ঠেসে মিশে যাচ্ছে।

সহসা কে একজন সকলকে বসে পড়তে বললেন। পরমুহূর্তে সেই কড়া ঢাক আর তার সঙ্গে নাদেশ্বরম্ নিনাদ করতে করতে মণ্ডপে প্রবেশ করলে।

এটি শৈবদের মন্দির। শিব স্বয়ং তালবেতালের গুরু। তাঁর সঙ্গীত-সাগরে সুরতরঙ্গের রকম-সকম বোঝা ভার। কখনো-বা

ব্যোমভোলা চান বেদম বোল, কখনো-বা ভূতনাথ চেয়ে বসেন তাথৈ-তাথৈ তালের তীব্র রোল। আবার যখন তিনি শান্তশিব, সত্যম্, সুন্দরম্—তখন তাঁর সুরই আলাদা।

এইমাত্র সুরের তাণ্ডব থামল। যে যার জায়গায় বসে পড়ল। সভাস্থল নিশ্চুপ নির্বাক। কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই। একটি বাচ্চাও কাঁদছে না, যেন এক্ষুনি এমন কিছু মহত্তর কাজ শুরু হবে যাতে তথাকথিত শব্দের আওয়াজমাত্রেই বিঘ্ন উপস্থিত হতে পারে।

এখন একটু ঘাড় উঁচু করে তাকালে ঘাড়টা এদিক-ওদিক ফিরিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে গোটা মণ্ডপটা দেখা যায়। চারপাশে গিজগিজ করছে লোক। মাঝখানে সুসজ্জিত মঞ্চ, এখনো শূন্য। মঞ্চের সুমুখ থেকে প্রবেশদরজা পর্যন্ত কিছুটা জায়গা করিডোরের মত করে ঘিরে নেওয়া হয়েছে। সেই ঘরের মধ্যে বাদকদল, বেশীরভাগ মস্তকের সামনেটা মুণ্ডিত, পেছনে নারীর মত কেশভার।

এবারে দক্ষিণী সজ্জায় সুসজ্জিত নিকষ-কালো পাথরের মত যাঁকে মঞ্চে বসতে অনুরোধ জানানো হল, তিনি আজকার প্রধান অতিথি। মঞ্চে আসন নিতে-না-নিতে তাঁর গলে ফুলের মালার পর মালা আর হাতে তোড়ার পর তোড়া বর্ষিত হতে লাগল। আমরা চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম।

আশেপাশে দুই-একজনকে খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, প্রধান অতিথি এদেশের একজন প্রখ্যাত গায়ক। একটু বাদেই তাঁর গায়কীর বিন্যাস শুরু হবে। সুরের আগুনে এ বসন্তমণ্ডপে ঋতুরাজের ফুলবাসর জেগে উঠবে।

তেমন অবস্থায় আমাদের মাঝখান থেকে উঠে যাওয়া কি ঠিক হবে? অচিন্ত্য, মাসিমার মনে কেমন দ্বিধার ভাব।

অচিন্ত্যর মত, চটপট বেরিয়ে পড়া। আমার কথা আর বলার নয়, মনের ভাব মনে চেপে যখন উঠে পড়লাম সেই মুহূর্তে আবার কড়া ঢোলের মিষ্টি বোল শুরু হল।

অবশিষ্ট সিঁড়িগুলি পেরিয়ে পথে নেমে এসে দেখি, আসন্ন দিনান্তিকা। এখন কোথায় যাওয়া ? দাঁড়িয়ে দঁড়িয়ে সেই কথাই ভাবছিলাম। অকস্মাৎ মৌনীবাবার আবির্ভাব। স্মিতহাস্যে ফের এগিয়ে দিলেন পুরনো পরিচিত সেই আলাপের মাধ্যম—চিরকুট।

ছোট্ট কাগজটুকু হাতে নিয়ে পড়লাম। তাতে লেখা রয়েছে, কখন দেখা করা সম্ভব।

'যখন ইচ্ছে', বলে ফেলতেই মাসিমা বললেন, চল না সবাই মিলে শ্রীরঙ্গম দর্শন সেরে আসা যাক। মৌনীবাবা আভাসে আপত্তি জানালেন। কিন্তু তাতে আমাদের নতুন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়া তো দূরে থাক, এক চলতি গাড়ী ডেকে অচিন্ত্যচরণ যখন উঠতে বললে, তখন তিন তাড়ায় মৌনীবাবাকে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতেও ভুলে গেলাম।

ত্রিচী থেকে শ্রীরঙ্গম সামান্য মাইল চারেক পথ। এই পথটুকু পেরোতে যতক্ষণ সময় লাগল, তার সমস্তটাই মনে আমার অনুশোচনার অন্ত ছিল না। কেন যে অমন করে মৌনীবাবাকে প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব হল না সে কথা যতই ভাবছিলাম ততই কেমন এক অদ্ভুত বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিল। বারবারই মনে হচ্ছিল, এতটা অভদ্র ব্যবহার কেমন করে সম্ভব হল।

কিন্তু সে সম্ভব না হলে, হয়তো শ্রীরঙ্গমে মানুষের জীবন-রহস্যের আরেক মাধুর্যের যে পরিচয় সেদিন ভরসন্ধ্যায় পেয়েছিলাম, সে দৈবে-পাওয়া সম্পদ জীবনে কখনো পেতাম কিনা আর, সন্দেহ।

গাড়ী থেকে নেমে বিষ্ণুমন্দিরের দিকে পায়ে হেঁটে চলতে শুরু করলাম। প্রকাণ্ড প্রাচীর-তোরণ পেরোলে পর সোজা পথ মন্দিরের সামনে পর্যন্ত চলে গেছে। পথের দুপাশে সারি সারি একটানা দোকান। সেখানে নেই এমন কোন জিনিসের প্রয়োজন এদিকে সচরাচর চোখে পড়ে না। সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় থেকে শুরু করে পূজার আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম, সকলি যুগ যুগ ধরে আগলে যারা পুরুষানুক্রমে বসে আছে, তাদের জীবন বৃহত্তর পৃথিবী থেকে কয়েক হাত দোকানের এককোণে এসে ঠেকেছে।

দুনিয়ার আর কোন খোঁজ-খবরই এরা রাখতে চায় না, একমাত্র পশরার প্রাত্যহিক দরদাম ওঠানামার খোঁজটুকু ছাড়া। এদের দেখলে শ্যাওলা আঁটা সেকালের দীঘিগুলির কথা মনে পড়ে। এককালে কতই না অপূর্ব ছিল! কালে কালে শৈবালাচ্ছন্ন হয়ে এখন পচা পাঁক আর রোগের বিলাসক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল। এখানে শেষ হলেও ভাল ছিল। কিন্তু শেষ হওয়া দূরে থাক, সারা দেশকে না মজিয়ে এরা যে কখনো স্বেচ্ছায় আলমারির মত এক-একটি কুঠরী ছেড়ে বাইরের আলোকে বেরিয়ে আসবে, বৃহত্তর বিশ্বের পানে চোখ মেলে তাকাবে, তেমন সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

সামনে থেকে দেখতে শ্রীরঙ্গম মন্দির তেমন কিছুই নয়। কিন্তু পুরো মন্দির ভালভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে গেলে যেমন দিনের পর দিন যায়, তেমনি মন্দিরের একের পর এক অংশগুলি তার বিপুল সৌন্দর্য ও বিরাটত্ব নিয়ে দর্শকের চোখে ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করে। এ মন্দিরে ঘুরে ফিরে দেখতে দেখতে মনে হয়, এ তো একদিনের, এক বছরের বা এক যুগের সৃষ্টি নয়! যুগ যুগ ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের সৃষ্টি পুষ্টি বৃদ্ধি। চলতে চলতে হঠাৎ কোনকালে কখন যে থমকে দাঁড়িয়েছে তার সন্ধান নিতে গেলে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে হয়। গবেষণা ব্যতীত এ মন্দিরের আদি থেকে আজ পর্যন্তকার ইতিহাস আবিষ্কার অসম্ভব।

আসন্ন সন্ধ্যা। চারিদিকে মন্দিরের মণ্ডপে মণ্ডপে সন্ধ্যাদীপ জোনাকির মত পাথর-খিলানের তলে তলে জ্বলছে। দিকে দিকে ফুলওয়ালা ফুলবালা জুঁই-মালতীর মালা নিয়ে ভক্তদের পিছে পিছে ঘুরছে। কোথাও বা দেওয়ালের ধারে থামে থামে পাথরের প্রাণবন্ত রোষদৃপ্ত যুগ্ম-অশ্ব ঊর্ধ্বাকাশে পদযুগল ছুঁড়ছে। আর অগণিত ভক্ত ও দর্শকে মন্দিরের প্রাকার এখন গমগম।

মাসিমাকে পাকড়াও করেছে এক পুরোহিত। সেই আমাদের গাইড। কোথা দিয়ে কোথায় যে নিয়ে চলেছে, কিছুই বোঝবার জো নেই। অন্ধকার পথে মন্দির অভ্যন্তরে দীপালোকের স্তিমিত আলোকে চলতে চলতে হঠাৎ

এখানে সেখানে দাঁড় করিয়ে দিতেই নানান কল্পনার বিচিত্র দেব-দেবী মূর্তি সব চোখে পড়ছে। তাঁদের প্রত্যেকের দেহ ফুলের মালায় প্রায় ঢেকে গেছে। এত ফুলও এদেশে আছে!

শ্রীরঙ্গনাথের ভোগমূর্তি দর্শন সেরে কোন্ পথে যে কোথায় বেরিয়ে এলাম, চিনবার সাধ্য ছিল না। পুরোহিত আবার আরেকমুখো পা চালিয়ে দিতে দিতে বললে ভাঙ্গা হিন্দী আর বাংলা মিশিয়ে যে, মাইজী, গানা শুনেগা তো চলিয়েগা—এই রকম একটা কিছু।

তার পেছনে ছুটতে ছুটতে কিছুটা যেতেই কানে এল চমৎকার কীর্ত্তনের সুর। সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে ঐ সুর কানের মধ্য দিয়ে অন্তরে প্রবেশ করে অকথিত আনন্দের স্রোত বইয়ে দিলে।

আশেপাশে শুধু কালো মাথা। মাথার উপরে শরতের আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদের হাসি। ওরি তলায় মন্দিরার মিষ্টি আওয়াজ ছাপিয়ে কে সুমিষ্ট সুরে গাইছে—

রাম! রাঘব! রাম! রাঘব!
রাম! রাঘব! রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব!
কৃষ্ণ! কেশব! পাহি মাং॥

মাত্র এইটুকু কথা। কিন্তু সবার প্রাণে কি অসাধারণ আবেগই না সঞ্চার করে তুলেছে।

চাঁদের আলোতে যে গাইছে তার মুখখানি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সে মুখে অপূর্ব এক ভাবব্যঞ্জনা। মুখখানি এমনিতে ভারী। তার উপর গাঢ় চন্দনে রসকলি। কপালের উপরেই মাথায় কাপড় যে। সেই দেখে অচিন্ত্য এক-রকম ফিস্ ফিস্ করে বললে, বৈষ্ণবী বাঙ্গালী নয় তো?

ততক্ষণে গায়িকা নতুন পদ ধরেছেন—

'সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনু রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নতুন হোয়॥

অচিন্ত্য এবারে আমায় একটু জোরেই ধাক্কা দিলে। আমি অনেকটা সচেতন হয়ে উঠলাম। অমনি ও শঙ্কিতস্বরে বললে, মাসিমা, মাসিমা কইরে!

তাইতো কোথায় মাসিমা! এই তো কাছে এখানেই ছিলেন। আমাদের পাশাপাশি চলছিলেন। এরি মধ্যে কোথায় গেলেন?

পুরোহিত, পুরোহিত কোথায়। তারও পাত্তা দেখছিনা যে। অবস্থা এমন হল—অমন চমৎকার পদাবলী পড়ে রইল। আমরা তুই বন্ধুতে মাসিমাকে খুঁজতে লাগলাম। আশঙ্কার কেমন এক আবছায়া তুজনকেই ঘিরে ধরেছিল। নিজেদের অজ্ঞাতে কখন যে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম, হুঁশ ছিল না। হুঁশ হল পুরোহিতের ডাকে।

চট করে অচিন্ত্য তাকে ধরে ফেলতে গেছল, কি ভেবে নিজেকে সামলে নিল। লোকটা প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেলেও পরমুহূর্তেই অদ্ভুত কণ্ঠে বললে, মাইজী বোলাতা হ্যায়।

তখন আর আমাদের শুদ্ধ-অশুদ্ধ হিন্দীর বাছবিচার নেই। কেবল মাসিমাকে খুঁজে পেলে হয়! তাই হন হন করে আগে আগে তুজনেই ছুটতে লাগলাম।

কিছুদূর যেতেই পেছন ফিরে দেখি, পুরোহিত অন্যদিকে যাবার জন্যে ইসারায় ডাকছে। মনে নিদারুণ অস্বস্তি নিয়ে ওর কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম, মাসিমা কোথায়।

কণ্ঠস্বর তার কর্ণে সুধাবর্ষণ না করায় সে তার পথে পা বাড়িয়ে দিলে। অগত্যা তাকে অনুসরণ করতে করতে আমরা ঘুরেফিরে এক বাঁধানো পুকুরঘাটে পা দিতেই দেখি, কেবল মাসিমা নয়, আরো কে একজন জলের কিনারে বসে নিশ্চিন্তে আলাপ জুড়ে দিয়েছে।

আমরাও নিশ্চিন্ত হয়ে কাছে এগিয়ে যেতেই মাসিমা বলে উঠলেন, কে জান অচিন্ত্য, আমার গুরুভাই বিসখা।

সেই রসকলিরঞ্জিত ভারিক্কি মুখখানি আমাদের পানে ফেরাতেই কি জানি আমার মুখ দিয়ে নিদারুণ বিস্ময়ে যে কথাটি বেরিয়ে পড়ছিল,

আচমকা তার গতিরোধ করে ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, চিনতে পার কান্তি, সুকুমারের দিদিকে মনে পড়ে না ?

পড়ে না আবার ! কিন্তু সুকুমারের দিদি, তিনি তো বিসখা নন, তাঁর অন্য নাম। তাই অভাবনীয়তার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক বিমূঢ়তায় বাক্‌হারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মাসিমা বললেন, বিসখার বুঝি চেনা ? কই আমায় বললে না তো ?

—বলবার সুযোগ পেলে তো। তুমি দিদি ভাগ্যিস ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসেছিলে, নইলে এ জীবনে এর সঙ্গে আর বোধ হয়, এভাবে কেন, কোনক্রমেই দেখা হবার সম্ভাবনা ছিল না। কি রে কান্তি, দিদির না হয় এখন ঘর নেই, তাই বলে কি একটু বসবিওনে !

আমি তো অবাক হয়ে রইলাম চেয়ে। কিন্তু এর পরও না বসে কি উপায় ছিল !

চাঁদের আলোতে সন্ধ্যাকাশের তলে পুকুরঘাটের বাঁধানো শানের উপরে বসে পড়লেও আমি তখন আর সেখানে ছিলাম না। সঙ্কীর্ণ ঘাট। এখানকার নাম চন্দ্রকুণ্ড। কোন্ কালে মন্দিরের কোন্ বিশেষ প্রয়োজনে যে ঘাট পাথরে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই ঘাটের সিঁড়িতে বসতেই ফের মাসিমার আলাপ হাসিমশকরায় এগিয়ে চলল। মাঝে মাঝে মাসিমার গুরুভাইয়ের চন্দনলেপন রসকলির সুবাস নিয়ে বড় ভারী ভারী নিঃশ্বাস গায়ে এসে লাগছিল। অমনি অনেকদিন আগের আমি, বাল্যবন্ধু সুকুমারের সঙ্গে পূজোর ছুটীতে নৌকোয় করে পদ্মবিলের খাল বেয়ে কলমিশাকের মাঝ দিয়ে নতুন দেশের নতুন গাঁয়ে ভেসে চলেছিলাম।

সন্ধ্যা নাগাদ আমরা গোঁসাই ঘাটে নেমে পড়লাম। ঘাটের পাড় থেকে রায়বাড়ী একরকম দেখা যায়। এই রায়বাড়ীই সুকুমারের মামার বাড়ী।

মামা বলতে সংসারে তার কেউ নেই। ছোটবেলায় ছিল, বারবছর হতে-না-হতে ভাগ্যবান সে চলে গেল। রইল পড়ে প্রৌঢ় পিতামাতা। সুকুমার তাই দাদু-দিদিমার বড্ড আদরের।

কিন্তু এসব খবরের সঙ্গে খুব বেশী যোগ বড় একটা সে-ঘটনার নেই, যার অন্দরমহলে আমার মনের হীরে-মুক্তো-পান্নারা এখন কেউ হাসছে, একটু বাদেই কেউ কাঁদছে, আবার হয়তো হাসিকান্নায় ফুলে উঠবে বলে চঞ্চল হয়ে উঠছে।

বয়ঃসন্ধিক্ষণ। রায়বাড়ীর বড় আপন ও আদরের জন আমরা দুটি বন্ধু। খাই দাই, ঘুরে বেড়াই। পাড়া বেড়িয়ে এ্যাডভেঞ্চারে মাততে ভালবাসি।

সেদিন খাঁ-দের জামবাগান ছাড়িয়ে আরো এগিয়ে গেছি। চলতে চলতে পল্লীর যে প্রান্তে অনেকগুলো পোড়োবাড়ী অনেককাল থেকে পড়ে আছে, ইটে নোনা ধরে গেছে, দেওয়ালে হাঁ-করা ফাটল, পাড়ার লোকের ধারণা—ওখানে ভূতপ্রেত ছাড়া কিছুই বাস করে না, সেখানে গিয়ে হাজির।

চকমেলানো মহলের পর মহল। আজ শূন্য পরিত্যক্ত।

গা ছমছম করে। বুঝি বা চট করে কখন বুকটা কেঁপে ওঠে। চক পেরোতে সুকুমার সাবধান করে দেয়, দেখে চলিস, সাপ আছে।

চক পেরিয়ে পরের চকটাতে পড়তেই, উঠোনের একপাশে পরিষ্কার একটি পথ পেছনের দিকে চলে গেছে। ঐ পথের বুক থেকে আরেকটি পথ গিয়ে দালানের সিঁড়িতে ঠেকেছে। ওই দিকে চোখ পড়তে সুকুমার চীৎকার করে উঠল, মানুষ আছে রে!

মানুষ থাক আর না থাক, আমার চোখ তখন এই পরিষ্কার পথের শেষ খুঁজতে চাইছে। লঘু দ্রুতগতিতে আমি এগিয়ে চলেছি। কিন্তু সুকুমার·········

পেছনে ফিরে দেখি, সে, যে-পথটি দালানের সিঁড়িতে ঢুকেছে সেই পথের শেষে থমকে দাঁড়িয়ে। আর তার সুমুখে কপাটে ভর দিয়ে ঈষৎ হেলে এক রমণী।

সেখানে আর কোথাও কেউ নেই। সুস্পষ্ট কানে এল, 'ওকে

ডাকো।' সুকুমার ডাকবার আগেই আমি ফিরলাম। রমণী অদ্ভুত হেসে বললেন, 'এসো, দাঁড়িয়ে রইলে যে।'

যন্ত্রচালিতের মত সুকুমারের পিছে পিছে দাওয়ায় উঠলাম। যে কপাটে ভর দিয়ে রমণী দাঁড়িয়েছিলেন তারই ভেতরে একটি লম্বাপানা ঘর। আগে হয়তো যাতায়াতের জন্যে ব্যবহৃত হত, এখন দুদিকের দেওয়াল-দরজা ইট গেঁথে বন্ধ করে দিয়ে বসবার ঘর করা হয়েছে।

ওদিকে রমণী একটি সেকেলে চেয়ারে বসে আমাদের দেখছিলেন। কৌতূহলবশে বারেক চোখ তুলে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েই তৎক্ষণাৎ চোখ নামিয়ে নিলাম। কেমন যেন মনে হল, অমন করে দেখতে নেই। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি তখনো অপসারিত হয়নি অনুমান করতে পারায় অন্তরে আশ্চর্য এক আবেশ ছড়িয়ে পড়ছিল। কী চমৎকার ভরা-ভরা চোখের সেই পলকহারা চাহনি!

কতক্ষণ এভাবে যে কাটল সে ঘড়ির কাঁটাই জানে। আচম্বিতে এক সময় রমণী জানতে চাইলেন, তোমরা কি গোঁসাই বাড়ীর ছেলে?

অনেক চেষ্টায় খুব মিষ্টি করে চমৎকার ভাবে জবাব দিতে গিয়ে রীতিমত থতমত খেয়ে গেলাম। কেবল গলা দিয়ে একটি শব্দই বেরোল, 'না'······সেও কেঁপে।

তবে তোমরা কোন বাড়ীর?

সুকুমার কিছু বলবার আগে আমিই বলতে চাইলাম।

আমরা অন্য জায়গার······

তবে তো ভালই। তোমরা থাকবে এখানে? কেমন নির্জনপুরী! একলাটি এমন জায়গায় থাকলে কদিনেই কুঁড়িয়ে বুড়িয়ে যাব! আপন মনেই বলে যান তিনি।

ক্ষণপরে।······রমণীর রমণীয় মুখখানি স্মিতহাসিতে সহসা আশ্চর্য সুন্দর দেখালো। কিন্তু চোখ তুলে বেশীক্ষণ তাকাতে তখনো সাহস হচ্ছিল না।

সুকুমার সেই কখন থেকে বোবা হয়ে আছে। এতক্ষণে সে মুখ খুলে বললে, দাদু আমাদের থাকতে দেবেন না।

সে আবার কে ?

রায়বাড়ীর হারুবাবু।

কই কখনো নাম তো শুনিনি ?

সুকুমারের মুখখানি এতটুকু হয়ে গেল। তার দাদুকে চিনত না এমন লোক সোনারঙে ছিলই না বললে হয়। এমন লোককে চিনি না বলাটা একেই কেমন আশ্চর্যের। তার উপরে কখনো নাম না-শোনার কথাটা ওভাবে কারো মুখ থেকে এ গ্রামের কারো পক্ষে প্রকাশ করা কেমন যেন অদ্ভুত। তাই সুকুমার তো সুকুমার, আমিও অবাক্ হয়ে গেছলাম।

আমাদের তুজনের মুখে মনের ভাব ফুটে উঠে থাকবে। তাই পাঠ করে রমণী নিজেকে যেন সংশোধন করতে চাইলেন, কাউকে তেমন জানি না। সবে সেদিন এলাম কি না।

তখন আমাদের মুখে একরকম জয়ীর ভাব। তারপর যখন সেখান থেকে উঠে এলাম তখন আর কোন ক্ষোভই মনে ছিল না। তিনি যে আদর করে রোজ তুপুরে তাঁর ওখানে বেড়াতে যেতে বারবার বলে দিয়েছিলেন।

* * *

মাসিমা সমানে কথা বলে চলেছেন। মাথার উপরে চাঁদ চন্দ্রকুণ্ডে টলমল করছে। মাঝে মাঝে মাসিমার গুরুভাইও কি সব বলছেন। ওপাশে অচিন্ত্যচরণ পুরুতের সঙ্গে হয়তো মন্দির-মাহাত্ম্য নিয়ে মশগুল। কোন মণ্ডপ থেকে ভেসে আসছে 'হিন্দোল' সুর।

আর আমি। সুকুমারের কথায় ডুবে গেছি। সেবার পূজোর ছুটির দিন কটায় রোজ সকালে উঠে ছটফট, কখন তুপুর হয়। আর সন্ধ্যার আগে কিছুতেই ঘরে ফেরা নয়। কিন্তু কি আশ্চর্য, প্রথম সাক্ষাতের পর তুটো দিন যেতে-না-যেতে চকমেলানো পরিত্যক্ত বাড়ীর মেরামতি কুঠরীর যে-রমণী আমাদের তু'জনেরই দিদি রূপে ধ্যানের ধন স্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন, এমন কি যিনি সানন্দে সেধে বলেছিলেন, তোরা

যদি রোজ দুপুরটায় না আসিস, পরের দিন এসে দেখবি তোদের স্বরুচিদি মরেছে ; তিনি কতদিন যাবার পরেও একটিবারও আসন্ন সন্ধ্যার পর আমাদের কিছুতেই সেখানে বসতে দিতেন না। বলতেন, চারপাশে পোড়োবাড়ীতে সাপের আড্ডা, তোরা অন্ধকারের আগেই চলে যা লক্ষ্মীভাই।

স্বকুমার স্বরুচিদির এত নেওটা হয়ে উঠেছিল যে, কিছুতেই সন্ধ্যে না হলে নড়তে চাইত না। আমার নড়বার তেমন ইচ্ছে না থাকলেও সাপের ভয়টা বিলক্ষণ ছিল। তাই অনেক সময় আমিই ওকে টেনে তুলে নিয়ে আসতাম। তাতেই ওর কত গজগজ।

স্মৃতি বড় নির্বোধ। একবার উৎসমুখ থেকে মুক্তি পেলেই স্থূল-অস্থূল কোন অনুভূতিকেই পৃথক করা তো দূরে থাক, দুইয়ের পার্থক্যটুকুও আলাদা করে দেখবার স্বযোগ দিতে নারাজ।

নির্বোধ হলেও স্মৃতি বড় মধুর। জীবনের হাসিকান্নার টানাপোড়েনে, রসকষের সংমিশ্রণে গড়া সে। তাই বুঝি আজ সন্ধ্যায় মনে পড়ে সেবার সোনারঙের শেষ সন্ধ্যার কথা। এমন করে মনে পড়ছে যেন এই সেদিনেরই ঘটনা। অথচ সে তো কম দিন আগেকার নয়।

ছুটি শেষ হয়ে এলো। আমার প্রাণটা কেমন যেন করছিল। স্বকুমার কেমন করে কবে থেকে যে পালিয়ে দূরে সরে গেল ! মধ্যে দুই-একবার সে যেন দয়া করেই সঙ্গে নিয়ে স্বরুচিদির ওখানে গেল। অভিমানের স্বতীব্র সংস্কারে সেখানে গিয়েও আমি কখনো যেন সে পরিবেশে ছিলাম না। তাই যখন শেষবেলায় সেদিন স্বকুমার ছুটতে ছুটতে এসে বললে, স্বরুচিদি তোকে ডেকেছেন, তখন সকল অভিমান আমার বরফের মত গলে নতুন অনুরাগের অনাগত প্রত্যাশার উত্তাপে জল হয়ে গেল।

ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখি, স্বরুচিদি দরজায় দাঁড়িয়ে ঠিক সেই প্রথম দিনটির মত। পার্থক্য কেবল সেদিন ছিল চুল জড়ানো, আজ চুলের মেঘে দেহের আকাশ আচ্ছন্ন। চুলের সে মেঘবরণ রূপ ! সেই প্রথম

এ নয়নে চুলও যে নারীর সৌন্দর্যে অপরিহার্য এই চেতনা বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠল। সেদিন অমন বেশে তাঁকে না দেখলে হয়তো আর কখনো এ কথাটা মনেও হত না।

সুরুচিদি ডাকতেই আমি কথা হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাঁর ভারি ভারি চোখমুখের দিকে যতবারই চাইতে যাচ্ছিলাম, চোখ দুটি আপনা থেকে নম্রনত হয়ে আসছিল।

এক সময় সুরুচিদি বললেন, সুকুমার বলছিল, কালই নাকি তোমরা চলে যাবে। আমাকে ভুলে যাবে তো!

গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে বলতে পারলে মনের ভাব হয়তো কিছুটা প্রকাশ পেত—'না-না-না'। কিন্তু গলা তখন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

সুকুমার তো চোখের জল বারে বারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে। আমারো ঝাপসা চোখে কেমন যেন লাগছিল, সুরুচিদির ডাগর ডাগর চোখ দুটো যেন ভিজে।

সেদিন আসন্ন সন্ধ্যায় বিদায় বেলায় বড় দুঃসাহস করে বলে ফেলেছিলাম, সুরুচিদি, তুমি যেন আমাদের 'অন্নদাদিদি'।

আজও ভুলতে পারিনি সে কথার পরিণাম। সুরুচিদি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে বললেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আমায় কি কান্তি, কেবল 'অন্নদাদিদি'র পর্যায়ে ফেলেই সুখ পেলি?

কি যেন বলতে চাইছিলাম, অকস্মাৎ আষাঢ়ে মেঘে বজ্রপাতের মত মারাত্মক হাসিতে সারা ইমারত কাঁপিয়ে সুরুচিদি বলে উঠলেন, না-রে, আমি তোদের অন্নদাদিদি নই—'জহরদিদি'। জানিস্, জহরের মানে জানিস্! বিষ, বি-ষ! অন্ন দিতে পারি না-পারি, পেয়ালা ভরে জহর বিলাতে পারি। যা, যা, তোরা আর ভুলেও এমুখো হোস্না!

সেদিন কেমন যেন মনে হয়েছিল, সুরুচিদি ঠিক প্রকৃতিস্থা নন!

পরের পরিচয়, সেও যেমন সামান্য নয়, তেমনি সহজ বলেও তাকে গ্রহণ করা দায়! সুকুমার কিন্তু চিরকালই অন্য কথা বলত। থাক সে—যে নিজেই চলে গেছে তার কথা বলে আর কি লাভ হবে!

* * * * * *

হঠাৎ কি একটা কথা খট্ করে কানে বাজতে চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। কানে এল, বিসখা বলছেন, না দিদি, আপনার সঙ্গে যেতে পারলে সত্যি খুশী হতুম। কিন্তু এবারকার তীর্থযাত্রাটা মহেশপুরের উদ্ধবদাস বাবাজীদের দক্ষিণ-পরিক্রমার পরিকল্পনার সঙ্গী হয়ে ঘুরব বলে কথা দিয়ে ফেলেছি। সেবার জোশী মঠে বাবাজী আমায় বাঁচিয়েছিলেন, নইলে তো গেছলাম !

চমকে উঠলাম। সে কি, সুকুমারের সুরুচিদির মাথার উপর দিয়ে এত বড় বিপদ গেছে ! মনটা আমার কেমন করে উঠল। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল, সুকুমারও একদিন কি সাংঘাতিক বিপদ মাথায় করে তার সুরুচিদিকে বাঁচাতে প্রাণপণ করেছিল।

সেই যে আমরা সোনারঙ থেকে চলে এলাম, অনেকদিন আমি আর সেমুখো হতে পারিনি। বড়দিনের ছুটিতে সুকুমার গিয়ে ফিরে এলো। যাবার সময় তাকে কত উৎসাহিত দেখেছিলাম, সে যেন ঘোড়ার বাজী জিততে চলেছে টগবগিয়ে—কিন্তু ফিরলে পরে তাকে দেখে চেনাই যায় না। মানুষের পরিবর্তন যত দ্রুতই হোক, সামান্য কদিনে সদাহাস্যময় একটি প্রাণ যে শুকিয়ে এমন নিষ্প্রাণ হয়ে যেতে পারে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল সুকুমারের বেলায়। সে যেন তখন তারই প্রেতাত্মা। শরীরে নয়, মনে। তারই কালো ছাপ আঁকা তার মুখখানিতে।

প্রথমটা দেখে বেদম ভড়কে গেছলাম। আমার সে ছিল, যাকে বলে প্রাণের বন্ধু। তাছাড়া অকারণ পুলকে সুরুচিদির কথা শুনতে গিয়ে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ শ্রোতা হিসাবে আমি যার প্রায় পরম ভক্তের পর্যায়ে পেঁাছে গেছলাম, সেই কিনা বড়দিনের ছুটি থেকে ফিরে কোন কথাই বলে না। রাতদিন কেমন যেন মুখ ভার।

কতদিন আর এ ভাব সহ্য করা চলে। তাই একদিন ওকে ধরেই পড়লাম, বল না ভাই, ব্যাপার কি !

প্রথমটা 'কিছু না' বলে এড়িয়ে যেতে চাইছিল। শেষে অনেক পীড়াপীড়িতে ম্লান হাসি হেসে বলল, বিশ্বাস করবি না, সুরুচিদিকে আমি ভুলে যাবার চেষ্টা করছি।

সে কি রে ?

সে অনেক কথা।

সে অনেক কথা ! কেমন দর বাড়াচ্ছে দেখ না। কিন্তু আর ওকে দর বাড়াতে দিচ্ছিনে—এই না ভেবে ওকে এমন চাপাই চেপে ধরলাম, ফলে এক সময় সুকুমার সহসা কেঁদেই ফেললে। তাকে ছোটবেলা থেকে চিনি। কোনদিন কোন ব্যাপারে তাকে কাঁদতে দেখিনি। আজ কেন যে কাঁদলো তার আদি-অন্ত না পেয়ে বড় অপ্রস্তুত হয়ে যেতে, সে নিজেকে সামলে নিয়ে যা বললে তাতে আমায় রীতিমত ভাবিয়ে তুললে !

সুরুচিদির কথা নয়, কমলবৌদির কথা। সুকুমার বলছিল, সেদিন কেন যে গোঁসাইবাড়ীতে গেলাম, আর গেলাম তো ওদের অন্দরমহলে মেজগিন্নীর সঙ্গেই বা দেখা করবার কি ছিল ! কি বলব, মেজগিন্নী যেন সাক্ষাৎ দুর্গাপ্রতিমা ! সুরুচিদি ত দেখতে খারাপ না। কিন্তু কোথায় মেজগিন্নী—কোথায় সুরুচিদি ! কিন্তু দেখার ভালমন্দে আমার কি ! মনেপ্রাণে যে ভাল সেই তো সংসারে দুঃখ পায়। সুরুচিদির কোন দুঃখ নেই এমন কথা এবার ফিরে তাঁর পরম শত্রু হলেও বলতে পারতাম না রে ! কেবল কমলবৌদির দুঃখটা আরও যেন বেশী ভারী।

আমার মনে ততক্ষণে অদম্য কৌতূহল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ! কোথা থেকে সব অভাবনীয় প্রশ্ন বয়ঃসন্ধির বয়সটা চিরে ফেঁড়ে তখন রীতিমত বিজ্ঞ গাম্ভীর্যে বেরিয়ে আসছে।

সুরুচিদির দুঃখটা কিসে, কমলবৌদির দুঃখটা আরও বেশী ভারী কেন, সুকুমার এসব জানলে কি করে ;—এই সব কথায় একে একে বেরিয়ে প'ল অনেক কথা।

সুকুমার বলছিল, কমলবৌদি সবি জানে। সুরুচিদি যে শহরের

সরকারী উকীলের বৌ ছিল, সেটুকুও কমলবৌদি জানে বৈকি! তাই যখন বললে, "আমার তো লজ্জায় ঘৃণায় মাথা কাটা যায়, জলে ডুবে জীবনের জ্বালা জুড়াতে পারতাম ত বাঁচতাম। কেবল আত্মহত্যা মহাপাপ।" বলবার কালে কমলবৌদির চোখদুটো দিয়ে যেন গনগনে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছিল। কি বলব কান্তি, কমলবৌদি আর কিছু চায় না, কেবল শ্বশুর রাধিকারমণ গোস্বামীর সন্তানের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে একটা শান্তিযজ্ঞ করলে কেমন হয়, তাই জানতে চাইছিল। তুই তো জানিস, কি করে কি যজ্ঞ হয়, কিসে কার প্রায়শ্চিত্ত হয়, সে কি আমরা কখনো বলতে পারি। পেতাম একবার হিমালয়ের চটীতে যে সাধুবাবারা ধ্যানমগ্ন হয়ে অনন্তকাল বসে আছেন তাঁদের কারো সাক্ষাৎ—এমন বর চেয়ে নিতাম, যাতে সুরুচিদিরও ভাল হয়, গোঁসাইবাড়ীর মেজগিন্নীও জীবনে সুখী হন।

অকস্মাৎ সুকুমার নির্বাক্। কেমন যেন গভীর ধ্যানস্থ ভাব। সেখানে থেকেও সে নেই। যেন চলে গেছে কোন্ সুদূরে—চিরতুষারাবৃত রহস্যঘেরা হিমালয়ের তুঙ্গশিখরে। ধ্যান ভাঙ্গাতে মন চাইল না। কতবার মনে হল, একবারটি জিজ্ঞেস করি, সুরুচিদি কি বলেন, এ ভাইটির কথা কিছুই জানতে চাননি কি? যদি চেয়ে থাকেন, সুকুমার কী উত্তর দিয়েছে—আরো কত কি!

এক সময় যেন ধ্যান ভেঙ্গে সুপ্তোত্থিতের মত সে বললে, আমি যদি সন্ন্যাসী হয়ে যাই, তুই কি কাঁদবি কান্তি!

এ কথায়, সুকুমার সন্ন্যাসী হোক বা না-হোক, আমার তখন সত্যি চোখ ছলছল করে এসেছিল।

সংসার বড় বিচিত্র। এর ঘটনা-প্রবাহ সব সময় যুক্তিবিশ্লেষণের ধার ধারে না। আর সময় সময় এমন সব অপ্রত্যাশিত ব্যাপার অকস্মাৎ ঘটে যায়, যা ঘটনার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মনে হয়, কল্পনার অতীত। সুকুমারের মতি যখন নতুন পথে গতি নিতে ব্যাকুল, এমন সময়ে এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটল।

আমাদের গাঁয়ে মেয়েদের পর্যন্ত হাইস্কুল ছিল। ছিল না কেবল বাবাজীদের আখড়া আর স্বামীজীদের আস্তানা। কিন্তু সেবার হঠাৎ এক বৈষ্ণবধর্ম ব্যাখ্যাতা সদলবলে খোল-করতাল সম্বল করে গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। কদিন মহা ধুমধামে পঞ্চাননতলায় অচিন বটের ছায়ায় সে কি নাম-সংকীর্তন! রাতে এক প্রভু এমন ভাগবত পাঠ শোনালেন যে, স্থকুমারকে দু-চারদিন যেতে-না-যেতেই দেখা গেল সেও রং পালটেছে।

তারপর থেকে বড় একটা তার পাত্তা পাওয়া ভার। দৈবাৎ দেখা হলে সৌভাগ্য! একদিন বলেছিলাম, স্থকুমার, ধর্মকর্ম করবার সময় জীবনে যথেষ্ট পাবি, কিন্তু এ বছর প্রবেশিকা পরীক্ষাটা পাশ না করে নিলে পরে পস্তাবি। এ কথায় সে শুধু হাসল— মাধুর্যভাবের হাসি। হেসে হেসে তোতা বুলিতে বলে গেল, কৃষ্ণ যে পেল না, এ কাল সংসারে তার সবি মিথ্যে।

বৈষ্ণবদল যেমন বিনা আহ্বানে এসেছিলেন তেমনি বিনা নোটিসে বিদায় হলে প্রথম যেদিন স্থকুমারের সঙ্গে দেখা সেদিন প্রথম কথাই হল, ভেবেছিলাম তুইও বুঝি গেরুয়া ধরলি।

ও উত্তর না করে অন্য কথা পাড়লে। কথায় কথায় বললে, সত্যি কান্তি, আজকাল আমি দিনরাত চোখের 'পরে মহাপ্রভুকে দেখছি। যেই তাঁকে হাত বাড়িয়ে ধরতে যাই—অমনি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে! কোথায় গোরাচাঁদ, স্থমুখে ছায়ায় ছায়ায় হেসে ওঠে স্থরুচিদি। মহারাজ কিশোরীরূপ ভজনের কথা প্রায়ই বলতেন, সেই রূপ যেন স্থরুচিদির অঙ্গের লাবণি।

তুই পাগল হলি নাকি রে।

এ কথা শুনে স্থকুমার যথার্থই পাগলের মত দৃষ্টিতে দীর্ঘ সময় চেয়ে রইল। তারপর এক সময় উদ্‌ভ্রান্তের মত যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে পা বাড়িয়ে দিলে।

কত ডাকলাম, আস্তে, জোরে—আরো জোরে, চীৎকার করে, কিন্তু সে ডাক ওর কানে পৌঁছুল না।

অনেক দিন কেটে গেল। সুকুমার পরীক্ষা দিল না, সে যে কোথায়, তার খোঁজও পাওয়া গেল না। পরীক্ষার পাশের খবর একদিন বেরুল। সে আনন্দ তার অবর্তমানে একটুও ম্লান হল না। এমনি করে যখন তাকে একেবারেই ভুলতে বসেছিলাম তখন হঠাৎ এক আঁধার রাতে ঝড়নাড়া পাখীর মত সে সোজা আমার কাছেই এসে উপস্থিত। সারা শরীর শীর্ণ কিন্তু কোটরগত চোখ তুটি জ্যোতির্ময়।

এসেই বললে, সব ঠিক করে এসেছি, কান্তি। কাউকে ঘুণাক্ষরেও কিছু প্রকাশ করবিনে কিন্তু।

এমন ভূমিকা সুকুমারের জীবনে এই প্রথম। তাই কেমন গা ছম ছম করে উঠল।

—সুরুচিদি মহাপ্রভুর মত দ্বারে দ্বারে কীর্তন করে ভিক্ষে নিয়ে নাম বিলিয়ে বেড়াতে রাজী হয়েছেন। আমায় কথা দিয়েছেন, "আসছে অমাবস্যায় তুই ভাই বোনে সংসারের সকল বন্ধন ছিঁড়ে কৃষ্ণে এ প্রাণ সমর্পণ করতে ছুটে বেরোব।"

—বলিস কিরে! মেজ গোঁসাই সরকার উকীলের সর্বনাশ করতে পেরেছেন, আর তোকে ছেড়ে দেবেন?

ও বললে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে।

অবাক্ হবার আর বাকী ছিল না। তবু বললাম, কিন্তু সুকুমার, নিজের পরিণাম ভেবেছিস? এতে কি লাভ হবে বলতে পারিস? সুরুচিদিই বা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন?

গম্ভীরস্বরে ও বললে, কৃষ্ণের আশ্রয়ে।

এ ছাড়া কি অন্য কোন পথ নেই?

কমলবৌদির তুঃখ সুরুচিদি আর কোন্ পথে ঘোচাবেন!

চমকে উঠেছিলাম। চমক ভাঙলে চেয়ে দেখি, সুকুমার অন্ধকারে বেরিয়ে গেছে।

সেই যাওয়া তার শেষ যাওয়া নয়। আর একদিন মাত্র সে

অমনি আঁধার রাতে বাজপড়া তালগাছটার মত এসেছিল। বাড়ীতে নয়, হস্টেলে। তখন তার চোখেমুখে ব্যথাহত যে নিষ্ঠুর হতাশার ছাপ দেখেছিলাম, সে দৃশ্য জীবনে চরম শত্রুর জন্যেও যেন কখনো কামনা না করি।

এসে ক্ষণিক থেমে শুধু জানালে, সুরুচিদি চকমেলানো বাড়ীর অভিশাপ মাথায় নিয়ে পথে বেরিয়েছে, কান্তি। আমি জ্বরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। একবারটি খোঁজও নিলে না, দুদিন দেরিও করলে না—এমনি নিষ্ঠুর। ও আমার দিদি না, আর কেউ।

বলতে বলতে সুকুমারের চোখ ফেটে শ্রাবণের ধারা নামল।

সারারাত তাকে ধরে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আঁধার রাতের বজ্রনাদ যাকে ডাক দিয়েছে তাকে ধরে রাখবে এমন সাধ্য কার।

বেরিয়ে পড়বার মুখে যে ক'টি কথা ও বলেছিল, সে যে ভোলবার নয়। সুরুচিদি নিশ্চয়ই পথে পথে আমার প্রত্যাশায় ঘুরছে রে, কান্তি তার যে আর কেউ নেই।

বলেই সেই যে সে গেল, আজও তার সন্ধান কেউ পেল না। অথচ যাকে সে খুঁজতে বেরিয়েছিল সেই সুরুচিদি আজ জোছনারাত্রিতে শ্রীরঙ্গমের চন্দ্রকুণ্ডের সিঁড়িতে বসে; উদ্ধবদাস বাবাজীদের দক্ষিণ-পরিক্রমার সঙ্গী। সেই আর এই!

* * * *

অদূরে খোল-করতালের উন্মত্ত বোল ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল। মন সেদিকে একবার ঘুরে এলো। এমন সময় কানে গেল, মাসিমা বলছেন, অত বড় সম্পত্তিটা সবটাই উইল করে দিবি!

তাহলে এঁদের আলোচনা অনেক গঙ্গা-যমুনা তোলপাড় করে মোহনায় এসে ঠেকেছে। নিজের চিন্তার অতলে তলিয়ে গেছলাম। জানতেও পেলাম না, তোলপাড়ে জল ঘোলা হল, না, স্রোতের বেগে জোয়ারের নির্মাল্য সাগরের পথ পেল।

খোলের বোলের তালে তালে কৃষ্ণগুণগাথা-গীতি-পদমাল্য আরো

কাছে শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে কানে এলো, দিদি, সব দিয়ে যে আমায় বঞ্চিত করে গেছে, তার নামে ওসব তুচ্ছ সম্পত্তি নিঃশেষ করে না দেওয়া পর্যন্ত এ বন্ধনের লজ্জা থেকে ঠাকুরের কাছে মুক্ত হতে পারছি না যে !

—তাহলে সা'-মশায়ের আত্মার তৃপ্তি ভালরকমেই হচ্ছে !

—সে ঠিক বলতে পারি না। শুধু প্রেমের ঠাকুরের পায়ে এ মিনতি জানাই, ঠাকুর, আমার সুকুমার ভাইয়ের আত্মা যেন তৃপ্তি পায়।

হঠাৎ সমুদ্রমন্থনের সকল বিষ নিমেষে অপসারিত করে অমৃতপাত্র হাতে স্বয়ং মোহিনী আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালে যত-না আশ্চর্য হতাম, রসকলিরঞ্জিত বহুবেদনা-লাঞ্ছিত রহস্যময়ী রমণীর শেষ কথায় তার চেয়েও বিস্ময়ে বুক ভরে উঠল, যেমনটা ভরেছিল ঠিক এমনি আরেক দিন সোনারঙের পরিত্যক্ত মহলে এক রমণীর ভরা-ভরা চোখের স্নিগ্ধদৃষ্টিতে।

সেই মুহূর্তে মাসিমার গুরুভাই বিসখা উঠে পড়লেন। উদ্ধবদাস বাবাজীদের কীর্তনের দল শ্রীরঙ্গম মন্দির প্রাঙ্গণে নগরসংকীর্তন সেরে এতক্ষণে প্রবেশ করেছে।

॥ ২০ ॥ ধনুষ্কোটির পথে

কতদিন বসে ফুল কেবলি ভাবত, কবে সে উড়বে। যেখানে খুশী সেখানে উড়ে যাবে। কি মজাই না হবে তাহলে!

এমন যে ফুল, আমাদের বিশ্বকবি তার দুঃখ ঘোচাতে তাকে দিয়ে দিলেন একদিন ডানা। কবি বললেন, ডানা পেয়ে ফুল যে হল প্রজাপতি, এখন ডানা মেলে তাকে উড়ে যেতে কেউ করে না মানা।

আমারো মনের অবস্থাটা বহুকাল ছিল ওই ফুলের মতন। দীর্ঘদিন শুধু ভাবতাম আর ভাবতাম, 'সন্ন্যাসী শ্রীধর' গঙ্গোত্রীর বারি রামেশ্বরের শিরে চড়াতে যে আগ্রহ নিয়ে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে গেছলেন, কবে আমিও তেমনি আগ্রহ নিয়ে সেখানে যাব। আর ভাবতাম, যদি ডানা পেতাম এক্ষুনি চলে যেতাম যেখানে এককালে জলে ভেসেছিল শিলা।

আজ রেলগাড়ীর ডানায় ভর দিয়ে রাতের দ্বিতীয় প্রহরে সেই মানস-তীর্থে সাঁ সাঁ করে উড়ে চলেছি।

মাসিমার ইচ্ছে ছিল উদ্ধবদাস বাবাজীদের কীর্তন শেষে ওই দলের সঙ্গে গুরুভাই বিসখার গান শুনতে শুনতে যাবেন ধনুষ্কোটি। কিন্তু বিসখা জানালেন যে, বাবাজীদের কীর্তন চলবে পূর্ণিমা পর্যন্ত। তারপর কাবেরীতে পুণ্যস্নান, রঙ্গনাথ দর্শন সেরে তবে তাঁরা নানা তীর্থ প্রদক্ষিণ করে ধনুষ্কোটিতে যাবেন। ততদিন মাসিমার পক্ষে যখন অপেক্ষা করা অসম্ভব তখন সেই রাত্রিতেই আমরা গাড়ীতে চেপে বসলাম।

বেশী রাতের গাড়ি, তায় ভালভাবে বিশ্রাম নিতে নিতে যাবার ইচ্ছায় আয়েসী কামরার টিকিট কেনার দরুন ভীড়ের নামমাত্র ছিল না। অচিন্ত্য, মাসি, আমি তিনজন আর ছিলেন একজন সুপ্রবীণ। কামরার স্তিমিত আলোকে সুপ্রবীণকে লক্ষ্য করছিলাম। না, তাঁর চেহারার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা আমার দৃষ্টিকে ডেকে বলছিল, আমায় দেখে নাও।

পথ কম নয়, একশো তিয়াত্তর মাইল। ঘুম না আসায় সারারাত কি

করে কাটানো যায় সেই চিন্তায় চিন্তায় অন্ধকার দেখছি, এমন সময় হঠাৎ আলোর ঝলকানি যেন বলে দিল, প্রবীণের সঙ্গে আলাপ করলে কেমন হয় !

সুপ্রবীণের গন্তব্যস্থল কোথায়, জানতে চাওয়ায় তিনি এক পাশে ঘেঁষে কানে কুলো করে হাত ঠেকালেন। মুখের চেহারাটিও এমন করলেন যাতে বলা হয়ে গেল, আরেকটু জোরে বলুন।

তিনি যে খুব বেশী কানে কম শোনেন, তা নয়। তবে কিনা শ্রবণেন্দ্রিয় তাঁর যতটা শক্তিমান হওয়া উচিৎ ততটা না হওয়ার উপরি উপসর্গ হল তুইয়ের উচ্চারণের ব্যবধান। একেই যে ভাষায় আলাপ, সে শেকস্‌পীয়ার, জনসন, শেলী, কীটস, বায়রনের ভাষা আমাদের কারোরই মাতৃভাষা নয়, তায় বাংলা উচ্চারণ আর তেলেগু উচ্চারণে পার্থক্য প্রচণ্ড। কাজেই প্রথমটা কিছু অসুবিধা হতে লাগল। তবে ক্রমে ক্রমে আলাপ জমে উঠল। যদিও সুপ্রবীণ সহাস্যে জানালেন, তাঁর বয়স বাংলা দেশের—তখনকার, অর্থাৎ উনিশশো চুয়ান্ন সনের প্রধানমন্ত্রী ডাক্‌টার বিধানচন্দ্র রায়ের সমান, তবুও আমার দাদুর বয়সী প্রবীণের প্রাণপ্রাচুর্যের যেন সীমা ছিল না।

বাহাত্তর পেরিয়ে যিনি তিয়াত্তরে পড়েছেন তাঁর মধ্যে বিংশ শতকের প্রভাবের চেয়ে উনবিংশ শতাব্দীর ইয়ং ইণ্ডিয়ার আভিজাত্যগরিমা অধিক মাত্রায় বর্তমান থাকবে এতে আর আশ্চর্য কি ! যেমন স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য তেমনি মুখে লাবণ্য। অ'র তাঁর দাঁতগুলি আজিও জীর্ণ হয়নি, তাই কথাবার্তায় অবাধ স্বাচ্ছন্দ্য। জীবনের বহুদর্শিতা চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ না ফেলে বরং চিরতারুণ্যের আমেজ এনে দিয়েছে। এই দেখে মাসিমাও অবাক। তিনি আমায় ডেকে আস্তে বললেন, বুড়োর হাসিটি কি মিষ্টি। মুখখানিতে আমার নাতির সরলতা যেন টলমল করছে।

সত্যিই তাই। যদিও তাঁর একটি চুলও কাঁচা নেই, শার্দূল গোঁফ জোড়া বরফের মত সাদা, তবুও সারা মুখে ঢলঢলে শিশুর সরলতা। এমন লোক সচরাচর চোখেই পড়ে না, তায় এক কামরায় তাঁকে সহযাত্রীরূপে পেয়ে আমরা বর্তে গেলাম।

আলাপ কিছুটা এগোতে দিব্যি বোঝা গেল, প্রবীণ পণ্ডিত লোক। তবে পাণ্ডিত্য তাঁর প্রাণ শুষে রস নিংড়ে জীবনটাকে নীরস ছোবড়া করে ছাড়েনি। সুপণ্ডিত সুরসিক হলে যেমন সোনায় সোহাগা হয়, প্রবীণও তাই!

এমন লোকের মুখে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের কথায় খই ফোটাই স্বাভাবিক। আমরা বাঙ্গালী, তাই তিনি প্রথম জানতে চাইলেন, বাংলা-দেশে রবীন্দ্র-সাহিত্যের চর্চা কতটা হচ্ছে।

আকাশে ঢলঢলে চাঁদ। নিশুতি রাত ওই চাঁদের আলোর ওড়না জড়িয়ে তারার মণিময় হার গলায় চড়িয়ে বাসরকক্ষে চলেছে। আমরা গাড়ীর কামরার জানলায় বসে তারার সেই মরাল-গতির চলার ছন্দে মনের ছন্দ মেলাতে চাইছি, তারই আভাস পেয়ে রাত্রিবধূ বারেক চোখ ফিরিয়ে স্নিগ্ধতার পরশ দিয়ে চোখ আমাদের জুড়িয়ে দিলে। বুক জুড়াতে প্রবীণ তখন মিষ্টি সুরে আবার বললেন, এ রাতে আর কিছুই চাই না, শুধু কবিগুরুর গান শোনাতে পারেন যদি কয়েকখানা।

সেই মুহূর্তে মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলাম, গানকে কেন বলা হয় সবার সেরা শিল্পকলা!

নিরুপায়, আমরা কেউই গান জানি না। অতএব আলাপের মোড় ঘুরে গেল। আমি বললাম, গান না হয় নাই-বা হল, আপনি বলুন, গুরুদেবের কবিতা আপনার কেমন লাগে।

—ব্যক্তিগতভাবে কবিগুরুর কবিতার রস আমার মূল বাংলায় পড়ার সুযোগ না মেলায় সময় সময় মনে বড় হাহাকার জাগে। কেন এই হাহাকার, ইংরেজী গীতাঞ্জলি আর গার্ডেনার পড়তে পড়তে কতদিন নিজেকে এ প্রশ্ন করেছি, তার হিসাব নেই। কিন্তু উত্তর বারবারই পেয়েছি সেই এক কথা, মূল কাব্য না পড়লে কাব্যের প্রাণ কখনো পাওয়া যায় না। তবু যা পেয়েছি তার তুলনা কোথায়। তুলনা নেই বলেই অন্য প্রান্তীয় ভাষার কথা বলব না, আমারি মাতৃভাষা তেলেগু, যাকে বলা

হয়, প্রাচ্যের ইতালিয়ান, তার এমন কোন শাখা নেই যাতে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রভাব পড়েনি।

এরপর সাহিত্য প্রসঙ্গ ছেড়ে যে দেশের মন্দিরে মন্দিরে ঘুরছি তারই কথা শুরু করা হল। তখন সবে অন্ধ্ররা মাদ্রাজ থেকে পৃথক্ হয়ে স্বতন্ত্র অন্ধ্ররাজ্য গঠন করেছেন। তাই ভাবলাম, এই সুযোগে প্রবীণের মতামত কিছুটা নেওয়া যাক, কি তিনি ভাবেন না-ভাবেন প্রতিবেশী রাজ্যের সম্বন্ধে।

কৌতূহল চরিতার্থ করতে তাঁর বিন্দুমাত্র আপত্তি দেখলাম না। চরিত্রে যে দ্বৈত সত্তা থাকলে মনের কথাকে মুখের কূট বুলিতে অনায়াসে আবরণ দেওয়া চলে, তেমন কূট-কৌশলের ছাপ প্রবীণের কথাবার্তায়, এমনকি মুখের ভাবেও দেখতে পাওয়া গেল না। তিনি অক্লেশে বলে গেলেন, কোথায় কোথায় দুই প্রতিবেশী রাজ্যের সাধারণ মানুষের মনোবৃত্তি আলাদা। বলে গেলেন, কেন তামিল তেলেগুতে তেমন মিশ খায় না।

তিনি স্বভাবসিদ্ধ হাসিতে বললেন, দান্তে একটা বড় দামী কথা বলে গেছলেন, সবচেয়ে তেতো হচ্ছে পরের রুটি, আর পরের সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামার মত দুর্ভোগ দুনিয়াতে দ্বিতীয় নেই। আমাদের অবস্থা হয়েছিল তারও বেশী সাংঘাতিক। আমাদের খাদ্য উৎপাদনটা আমরাই করতাম, সেটি মুখে তুলতে পরের আদেশ মান্য করবার অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেছল। আর জীবনের ওঠানামা বলতে একালে যার যার জীবিকা অর্জনের লাইনে আমাদের অন্যের সিঁড়ি দিয়ে নিজের দেশে ওঠা বড় আর একটা হয়ে উঠত না। একেই পরের সিঁড়ি, তার উপর ভারি পেছল। কাজেই বুঝতে পারেন।

কিন্তু অন্ধ্রের কেউ কেউ মাদ্রাজ মন্ত্রিসভায় সেদিন পর্যন্তও তো আসন দখল করে ছিলেন, সে কেমন করে সম্ভব হয়েছিল ?

তাঁরা সব চাইনিজ সার্কাসের জিমন্যাস্টিক শিখেছিলেন, নইলে অমন পেছল সিধে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চড়বেন কিভাবে।

আর প্রশ্ন নয় এ নিয়ে। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। রাতের তৃতীয় প্রহর শেষ হল। এমন সময় প্রবীণ জানালেন, তাঁর নামবার সময় হয়ে এল।

এত শীঘ্র এমন একজন সুন্দর দাদুকে ছাড়বার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ছাড়তে যখন হবেই তখন আরো দু-একটি কথা শুনে নিতে আপত্তি কিসে।

তখন আমরা মনমাদুরাইয়ের কাছে এসে পড়েছিলাম। এখানে নেমে প্রবীণ তাঁর কি কাজে কাছে কোথায় যাবেন। আমি চট করে জিজ্ঞেস করলাম, বিজয়নগরের সাম্রাজ্য দক্ষিণে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল, তার কি কোন প্রভাব আজ আর নেই!

স্মিতহাস্যে তিনি বললেন, যে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরছেন, তার বহু পাথরে বিজয়নগরের জয়গাথা।

বলেই তিনি তাঁর বিছানা গুটোতে লাগলেন, কিন্তু আমাদের সাহায্য গ্রহণ করলেন না। পাছে আমরা ক্ষুণ্ণ হই তাই বললেন, এখনো বুড়ো হইনি।

কণ্ঠে তাঁর এমনি রহস্যের স্বর যে আমরা সমস্বরেই বলে উঠলাম, বিশ্রাম কি নিতে নেই?

শিশুর মত সরল হাসিতে, কপট স্বরে চট করে বললেন, হোয়াট? বিশ্রাম? ওটি সেদিন নেব, যেদিন, বলেই হাত দিয়ে বুকের ঝরণা কলম তুলে নিয়ে পরে কথা শেষ করলেন, যেদিন এই কলমটা হাত থেকে আলগোছে টেবিলের উপর গড়িয়ে পড়বে। তারপর তাঁর সে কি মৃদু মৃদু হাসি। সেই স্নিগ্ধ হাসি কিছুতেই যেন আর থামতে চায় না।

থামল তখন যখন গাড়ী মনমাদুরার প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে। সুপ্রবীণ ততক্ষণে নেমে পড়েছেন। সকলের নমস্কারের প্রতিদানে নমস্কার সেরে তরুণের মত হন হন করে এগিয়ে চলেছেন।

চলে গেলে পরে মাসিমা সহসা বলে উঠলেন, এমন সুন্দর মানুষ,

তোমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে, এঁর সাক্ষাৎ পেলে। দেখলে ফুলের কথা মনে পড়ে। কোন্ ফুল বলতো! টগর যেমন সাদা, তেমনি মনটা।

কিন্তু নাম ধাম জেনে নেওয়া তো হল না। হঠাৎ অকারণে মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। রাতের গাড়ী তীব্র শিসে আবার যাত্রা শুরু করল।

স্টেশনের পর স্টেশন নীরবে আমরা তিনটি প্রাণী পেরিয়ে চলেছি। অন্তরে কত যুগযুগান্তের মানুষের মর্মরধ্বনি গুঞ্জন তুলছে। কথা বললে পাছে তাদের মুখরতা বাধা পায় তাই যেন কেউ কথা বলে অপরাধী হতে নারাজ। এইভাবে নীরব চলার আদেশ কেউ দেয়নি, তবু আমরা স্বেচ্ছায় নিজ নিজ অন্তরের নির্দেশ মেনে নিয়েছি।

রাত্রি আস্তে আস্তে লীন হতে চলেছে। আগামী প্রত্যূষের আলোর আভাসে দশ দিক্‌বধূ চোখে ভোরের অঞ্জন লাগাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এমন প্রভাত রাত্রির সন্ধিক্ষণে মনে আমার অকস্মাৎ কী এক আর্তস্বরের আঘাত!

সে স্বর ক্রমে বাঙ্ময় হয়ে "জানকী জানকী" আর্তরোদনে বিশ্বচরাচরে ছড়িয়ে পড়ল।

বহু দূর অতীতে একদিন কাননে কাননে শ্রীরামের কণ্ঠে ঐ আর্ত-রোদন ক্রন্দন করে ফিরেছিল। তারপর এই পথে বানরসেনার বহর নিয়ে আর একদিন রঘুপতি রাম সমুদ্রবন্ধনে এগিয়ে চলেছিলেন। পরম ভক্ত হনুমান লঙ্কা থেকে অশোককাননে বন্দিনী সীতার সংবাদ নিয়ে এসেছেন। এখন সাগরবন্ধনে সমুদ্র পেরিয়ে লঙ্কাপতি নিকষানন্দন দশাননকে পরাস্ত করতে পারলে তবে হবে জানকী-উদ্ধার। যাঁর কোন সংবাদই ছিল না তাঁর খবর মেলায় বেদনার আঁধার রাত্রি অস্তমিতপ্রায়।

আমাদের চোখের সামনে সেই রাত্রিলীন প্রত্যূষের আবির্ভাব হতে চলেছে। মণ্ডপম্ ক্যাম্প এসে গেছে। এখানে সিংহলযাত্রীদের বিদেশ-যাত্রার যন্ত্রণাভোগের ব্যবস্থা রয়েছে।

ক্যাম্পের পরেই মণ্ডপম্। একটু এগিয়ে কাছেই সমুদ্রের আভাস। কিছুক্ষণ থেকে ভোরের সমুদ্রের হাওয়া ভেসে আসছিল। এখন শোনা গেল সমুদ্রের গর্জন। একটু একটু শীত শীত করে, কিন্তু কম্বল মুড়ি দিতে নিষেধ জানায় এমনি চমৎকার এখানকার মিষ্টিমধুর মনমাতানো হাওয়া। হাওয়ার সাথে জানলা দিয়ে আলাপ করতে যাব এমন সময় গাড়ী আমাদের লম্বা এক পুলের পরে চড়ে বসল। এই পুলটি রামেশ্বরমকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করেছে এবং 'মান্নারের' উপর দিয়ে সাগরের সুদীর্ঘ ফাঁড়ি পেরিয়ে প্রত্যহ দেশ-বিদেশের তীর্থযাত্রীদের সেতুবন্ধের দেশে পোঁছে দিচ্ছে।

তলায় সাগরের জলকল্লোল, আকাশে মুকুলিত আলোর চঞ্চল দোল, এই দুইয়ের মাঝখানে লৌহরথের আঘাত-সংঘাত-মুখর যন্ত্ররথের ঘর্ঘর আর নিশ্চুপ, নিশ্চল মানুষের দল কামরা দিয়ে হাত বাড়িয়ে, চোখ ছড়িয়ে সকালের স্নিগ্ধসুধায় যার যার প্রাণপাত্র পূর্ণ করে নিতে ব্যাকুল-ব্যগ্র। সুদীর্ঘ দক্ষিণের পথে এ পর্যন্ত যা কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখে পড়েছে, তার কোনটারই সৌন্দর্য মনে তেমন সাড়া জাগতে পারেনি। কাঞ্চীর বন্দর নগরীতে আশ্চর্য সুন্দর সমুদ্র মনকে বারেক বিহ্বল করে তুলেছিল বটে, তারপর দীর্ঘ পথপরিক্রমায় ত্রিচীর পাহাড়-মন্দিরের ঊর্ধ্বলোক থেকে প্রকৃতিকে দেখতে সুন্দর মনে হয়েছিল ; কিন্তু আজ এই সুপ্রভাতের শ্রী-সুষমা যেন সকল কিছুকে ছাড়িয়ে সৌন্দর্য ও মাধুর্যের স্বর্ণথালীতে সৃষ্টিকর্তার উদার শুভ্র অনন্য মাল্যখানি।

না, যেন কিছুই বলা হল না! মাসিমা যে মাসিমা, তিনিও গভীর বিস্ময়ে এতক্ষণ নির্বাক হয়ে ছিলেন, হঠাৎ গাড়ী যখন পুলের মাঝখানে তখন আনন্দের আবেগ আর চেপে না রাখতে পেরে উল্লাসভরে বলে উঠলেন, দেখ, তোমরা দেখ, হাজার হাজার স্নিগ্ধ আলোর পরী জলের ঢেউয়ের পরে পা ফেলে কেমন নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে। জল-কল্লোলে তরঙ্গে তরঙ্গে ওরা তালে তালে নাচছে। যদি কেউ আলোর নাচন দেখতে চায়, খর আলোর নয়, তুলতুলে ফুলের মত আলোর, সে

যেন এই সকালের গাড়ীতে একবারটা এই মান্নার পাড়ি জমায়! মানুষ যে শান্তি চায়, এখানে সেই শান্তি, এর চেয়ে সুন্দর শান্তি আর কোথায়।

মণ্ডপম্ ক্যাম্প থেকেই নতুন ধরনের এক ব্যবহার শুরু হয়েছিল সকল যাত্রীদের প্রতি, যার সাক্ষাৎ দক্ষিণের মন্দিরের পথে পথে ইতিপূর্বে কখনো মেলেনি। ঐ ক্যাম্পের প্লাটফরমে গাড়ী থামতেই সেই শেষ রাতে কামরার দোরে দোরে একদল লোক নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নাম ধাম জানবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। আমরাও এ পীড়ন থেকে বাদ গেলাম না। কিন্তু উদ্দেশ্যটাও জেনে নিলাম। এই পীড়ক দল, অন্য আর কে হবেন, পাণ্ডারা ছাড়া। দক্ষিণের মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে পাণ্ডাদের দৌরাত্ম্যের এ পর্যন্ত দর্শন না পেয়ে দিব্যি স্বস্তিতে ছিলাম। এতক্ষণে তার বুঝি দফা রফা হতে চলল।

পামবানে পৌঁছাতে যাত্রী নিয়ে পাণ্ডাদের মধ্যে রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। কাড়াকাড়িটা গয়া কাশী পুরীতে হলে মারামারিতে দাঁড়ালেও আশ্চর্যের কিছু ছিল না। কিন্তু এখানে ব্যাপার অতটা গড়াবার দুর্লক্ষণ দেখা গেল না। বরং যাত্রীরা যারা পাণ্ডা দেখলেই ভয়ে ভীত, অথচ সে ভয়টা মেকী বিক্রমের আবরণে ঢাকা দিতে ব্যস্ত, এই যেমন আমরা, তাদের কাছে বেশ ভদ্রবেশী এদেশী লোকজন এসে কেউ কেউ পাণ্ডাদের পরম নিন্দেই করতে শুরু করে দিলে। আর অন্যান্যরা দাপরাপ ছেড়ে মিনতি করে বলতে লাগল হাত জুড়ে, যাত্রী না পেলে খাব কি মা! কি দিয়েই বা বালবাচ্চার মুখ ভরাব।

বড় করুণ কণ্ঠ!

তারও উত্তর ওদেরই একজন আমাদের পরিবেশন করলে। বললে, যেমন পাপ, তেমনি প্রতিফল। কে বলেছিল যাত্রীদের ঘাড় মটকে রক্ত খেতে। কে সেধেছিল, ভদ্রঘরের মেয়েছেলেদের অত হয়রানি করতে। ভালই হয়েছে, সরকার থেকে পূজোর খরচা বেঁধে দিয়েছে।

অচিন্ত্য এ কথা শুনে কানে কানে বললে, লোকটা বড় ভাল রে। আমার মন্তব্য করবার আগেই স্থানীয় বক্তা পরম ভক্তি সহকারে একখানি

ছাপানো কাগজ মাসিমার দিকে এগিয়ে ধরে বললে, জানেন মা, এখানে তো অন্য ব্যবসা নেই, ব্যবসা এই তীর্থ দেখাবার নাম করে লোক ঠকানো। দেখবেন যেন জোচ্চোরের পাল্লায় না পড়েন। এই ধরুন ভাল হোটেলের ঠিকানা, আমার 'পরে বিশ্বাস না হয়, সোজা স্টেশনে নেমে চলে যাবেন। ফেরবার সময় অধীনকে এখানেই পাবেন, যদি মিথ্যে কিছু বলে থাকি— না হয় দু'ঘা জুতাই লাগাবেন।

মনে মনে ভাবলাম, এই পাপের পৃথিবীতে এমন ধর্মাত্মাও এই পুণ্য-ক্ষেত্রের প্রবেশপথে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছেন, হায় রে চামড়ায় ঢাকা চোখ তোর কবে আর দিব্যদৃষ্টি লাভ করবে!

তবুও তখনকার মত পামবানে নেমে রামেশ্বরের গাড়ী ধরতে নড়লাম না। বসেই রইলাম। এই গাড়ীতে ধনুষ্কোটি যাত্রার অভিলাষে।

॥ ২১ ॥ ধনুষ্কোটি থেকে রামেশ্বর

ধনুষ্কোটি স্টেশন থেকে সমুদ্রের কূল পর্যন্ত এখন প্রায় মাইল দেড়েক পথ। সারা পথ সকালবেলার সিক্ত বালু ভেঙে যেতে হয়। মাথার উপরে সূর্য কিন্তু পায়ের তলায় ভিজে বালি, তাই গরম তেমন লাগে না। আর সমুদ্রের হাওয়া এসে এ-সকালে চা-র দোলায়। মনে হয় যেন রাজার হালে চলেছি।

সেতুবন্ধ! যেখানে স্বয়ং রামচন্দ্র বানরসেনার সাহায্যে সাগরবন্ধন করেছিলেন—রাবণ বধ করে সীতা উদ্ধারের মানসে। কত শিশুকাল থেকে সে জায়গার কাহিনী রক্তে রক্তে স্বপ্নে গাঁথা হয়ে আছে। দুটি ঘটনা আমার মনে সেই শিশুকালে শুয়ে শুয়ে ঠাকুমার মুখে রামায়ণ শুনতে শুনতে দাগ কেটে গেছল। তার একটি হচ্ছে, হঠাৎ একদিন সাগরবন্ধন-কালে শ্রীরামচন্দ্রের চোখে পড়ল এক অতি ক্ষুদ্র কাঠবেড়ালী চিকচিকে দাঁতের ফাঁকে কাঠি নিয়ে সমুদ্রবন্ধনে সাহায্য করতে এসেছে। সে দৃশ্য দেখে রঘুপতির কমলনয়নে অশ্রু ঢল নেমেছিল। জানকীবিহনে যত দুঃখ সহসা তিনি সে দুঃখের বন্ধন কাটিয়ে আনন্দের অশ্রুধারায় তৃপ্ত হয়েছিলেন। কি আনন্দ, জানকী উদ্ধারে কেবল কপিসেনাই নয় সামান্য এক কাঠবেড়ালীও তাঁর সহায়! অন্যটি হল, তখন রঘুপতি লঙ্কা জয় করে জানকীকে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরছেন। চৌদ্দ বছর বনবাস, দীর্ঘকাল জানকীবিরহ অন্তে আবার রাজমুকুট মাথায় পরবার, সুখসমৃদ্ধি সানন্দে উপভোগ করবার সুদিন সমাগতপ্রায়! একে একে শেষ বানর-সেনাটি সেতু পেরিয়ে এল। ভাই লক্ষ্মণ সবার খোঁজখবর নিয়ে বিপুল বাহিনী পরিচালনা করতে যাবেন, এমন সময় করজোড়ে দীনস্বরে রত্নাকর নিবেদন করলে, রঘুপতি, মানসসিদ্ধি শেষে অধীনের বন্ধনমোচন সাঙ্গ করে না গেলে অনন্তকাল ধরে বন্দী রত্নাকরকে সকলের উপহাস সহ্য করতে হবে। তাই উপায় করুন কৃপা করে। অমনি ভগবান শ্রীরাম ধনুকের ছিলা দিয়ে পাথরে দিলেন টান। রত্নাকরের ঘুচে গেল বন্ধন।

ওদিকে বঙ্গোপসাগর, তাকে বলা হয়, মহাম্বুধি। এদিকে ভারত মহাসাগর, ইনি পরিচিত রত্নাকর নামে। ওদিকে সাগর বারে বারে তটভূমি গ্রাস করে শুনি। এদিকে রত্নাকরের চেহারায় সে ভয়ঙ্করতার চিহ্নমাত্র নেই। তাই দলে দলে মানুষ জনে জনে রত্নাকরের কোলে ঝাঁপ দিচ্ছে। নানা বয়সের, নানা জাতের, নানা ধর্মের, নানা বর্ণের নরনারী স্নানযাত্রী। যে পূজো করবে সে, আর যে পূজো করবে না সেও —কেউ একটা বড় বাকী নেই স্নানে নামতে। পূজার্থী মাত্র দু-একটি ডুব দিয়ে উঠে পড়ছেন মন্ত্র পড়তে আর যাদের সে সমস্যা নেই তারা কাকচক্ষু ·জলে সময়ের পরোয়া না করে কেউ বা ডুবের পর ডুব দিচ্ছে, কেউ বা সাঁতার কাটছে।

মাথার উপরে বহু পাখী। চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে ফিরছে। এত পাখী পুরী, মহাবলীপুরমের সমুদ্রসৈকতে কখনো দেখিনি। মাদ্রাজ-বম্বের মেরিনাতেও নয়।

আনন্দে সাঁতার কাটছিলাম। হঠাৎ অচিন্ত্য বললে, দ্যাখ্ ওই ভদ্রলোক তোকে সেই কখন থেকে সমানে লক্ষ্য করছেন।

নেকনজরে দেখছেন না তো? বলেই আমি আবার সাঁতার কাটতে লাগলাম। সমুদ্রস্নানের এমন চমৎকার প্রাকৃতিক অনুকূলতা বম্বের জুহুতেও নেই। আর কি না, এখন কে না কে আমায় ডাকছে বলে সাঁতারে বাগড়া দেওয়া! সেটি হচ্ছে না!

আশ্চর্য! যথার্থই ভদ্রলোক তখনো তাকিয়ে ছিলেন। পাশে তাঁর একেবারে কাছ ঘেঁসে একজন তরুণী। তাঁর ওধারে আর যিনি তিনি মধ্যবয়সী। ভদ্রলোকের পরনে সাঁতারের পোশাক, তরুণীটিরও তাই। কেবল মধ্যমার শাড়ী পরা, কপালে সিঁদুর।

ভদ্রলোক এমনভাবে তাকিয়ে ছিলেন, হঠাৎ তাঁর চোখের ভাবে কেমন যেন মনে হল, তিনি ডাকছেন। এ অনুমানের সত্যাসত্য যাচাই করতে একটুখানি ওদিকে এগিয়ে যেতে তিনিও কিছুটা এগিয়ে এসে পরিষ্কার অক্স্‌ফোর্ডের টানে ইংরেজীতে বললেন, আমরা কোথায় এর

আগেও মিলেছি বোধহয়। আপনি কি কখনো মহাবলীপুরম গেছলেন ?

এক লহমায় মনে পড়ল, তাই বলতে হয়, সেই যাঁদের চূর্ণ কথার ইসারায় কাঞ্চীর সমুদ্রসৈকতে ছুটেছিলাম, যাঁরা চিঙ্গেলপেট থেকে একই বাসে আমার সহযাত্রী ছিলেন, যাঁদেরকে পাণ্ডবরথের পাশের ঝাউবীথিকায় ছেড়ে এসেছিলাম, আজ এত দূরে আর এক সমুদ্রের জলে ফিরে পেলাম।

আমরা আলাপ করছি দেখে মধ্যমা মহিলাটি আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন। তাঁর কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুরের ফোঁটা দেখে অচিন্ত্য আর সবুর করতে না পেরে বলেই বসলে, আপনি নিশ্চয়ই বাঙ্গালী ?

হ্যাঁ, কেন বলুন তো, কি করে চিনলেন ?

যে দেশের মাটিতে জন্মেছি তার প্রভাব কেউ কি ভুলতে পারি ! যেমন আপনিও পারেননি। আপনার ওই সুন্দর সিন্দুরের ফোঁটা সাক্ষ্য দিচ্ছে, বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ের দখলী স্বত্ব ওটা।

আপনি তো চমকার বলেন, দাঁড়ান আমার মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হবে।

বলেই ভদ্রমহিলা নাম ধরে পরিষ্কার ইংরেজীতে তরুণীকে ডাকলেন, চিত্রা এদিকে এসোনা।

চিত্রা এসে ভদ্রলোকের পাশে একেবারে গা ঘেঁসে চিত্রবৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গীতে আমরা প্রমাদ না গণে পারলাম না। ভদ্রমহিলা আর কি করেন, তিনিও মৃদুস্বরে বললেন, ওকি !

কিন্তু ভদ্রলোক প্রবল হাসিতে মহিলাকে নিরস্ত করে আমাদের কাছে জানতে চাইলেন, আমরা গভীর সমুদ্রে সাঁতার কাটতে জানি কিনা। সে অভিজ্ঞতা নেই শুনে সগর্বে বললেন, চিত্রা আসছে অক্টোবরে ফরেন সার্ভিসে সাগর পাড়ি দেবে, ও বেশ সমুদ্রে সাঁতার কাটতে পারে। বলেই মেয়ের হাত ধরে দুজনে দূর সমুদ্রের পানে এগিয়ে গেলেন।

মাসিমাকে পুরুতমশাইর হাতে সঁপে দিয়ে আমরা একরকম নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু পূজোর আর কতক্ষণ দেখবার জন্যে ফিরে

তাকাতেই দেখি তিনি পিতৃপুরুষের তর্পণ মন্ত্র জপ করতে করতে রত্নাকরের বিশাল বক্ষ লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছেন। সে সময় তাঁর প্রায় সম্মোহিত অবস্থা। সমস্ত রাত্রি জলটুকু পর্যন্ত মুখে দেননি, এখন বেলা এগারোটা প্রায় হবে, এখনো তাঁর তর্পণ। দেহ থেকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা উধাও হয়ে গেছে। প্রৌঢ়ত্বের শীর্ণতায় বিশ্বাসের দ্যুতি লেগে নিমীলিত চোখমুখে যেন জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে।

সেই না দেখে আমাদের পাশের মহিলাটি বিমুগ্ধকণ্ঠে বললেন, এ জিনিস দুনিয়াতে আর কোথায় বা আছে!

তাই পাশাপাশি পিতৃপুরুষের তর্পণ চলেছে। কারো বা কয়েক মিনিটে তর্পণ শেষ, কারো লাগছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একজন বয়স্ক লোককে এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, ঘণ্টার হিসাব টঙ্কায় মশায়! বলেই একটু মুচকি হেসে ফের শুরু করলেন, এই দেখুন না, সওয়া পাঁচ আনায় পাঁচ পুরুষের স্বর্গবাসের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে তবে স্নান সারছি। আর ওই দেখুন প্রৌঢ়াকে, এমন ফাঁসান ফাঁসিয়েছে, কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল, স্বচক্ষে দেখলাম দু দুবার জলে ওঠানামা হল, তবুও কি তর্পণ শেষ হয়! শেষ হলে খবর নেবেন আঁচল কেটে ক'টাকা নেয়। কিন্তু দেখবেন, এ শর্মার পাঁচ পুরুষ সওয়া পাঁচ আনায় উদ্ধার পেলেও ওনার এক পুরুষ বৈকুণ্ঠের বহির্দ্বার দেখতে পাবে কিনা সন্দেহ। মশায়, গরুর চামড়া বেচে সেই পয়সায় তীর্থ করছে যে শর্মা তার চোখে ধুলো দেওয়া কোনো আইয়ার বামুনের কম্ম নয়। হত কোন চামার, সে বমাল ঠকান ঠকিয়ে নিলেও কথা ছিল না।

সেতুবন্ধ থেকে ফেরার পথে মাসিমার সঙ্গে আলাপ হল চিত্রার বাবার। ভদ্রলোক বেশ হাসিখুশী, তিনি আমাদের সঙ্গে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় কথা আর ইংরেজীতে হাস্য-পরিহাস চালাতে লাগলেন। কখনো বা চিত্রা তপ্তবালুতে পা দিয়ে ছিটকে কার যে গায়ে পড়েন ঠিক নেই। অমনি পিতায়-কন্যায় রহস্যময় হাসির আদান-প্রদান হয়। আমরা কেমন থ খেয়ে যাই।

ইন্দো-সিলোন এক্সপ্রেস ধনুষ্কোটি পৌঁছে গেছে। ওই গাড়ীতে ছাড়া আপাতত আর কোন গাড়ীতে ফিরতিপথে প্রথম শ্রেণীর কামরা অমিল। তাই কিছুটা পথ ওতেই ভদ্রলোক যেতে চান। আমাদের আপাতত যে কোন প্রকারে রামেশ্বরম পৌঁছানো চাই। কাজেই কোন্ শ্রেণীর কামরায় চড়লাম না চড়লাম, সে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। হুদিকে হু'দলের পথ। বিদায়ক্ষণ ঘনিয়ে এল। ভদ্রলোক হাত এগিয়ে দিলেন। করমর্দনে বিদায়রীতি সাঙ্গ হলে সহাস্যে বললেন, আবার দেখা হবে।

অদূরে মহাম্বুধিসৈকতে নোঙর করেছে যাত্রীজাহাজ। ওই জায়গাটাকে বলা হয় 'ধনুষ্কোটি পায়ার'। ধনুষ্কোটিকে তামিলে আবার বলে, ধনুষ্কোড়ি। ধনুষ্কোড়ি পায়ার থেকে ভারতের যাত্রী নিয়ে জাহাজ যায় সিংহলের তলাইমান্নার পায়ার পর্যন্ত। সেখান থেকে রেলে কিছুদূরে গেলে কলম্বো ফোর্ট।

আমাদের ফিরতিপথে সেই একই দৃশ্য। কেবল তফাতের মধ্যে, মধ্যদিনের অগ্নিবর্ষী সূর্য বালুতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। হু হু করে আগুনে হাওয়া ছুটছে দিক হতে দিগন্তরে। দূরে সমুদ্রের কোন দ্বীপে নারিকেল-কুঞ্জের সবুজ সমাবেশ বারেক চোখে পড়ে গাড়ীর গতির অন্তরালে পড়ে গেল। কোথাও কোথাও কেয়া ঝাড় কেয়াগন্ধে যাত্রীদের স্বাগত জানালো।

সহসা আকাশ বাতাস মুখরিত করে আওয়াজ উঠল, জয়, রামচন্দ্র কী জয়! জয় জয়, জানকী মাঈ কী জয়! জয়, রামেশ্বরজী কী জয়!

॥ ২২ ॥ সেতুবন্ধ রামেশ্বর

এ জয়ধ্বনি যাবার পথে তেমন শুনিনি। হয়তো ভক্তদলে তখন জয়ধ্বনির মূল উদ্গাতা ঘুমিয়ে ছিলেন কিংবা তাঁর উৎসাহ তখন এখনকার মত জেগে ওঠেনি।

পামবানে গাড়ী থামতে কয়েকজন প্লাটফরম্ থেকে চীৎকার ছাড়তে লাগল, রামেশ্বরজী কো দেখনা, ইহাঁপর উতর জানা।

ওপারের প্লাটফরমে রামেশ্বরের গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। মাত্র সাত মাইল পথ, পামবান থেকে রামেশ্বরম। মধ্যে পড়ে একটি স্টেশন, তাঙ্গাচিমাড়ম্।

আমরা প্লাটফরমে না নামতেই সকালের সেই পাণ্ডানিন্দুক সহাস্যে এসে হাজির। তিনি অগ্রণী হয়ে মালপত্তর কুলি দিয়ে নামিয়ে রামেশ্বরমের গাড়ীতে তুলে দিয়ে এমন বহালতবিয়তে সেগুলি আগলাতে শুরু করলেন যেন ওগুলিতে আর কারো স্বত্ব-স্বামিত্ব নেই, কোনকালে ছিলও না।

রামেশ্বরের গাড়ী চলতে শুরু করতেই মনে কত না পুলক অকস্মাৎ ঝলকে ঝলকে জেগে উঠতে লাগল। শিশুকালের ছোটদের ইতিহাসে দক্ষিণের বিরাটাকার মন্দিরের ছবি দেখা অবধি মনে মনে যে বাসনা এতকাল লালিত হয়ে এসেছে, এতদিনে তা পূর্ণ হতে সন্দর্শনে চলেছি। যেখানে সন্ন্যাসী শ্রীধর গঙ্গোত্রীর বারি রামেশ্বরের শিরে চড়াতে এসেছিলেন, মন্দিরে মহাপ্রভু প্রেমাবতার প্রেমবশে মত্ত হস্তীসম নৃত্য করেছিলেন, যে আর কিছু পরে তারই দ্বারে আমিও উপস্থিত হব! এ দুর্লভ সৌভাগ্য লাভের পথে এগিয়ে চলায় বুক যে কেমন দুরুদুরু করে!

রামেশ্বরম স্টেশনে নেমে বাইরে আসবার পথে কেউ বলে, কড়ি নেবেন, কড়ি। কেউ হেঁকে যায়, ছবি চাই তো ছবি পাবেন। এক্ষুনি না নিলে পরে পস্তাবেন। কেউ বা ডাকে, কড়িতে নাম লেখাবেন। আর একদল টাঙ্গাওয়ালা টানাটানি করে, আমার টাঙ্গায়, আমার টাঙ্গায় আসুন না মা!

স্টেশনের বাইরে ধুলোবালির চিরস্থায়ী জমিদারী। পথ একটি আছে বটে, সে প্রায় সেকালের সুদিন থেকে একালের কাঙ্গালীচরণের ভাঙ্গা ভিটের টিমটিমে শিবরাত্রির সলতেতে এসে ঠেকেছে। তারই বুকের উপর দিয়ে টাঙ্গায় নয়, সারস্ত বলদের গাড়ীতে চলতে চলতে কেবল যে একটানা এক বুকফাটা আর্তনাদ শুনছিলাম তাই নয়, নিজেদের সারা দেহও সেই সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠছিল।

পথের দু'পাশে প্রায়-পরিত্যক্ত চোলট্রি আর ধর্মশালা। আকারে আয়তনে পুরী, গয়া, কাশীর ধর্মশালার কাছে এগুলি নেহাৎই ছোট। শুধু ছোট হলে কথা ছিল না, আজকাল এতে যাত্রীর পদধূলি কালেভদ্রেও পড়ে কিনা সন্দেহ। এখানে ওখানে দুইচারটে চা-কফির দোকান। সে একরকম বাঙলাদেশের গণ্ডগ্রামের দোকানগুলির পর্যায়ের।

এই যেখানকার রাজপথের ও দোকানপাটের স্বরূপ সেখানে রামেশ্বরের আর যে রূপই দেখা যাক, তার ঐশ্বর্যরূপ নিশ্চয়ই বৈভবে মণ্ডিত দেখবার সম্ভাবনা সুদুর্লভ!

যে লোকটি পামবান থেকে আমাদের সঙ্গ নিয়েছিলেন রামেশ্বর বাজারের মাঝখানে এক দ্বিতল দালানের দরজায় গাড়ী দাঁড় করিয়ে বললেন, নামুন এখানে। দেখুন কি চমৎকার হোটেল ঠিক করে রেখেছি। এক এক কামরা যেন এক একটা বাড়ী। এমন সুবিধা সারা মুল্লুক ঢুঁড়লেও পাবেন না।

তখনো আমার মনে রামেশ্বরমের কাল্পনিক বিরাটত্বের মোহ ভরপুর। চোখ মেলা, তবু যেন কল্পনার নয়নে দূর বাংলার এক বর্ধিষ্ণু পল্লী থেকে পরিষ্কার দেখছি, ঊর্মিমুখর সমুদ্রের সঙ্গীতে দিনরাত্রি রামেশ্বরের বন্দনাগান ধ্বনিত হচ্ছে। আর শিলাসঙ্কুল সমুদ্রতট থেকে উঠে এসেছে অভ্রংলিহ মহামন্দির। এত বিরাট যার সুবিস্তীর্ণ অলিন্দ; তার অভ্যন্তর, তার শিখর না জানি কত বিশাল, কত বিরাট! মহামন্দিরের আশপাশে বহুদূরব্যাপী শহরের কল্পনায় সহস্র সহস্র পণ্যবিপণির সারি, তারই ভেতরে-বাইরে দোরে-সুমুখে পথে কত না অজস্র নরনারীর বিরামহীন

শোভাযাত্রা ভেসে চলেছে নয়ন-সম্মুখে। তাই বোধ হয়, আচ্ছন্নের মত দালানের দ্বিতলে উঠে গেছলাম নেহাৎই একটি বার না দেখলে নয় বলেই। কিন্তু যে কামরা দেখলাম, সদ্য তৈরী বটে, তবে বাড়ী তো বাড়ী, তাকে পায়রার বৃহত্তর সংস্করণ বললেই চলে।

অপছন্দ জানিয়ে দিতে লোকটি তাঁর কার্ডখানি হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এ যদি পছন্দ না হয়, আর কোথাও দেখাবার যুগ্যি জায়গা রামেশ্বরে নাই।

এতক্ষণে বাস্তবের কঠিন রাস্তায় নেমে এলাম। যেখানে গ্র্যাণ্ড, তাজ, ব্রিস্টল, ভিক্টোরিয়া না হোক, অসংখ্য মাঝারি হোটেলের সারি সারি সমাবেশ কল্পনা করে এসেছিলাম, সেখানে এই যদি সেরার নমুনা হয়, তবে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে নিঃসংশয় আর নাইবা হলাম!

কি করবেন করুন। যাই করুন এই বামনরাও মধুকর যোশীর বায়না করা কামরার মতন ভাল জায়গা আর কোথাও যদি পান, আমার নাম ফিরিয়ে রাখবেন।

অগত্যা সেখানেই আস্তানা নিতে হল। তবু মন্দের ভাল, পাশেই পরিষ্কার কফি-হোটেল ছিল। সেখানে খাবারও পাওয়া যেতে পারে। শোনা গেল, আসল হোটেল ওইটিই, তার অনুপূরক হিসাবে এটি একই তরফ গড়ে তুলেছেন। বোর্ড যখন রয়েছে, লজ রাখলে লাভের কড়ি ক্রমশঃ বাড়তেই থাকবে! না, এদের হিসাব বেশ পাকা!

আমরাও ক্রমে ক্রমে আর কিছু না-হোক, থাকবার খাবার জায়গা ছুটির বেলায় বেশ হিসেবী হয়ে উঠেছি। কারণও আছে, এক—এখনও বহু পথ ঘুরতে বাকী, আর এক—সঙ্গের প্রৌঢ়া মহিলাটি প্রায়ই প্রচণ্ড উপবাস দেন। তারপর হোটেল শুনলেই বলে বসেন, না অচিন্ত্য, আমার ক্ষিদে নেই। একে বিধবা রমণী তীর্থ করতে এসেছেন, তায় অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শুদ্ধ-চেতা। যেখানে-সেখানে যা তা মুখে তুলতে পারেন না। তবু যেভাবে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ

খাইয়ে নিচ্ছেন, সে নিঃসন্দেহে সকলের প্রশংসার যোগ্য। তা হলেও আমাদের একটা কর্তব্য তো রয়েছে।

ঘরের মধ্যে গুছিয়ে বসতে পারিনি অমনি কয়েকজন এসে হাজির, ডাব চাই কিনা। তাদের হাত থেকে পরিত্রাণই পাওয়া যায় না। যত বলি দরকার নেই, ওরা ততই চেপে ধরে, বাবা মা, একটা ডাব খান না। সকাল থেকে এখনও পর্যন্ত বহুনি হয়নি। মুখে তাদের এত কাতর ধ্বনি, মনটা আপনা থেকে আর্দ্র হয়ে আসে। কিন্তু কার ডাব কিনি। লোক যে তিন-চারজন।

বামনরাও মধুকর যোশী, তিনি সহায় হলে পর সবি সম্ভব। অগত্যা তাঁকেই অনুরোধ জানালাম, আপনি এর একটি উপায় করুন মহারাজ।

ভিখিরীকে ভিখিরী তাড়াতে বললে হয়তো এর চেয়ে বেশী ফল হত না, যেমনটা হল বামনরাও-এর বেলায়। চোখের পলক পড়তে না পড়তে দেখি ডাবওয়ালারা উধাও! তারপর কেখন এক সময় একজন মাত্র ডাবওয়ালা ডাব নিয়ে এল এবং সে-ই ডাব বেচলো, পয়সা পেলো। যোশীমশাইকেও পরিতুষ্ট করতে মাসিমার ভুল হল না।

ডাবওয়ালা, কড়িওয়ালা, গাড়ীওয়ালা, টাঙ্গাওয়ালা মায় দুধওয়ালা এসে হাজির। কেবল যোশীমশাইর কল্যাণে সিঁড়ির মাথা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে স্বর্গের পথে এগিয়ে দেওয়ার দৈবক্ষমতাওয়ালা পাণ্ডারা একে একে এসে পিছিয়ে গেল। অন্য সবার কপাল ভাল ছিল। প্রত্যেকের কাছ থেকে কিছু-না-কিছু প্রাপ্য লাভের পর ভাবী প্রাপ্তির আশা নিয়ে ফিরলে পরে, বামনরাও মধুকর যোশী নেহাৎই সরল হেসে করজোড়ে আমাদের কাছে একটি পরম কামনা প্রকাশ করলেন, মাসিমার সঙ্গে একান্তে তিনি ক'টি কথা বলবেন।

কথা আর কি, তাঁর এখন সেরা পূজারী সেজে বসার ব্যবস্থাটা পাকাপোক্ত করে নেওয়া। আমাদের অনুমান যে ভুল নয় তার প্রমাণ পেতে দেরি হল না। কিছুক্ষণ বাদেই অচিন্ত্যচরণের ডাক পড়ল

পরক্ষণেই আমাকেও যেতে হল। গিয়ে শুনি, মাসিমা কত কমেই না রামেশ্বরের পূজোর চুক্তি করে ফেলেছেন। যোশী মহারাজ মাত্র একান্ন টাকায় গোটা পুজোটা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করতে রাজী হয়েছেন, এতে আমাদের কোন আপত্তি আছে কি না।

আমরা সমস্বরে জানিয়ে দিলাম, মোটেই না।

বেলা পড়ে এলে দিনের আলো থাকতে থাকতে আমরা যেই না পথে পা দিয়েছি, আর যাব কোথায়! কোথা থেকে ভিখিরীর দল ছুটে এসে মাছির ঝাঁকের মত ছেঁকে ধরলে। এরা সব ক্ষুদে ভিখিরী। মুখের দিকে তাকালে মায়া হয়। মন বলে, মা-বাপ এদের কেমন করে পথে ছেড়ে দিলে! যেমন করেই দিক, দারিদ্র্যের দুঃসহ দহনে মাতৃস্তন্য শুকিয়ে গেলে কে আর কাকে ঘরে রাখে!

পশ্চিমের গোপুরম পেরিয়ে প্রকারমে প্রবেশ করতেই চোখের সামনে যে দৃশ্য ভেসে উঠল কোথায় তার তুলনা! সুদীর্ঘ, সুপ্রসারিত, আচ্ছাদিত, ভাস্কর্যের অলঙ্করণে অলঙ্কৃত এখানকার অলিন্দ অনিন্দ্য-সুন্দর।

একবার চারিদিকের অলিন্দ প্রদক্ষিণ করতে হলে অসংখ্য স্তম্ভগাত্রের মনোরম ভাস্কর্যের প্রতি প্রতিনিয়তই দৃষ্টি পড়তে থাকে। সুবিস্তীর্ণ সুবিশাল অলিন্দপথের দূরত্ব যাতে পরিপূর্ণরূপে প্রতি চক্ষে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, সেইজন্যে অলিন্দের আচ্ছাদন অর্থাৎ ছাদ খুব উঁচু নয়। বিশাল বিস্তীর্ণ ছাদটি কিছুটা নীচু হওয়ায় আগাগোড়া দূরত্বটা কেবল সুস্পষ্টই নয়, সুদূর বলেও মনে হয়।

পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবেশ করলে দু'পাশে হরেক রকমের দোকানপাট দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাদের উপেক্ষা করে আমরা মন্দিরের অলিন্দ প্রদক্ষিণ করতে এগিয়ে গেলাম পশ্চিম থেকে উত্তরে। এই উত্তর-অলিন্দ দৈর্ঘ্যে ছ'শত বিয়াল্লিশ ফিট, প্রস্থে পনেরো ফিট ছয় ইঞ্চি। এরই সমান্তরাল দক্ষিণ অলিন্দ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে একই মাপের। কিন্তু পূর্ব এবং পশ্চিম অলিন্দের দৈর্ঘ্য নয়, প্রস্থে কিছুটা কম-বেশী রয়েছে। তা হলেও

প্রকাণ্ড অট্টালিকা-প্রকারমের প্রস্থ পূর্ব-পশ্চিমে অভ্যন্তর থেকে তিনশত পঁচানব্বই ফিট। অবিশ্যি গোটা অট্টালিকা যে চতুষ্কোণের উপর শতাব্দীর পর শতাব্দী দাঁড়িয়ে, তার দৈর্ঘ্য হাজার ফিট এবং প্রস্থ প্রায় ছ'শত ষাট ফিটের কাছ ঘেঁসে যায়।

বিশালতায় এই চতুষ্কোণ গৃহের তুলনা তুনিয়ার আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। একালের আকাশচুম্বী অট্টালিকা, বহুব্যাপ্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান সুবিশাল ইমারতের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে না, আমরা বলছি ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের কথা। কেবল আমরাই নই, বহু বিদেশী রামেশ্বরম মন্দির-প্রকারমের অকুণ্ঠিত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সে প্রশংসা শুধু এর সুবিশালতারই নয়, স্থাপত্য-ভাস্কর্যেরও।

॥ ২৩ ॥ রামেশ্বরের মন্দির অঙ্গনে

পরের দিন !

আজকের সকাল এক অদ্ভুত সকাল। এমন এক মন্দির দেখে শেষ করতে হবে যার নেই শেষ। যে-মন্দিরের কবে প্রতিষ্ঠা সঠিক কেউ জানে না, মহত্ত্ব যার সারা ভারতের সকল মন্দিরের সেরা।

লগ্ন-বিবাহমণ্ডপে বেশ সকালবেলাতেই পৌঁছেছিলাম। সেখানে দেবতাদের কাউকে কাউকে দর্শন করে আরো কিছু দেখব ভাবছি, ঠিক সেই মুহূর্তে যোশীজী বললেন, আগে চলুন, রামকুণ্ডে সোজা।

পথ প্রায় মাইলখানেক। পথে আসতে যেতে পুণ্যতোয়া কুণ্ডের সংখ্যা কম নয়। পুরোপুরি পুণ্য করতে হলে, যোশীমশা'র কথায়, সকল কুণ্ডে স্নান তর্পণাদি করা চাই। অতএব তাড়াতাড়িতে যাতে আসা-যাওয়া সম্ভব হয়, সেই জন্যে টাঙ্গার ব্যবস্থা করা হল। আমাদের নিয়ে টাঙ্গা যেই না যাত্রা করেছে, অমনি রামেশ্বরের পথ রোগীর মত যন্ত্রণায় তীব্রস্বরে ছটফট করতে শুরু করে দিলে। সে যেন বলছিল, পিতৃপুরুষের তর্পণ যে করবে, তার আগে এ মৃত্যুপথযাত্রীর যন্ত্রণার একটা বিহিত তো কর !

টাঙ্গায় চড়ে যাচ্ছি। অবশেষে কুণ্ড এলো। কোন্‌কালে কোন্ রাজা মহারাজা মাঝারি এক পুকুর কাটিয়ে চারটি পাড় তার উপর থেকে তলা পর্যন্ত পাথরের সিঁড়ি দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। যে কালেই দিন, তখনকার দিনে এ রামেশ্বরে নিত্য না হোক, সুদীর্ঘ ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর সত্যিই বৃষ্টি নেমে আসত, আগামী স্নিগ্ধ প্রাচুর্যের সম্ভাবনা নিয়ে। নীরস মাটিকে সরস করে তুলত। পাড় বাঁধানো পুকুরের সর্বোচ্চ ধাপে জল করত টলমল।

কিন্তু আজ চার পাড়ের শেষ সিঁড়ির সন্ধানে শরৎকালেও জল নেমে চলেছে। আর কি জল ! হোলি খেলায় রঙের পিচ্‌কারিতে গোবর-গোলা যেমন বেমানান, এখানে এই লক্ষ্মণকুণ্ডে গাঢ় বিবর্ণ নীল ছ্যাৎলা-

ওয়ালা জল ঠিক তেমনি। স্পষ্ট অনুমান হয়, সুদীর্ঘ কাল এদিকে মাটির প্রেমিক পুষ্করমেঘ ফিরেও তাকায়নি।

তবু 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর'! এখানে যাঁরাই আসুন, বিজ্ঞানী কি অবিজ্ঞানী হোন, কেউ বিজ্ঞানের চশমা পরে কুণ্ডের দিকে তাকান না। বরং চোখের এবং মনের দিগন্তে কল্পনার বেলুনটাকে বাধা-বন্ধহীন ভাবে উড়িয়ে দেন। তাই যা কিছু পাণ্ডা-পুরুতে বলে তারই বিশ্বাসের পরিমাপে প্রাণমন স্নিগ্ধ করে নিতে চা.ঃ।

সুতরাং লক্ষ্মণকুণ্ডের জল রঙের দুর্লক্ষণে যতই পুষ্করের নিষ্ঠুরতার কীর্তি জাহির করুক, এইখানে যে শ্রীরামলক্ষ্মণ একদিন পিতৃদেব দশরথের তর্পণ করায় তিনি স্বর্গলাভ করেছিলেন, সে কাহিনীর কীর্তি এতটুকুও ম্লান হয় না। তাই দেখা যায়, বুদ্ধি বিচার বিশ্লেষণের দৌড় ক্ষণিক থামিয়ে কত কত নর নারী বিশ্বাসের কোলে আপনাকে এলিয়ে দিয়ে কি এক অদ্ভুত অনুভবের আবেশাচ্ছন্ন বিশ্রাম ভোগ করে নিতে চায়।

অস্বীকার করে লাভ নেই, কুণ্ডের জলের রঙে যাঁদের আপত্তি, যাঁদের বোধবিচারে ওই জলে নামতে বাধে, তাঁরা জলের দুটি ছিটে মাথায় নিয়ে যাতে অনায়াসে পুণ্যকাজ সেরে পিতৃপুরুষদের স্বর্গে পাঠাতে পারেন, তার ব্যবস্থা পাণ্ডাঠাকুরদের পকেটেই রয়েছে।

আর কি অদ্ভুত আকর্ষণই না লক্ষ্মণকুণ্ডের গাঢ়নীল বিবর্ণ জলের প্রতি সারা দেশের সাধারণ মানুষদের। কুণ্ডের মধ্যখানে যে জলবিহার-মণ্ডপ, তারই বেদীতে চড়ে কেউ কেউ মত্ত উল্লাসে জলে ঝাঁপ দিয়ে পুণ্যের মাত্রাটা বাড়িয়ে নিতে চাইছে। ঝাঁপ দেওয়াটা পাড়ার মেয়েছেলেতে দেখে গিয়ে দেশে ফিরে যাতে দশের ভীড়ে তারিফ করতে পারে, তাই একজন বলিষ্ঠ পুরুষ প্রতিবার লাফ দেবার প্রাক্কালে তারস্বরে চীৎকার করে উঠছে, প্রেমাবাঈ, দেখলবা……।

ওদিকের সিঁড়িতে সারে সারে গ্রাম্য নরনারী কাপড় কাচছে। কুণ্ডের স্নানে যখন এতই পুণ্য, তখন তার জলে কাপড় কেচে নেবার

পুণ্যাধিক্যটা ছেড়ে আর লাভ কি! বিশেষ যখন আপত্তি করবার আশঙ্কা কোন দিক থেকে নেই, তখন এক ঢিলে দুই পাখী মারতে কে না চায়!

লক্ষ্মণকুণ্ডে পুণ্যকর্ম সেরে মাসিমা উঠে পড়লেন। ফেরবার মুখে সীতাকুণ্ডে নামা হল। এখানেও স্নান করাতে পুণ্য। কিন্তু স্নানে যাদের অরুচি কিম্বা আপত্তি, তাদের জন্যে পাণ্ডাশাস্ত্রে মাথায় জল ছিটিয়ে পুণ্যার্জনের বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে। মাসিমা সে ব্যবস্থায় খুশী হয়ে একটু হাসলেন। যেন বলতে চাইলেন, যোশীঠাকুর, এইভাবে মন জোগাতে জোগাতে পাণ্ডা-পুরাণের বিধান সব কোন্ রসাতল পর্যন্ত নামতে চলেছে তার খোঁজ না নিলে পরে সবাই পস্তাবে।

পথের দুপাশে ছোট বড় পুষ্করিণী। এখানকার হিসাবে এর প্রত্যেকটার সঙ্গে রামায়ণোক্ত কারো না কারো কেবল নামেরই নয়, ধর্মকর্মেরও যোগ আছে। পুরাকাহিনীর চুটকিতে চিত্ত যাঁদের সদা রসস্থ, তাঁদের চোখেও এটি এড়াবার নয় যে, বহুকালের ঘাট বাঁধানো এই কুণ্ডগুলির বুক ভরে এককালে গভীর জল টলমল করত। তখন যে রামেশ্বরে বারিপাতের অপ্রাচুর্য ছিল না এখানকার পর পর এতগুলি পুষ্করিণী তারই প্রমাণ। কবে থেকে পুষ্কর মেঘের অকৃপণ দাক্ষিণ্য এদের প্রতি বিমুখ হয়েছে, সে ইতিহাস কোন আবহাওয়াতত্ত্ববিদ্ সংগ্রহ করে যে রাখেননি এ আশঙ্কা অহেতুক নয়।

যোশীজী আমাদের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল এক নিরবচ্ছিন্ন স্বাচ্ছন্দ্যের বিমানপথে স্বর্গলোকে চালান করবার মানসে সোজা কল্পবৃক্ষের রাজ্যে এসে হাজির হলেন। এ রাজ্যের এক পাশে প্রকাণ্ড এক পুষ্করিণী, প্রায়-স্বচ্ছ সলিলে টলমল করছে। তারি অদূরে কল্পবৃক্ষের দুর্লভ সমাবেশ। কল্পনা অনেক সময় অস্বাভাবিক রঙীন হয়। কিন্তু সে যে রঙের চেহারা এমন নির্মমভাবে ব্যাহত করে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ায়, এর আগে আর কখনো তার পরিচয় এমন ভাবে ঘটেনি, যেমনটি ঘটল সেই কল্পবৃক্ষের কাছটাতে। কবিতায় ছন্দপতন কি আর বেমানান, একটু কেবল কানে

কেমন শোনায়—বই তো নয়! কিন্তু এক নারিকেলকুঞ্জের কোন একটি নারিকেলগাছকে কল্পবৃক্ষ বলে তার গায় সুতো জড়িয়ে জড়িয়ে সকল কামনা বাসনাকে বাঁধতে চাইলে বড় বিসদৃশ ছন্দপতন ঘটে না কি!

যোশীজী কৃত্রিম সুরে মন্ত্র পড়ে নারিকেল গাছে মন্ত্রপূত সুতো জড়াচ্ছেন আর মাঝে মাঝে বলছেন, চেয়ে নিন, এই বেলা। যা চাবেন তাই পাবেন। দুর্ভাগ্য সৌভাগ্য হয়ে, ধুলে মুঠো সোনা হয়ে ঘরে আসবে, মা।

মন্ত্র পড়া যোশীজীর তখনো শেষ হয়নি, এমন সময় কোথা থেকে এক রমণী হেকড়ে এসে তেড়ে উঠলো, কে রে আমার গাছে সুতো বাঁধে!

অমনি যোশীজী বললেন, দিন মা দিন, ওকে দু'আনা পয়সা দিন।

মাসিমা পয়সা দিলেন। যোশীজী কল্পবৃক্ষে সব কামনা প্রাপ্তির পারমিট আদায় করে সুতো জড়ানো শেষ করলেন। আর আমাদের চোখের 'পরে বৃক্ষের মালিকানী বাদুড়ে খাওয়া একটি পাকা তালের একপাশে দাঁত বসাতে বসাতে কল্পবৃক্ষের তাজ্জব ক্ষমতার খুবই যোগ্য প্রমাণ দিতে একটুও ভুল করলো না।

এখনো রামেশ্বরের পূজো বাকী। তারই উদ্দেশে চলছি। যোশীমশায় নয়, বলছেন এখন মাসিমা। মনের সমগ্র বিশ্বাস, তারই সঙ্গে হৃদয়ের বর্ণাঢ্য উত্তাপ মিশিয়ে মাসিমা বলছিলেন, জান অচিন্ত্য, আমার গুরুদেব বলেছেন, মন্দিরে রামেশ্বরের পূজার সময় স্বয়ং হনুমান এসে হাজির হন।

মরজগতে অচিন্ত্যচরণ বিশ্বাসের পুচ্ছটাকে অতদূর পর্যন্ত উচে নাচানোর পক্ষপাতী না হওয়ায়, হঠাৎ মৃদু প্রতিবাদে জানালে যে, সে কেমন করে হবে। হনুমান তো আজকার নয়, কোন্ সেই ত্রেতাযুগের।

হনুমান যে অমর, মাসিমা সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

তখনো মূল মন্দিরের গর্ভাক্ষের দরজা খোলা হয়নি। ওদিকে যোশীজীর চেলা ছোট্ট একটা টুকরিতে কয়েকটা কলা, একটু ধূপ, কয়েক

টুকরো নারকোলের ছোবড়া, আর ঘরে তৈরি কি এক আজব চীজের সামান্য একটুখানি নিয়ে এসে উপস্থিত।

কিন্তু গঙ্গোত্রীর জল! গঙ্গা ছিলেন মহেশ্বরের জটায়। ভগীরথ অনেক সাধ্য-সাধনায় পতিতপাবনীকে নিয়ে এলেন মর্ত্যে। আর শ্রীরাম রামেশ্বরে প্রতিষ্ঠা করলেন শঙ্করকে। সেই থেকে তিনি সবচেয়ে বেশী তুষ্ট গঙ্গা যেখানে মর্ত্যে নেমেছেন, সেই গঙ্গোত্রীর জলে। এখন কোথায় সে জল। মহা মুশকিল। মাসিমা তো ম্রিয়মাণ! তাঁর তীর্থফল বুঝি মাঠে মারা যায়!

সে কি হবার জো আছে। স্বয়ং যোশীমশায় বাৎলে দিলেন, এখানে মা পয়সা দিলে সবি মেলে। তবে জোচ্চুরিটি পাবেন না। সরকার থেকে পূজোর পর্যন্ত দাম বেঁধে দিয়েছে। এই যেমন দেখুন না, গঙ্গার জল দিয়ে অভিষেক করতে চান, তার দাম দু'টাকা। দুগ্ধ অভিষেকের অভিলাষ, দুধ শুদ্ধ তার টিকেট দেড় টাকা। অর্চনার মজুরী এক টাকা, 'নৈবেদ্যম্'-এর ফী দু'টাকা—এই তিনটি টাকা দিলে হয় পায়সম্, নয় চিনি কিম্বা তেঁতুল-ভাত ভোগ দেওয়া যায়। এই রকম দেড় টাকার অর্চনা থেকে রূপোর রথযাত্রা, যার দাম মাত্র পাঁচ শ' টাকা, সমস্তই সরকারের আইনে আগাগোড়া নিখুঁতভাবে বাঁধা। কারো আর একটুও এদিক ওদিক করবার জো নেই। কেউ এর একটুখানি নড়নচড়ন করুক দেখি, দেখবেন তখন, এই বামনরাও মধুকর যোশী বাবুদের দিয়ে মাদ্রাজ সরকারে এমন এক দরখাস্ত ঠুকে দেবে, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। জানেন না তো মা, আগে লগ্নবিবাহ-মণ্ডপে মন্দিরের পূজারীরা তাদের মেয়েমানুষদের পর্যন্ত হরপার্বতীর আসনে বসিয়ে বিবাহলীলার বিলাসী চালে কি বেয়াদপিই না শুরু করেছিল। অত বাড়াবাড়ি সয় কখনো! তাই বলি, ভালভাবে চল, গোলমাল বেলেল্লা-পনা ভুলেও করো না, দেখি কে তোমার টিকিটি ছুঁতে পারে! এ তো খেলা নয়, এর নাম দেবালয়!

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াতেও গর্ভগৃহের দ্বার মুক্ত না হওয়ায় অচিন্ত্যচরণ

তাগাদা দিতে লাগল। যোশীজীর উত্তেজনা একেই সপ্তমে চড়ে ছিল তায় তাঁকে উসকে দেওয়া হল। অমনি তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু একটুক্ষণেই শুধু সংযতই নয়, মিতবাক্ হয়ে উঠলেন। দ্বাররক্ষীর সঙ্গে তাঁর চোখের ইসারায় কি কথা হল। কিছু শোনা না গেলেও তাতেই আশ্চর্য কাজ হতে দেখা গেল।

কেবল দ্বার খোলানোতেই তার অবসান নয়, মন্দির বিগ্রহের খাস পুরোহিতও এসে হাজির হলেন।

পূজো শেষ হলে অবশ্যি আদালতের পেয়াদার নয়, হুজুরের চাপরাশীর মত দ্বাররক্ষী থেকে পূজারী ব্রাহ্মণ পর্যন্ত উপরি পাওনার প্রত্যাশায় হাত পেতে দাঁড়াল। সে দৃশ্য দেখে এ স্থানকে ইংরেজ শাসনের উৎকট অবদান কোন ব্যুরোক্রেসির খাসমহল বলে ভুল হওয়া কিছু আশ্চর্য ছিল না।

সত্যিই অত্যাশ্চর্য এ মন্দির। প্রার্থীর দলকে পদে পদে অতিক্রম করতে হয় বলে নয়, এ মন্দিরের কিছু অন্য পরিচয়ও রয়েছে। আদিতে যে আসল পরিচয় রামেশ্বর দেউলের, আজকাল তা-ই অন্য পরিচয়ে এসে দাঁড়ালেও, সত্যিকার পরিচয় সেটাই। যদিও নানাজনে, নানাভাবে, নানান অনাকাঙ্ক্ষিত কার্যকারণের নির্বিচার প্রয়োগে প্রতিনিয়ত এ মন্দিরের বিপুল বিস্তার-সৌষ্ঠবকে আবরিত করতে লেগে রয়েছে, তবু এক কালে সুস্থ সবল প্রাণবান জাতির বেপরোয়া নির্ভীক সৃজনপ্রীতির এ যেন এক ভাস্বর স্বাক্ষর।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—পৌরাণিক এ কালবিভাগ মানি বা না-মানি, রামেশ্বরমের মন্দির যে আজকার নয়, এমনকি বদ্রীকেদারের প্রপিতামহ বললেও এ মন্দিরকে বেমানান মনে হয় না, সে কথা অনেকেই বলেন। দক্ষিণ থেকে আচার্য শঙ্কর যে দিন হিমালয়ের গুহাকন্দরে তপস্যা করতে ছুটে গেছলেন—দিব্যজ্ঞান লাভের অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে, সে দিনও এখানে এই মন্দির তার বিপুল মহিমা ও বয়োগরিমা নিয়ে চিরযৌবনের ধ্বজা তুলে দাঁড়িয়েছিল।

নিকষ কালো পাথরে গঠিত রামেশ্বরের গর্ভগৃহের পাথর নাকি এসেছিল সমুদ্রপারের সিংহল থেকে। চল্লিশ ফুট দীর্ঘ সুন্দর কারুকার্য খচিত এক এক খণ্ড কালো পাথর এত চমৎকার, যা দেখলে দৃষ্টি আপনা থেকে স্নিগ্ধ হয়ে আসে। এই পাথরে গর্ভগৃহ গড়ে তোলার বহু আগে থেকেই এস্থানে আদি মন্দিরের অবস্থিতি অনৈতিহাসিক কাহিনী মাত্র নয়।

কিন্তু ইতিহাস নিয়ে কারবার করুন ঐতিহাসিকেরা। আমরা ততক্ষণে মন্দিরের অভ্যন্তরে চার কোণে যে দ্বাবিংশ কুণ্ড যুগযুগান্ত থেকে বর্তমান, তাদের দর্শন সেরে আসি।

সমুদ্র বেশী দূর নয়। দেবজয়ী দশাননের দুরাশা ছিল, লবণসমুদ্র ছেঁচে মান্নারে ক্ষীরসাগর বইয়ে দেবার। কিন্তু—

"চৌদ্দ চৌযুগ আয়ু লঙ্কার রাবণ।
তেহোঁ সে মজিয়া গেল সীতার কারণ।"

তাই যেখানকার লবণসমুদ্র আজো সেখানে পড়ে। অথচ তারই অদূরে কয়েক শত গজের ব্যবধানে মন্দিরের কুণ্ডে কুণ্ডে স্বাদু জলের জীবন্ত ধারা। কুণ্ডগুলি যে একদিন বা এক যুগের একত্র খননের ফল নয়, সে সত্য আবিষ্কারের জন্যে কমিশন বসাবার দরকার পড়ে না। সাধারণ দৃষ্টিতে অনায়াসে ধরা পড়ে, সেকালে মন্দিরের ঐশ্বর্য-সম্পদ্ ক্রমাগত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, এখানে একটানা দীর্ঘকাল বহু থেকে বহুতর মানুষের একটি আশ্চর্য সমাবেশ গড়ে উঠেছিল। তাদের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের সার্থকতম আবিষ্কার রামেশ্বর-মন্দির-অভ্যন্তরের একটি দুটি নয়, বাইশটি জলকীর্তি। এরই মধ্যে মন্দিরের অন্দর-অঙ্গনে যে সর্বতীর্থ কুণ্ডটির মুখ মানুষের হাতে পাথরে বাঁধাই, তার জলও স্ফটিকের মত স্বচ্ছ! অথচ এটিকে দেখতে মহানগরীর যে কোন ম্যানহোলেরই মত। এখানে বৈজ্ঞানিকের অন্তরর্ভেদী দৃষ্টি ধর্মপিপাসার প্রয়োজনের পক্ষে এসে মিলেছে। হয়তো যেদিন এই মিলন সর্বপ্রথম বিক্ষিপ্ত হতে থাকে সেদিন থেকেই মন্দিরের শক্তি সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ হতে শুরু করে। আজ সে সংকীর্ণতার আর যেন আড়াল নেই।

অসংখ্য দেবতার সমাবেশে দর্শকের ঘন ঘন দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায় এখনো। ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মীকে সেকালের সম্পদ্‌শালীরা এখানে অষ্টমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। লক্ষ্মী হলেন বীরভোগ্যদের সহায়, তাই তিনি বীরলক্ষ্মী। সেকালের ঐশ্বর্যের বেশীর ভাগ এসেছে বীরদের বাহুর জোরে, সুতরাং লক্ষ্মী যাঁদের বীরত্বেবই নন অমিত ঐশ্বর্যেরও সহায়ক তাঁরা মান্য করেছেন ঐশ্বর্যলক্ষ্মীকে। এমনি ভাবে জয়দায়িনী লক্ষ্মী হয়েছেন জয়লক্ষ্মী। তাঁরই কল্যাণে ধনধান্যে পূর্ণ দেশ—কাজেই এলেন ধনলক্ষ্মী ও ধান্যলক্ষ্মী। এতই যখন লক্ষ্মীদেবীর মহিমা, তখন তাঁকে গজের উপরে বসাতে দোষটা কিসে। তাই আমরা পেলাম গজলক্ষ্মী। সবি তো পেলাম, কিন্তু যাবার বেলায় এসব দিয়ে যাব কাকে! মহা মুশকিল! লক্ষ্মীর কৃপায় সন্তান লাভ হলে মুসকিল আসান। অতএব এ মন্দিরে একদিন আসন পেলেন সন্তান-লক্ষ্মী। এখন, সম্পদ্‌-ঐশ্বর্যের, বল-বীরত্বের, জয়-বিজয়ের আদিতেও যে লক্ষ্মী! তাই নিঃসন্দেহে মানুষের সমস্ত প্রয়োজনের আদিতে চিরআসীনা হলেন আদিলক্ষ্মী। এইরূপে বৃত্তাকারে ঐশ্বর্যের ভারে ভারে মানুষের সমস্ত সাফল্যের সহজ সিদ্ধির পথ আকীর্ণ হয়ে উঠল দেবদেবী আর মন্দিরে মন্দিরে!

জীবনের স্বচ্ছন্দ গতিপথে ব্যর্থতা ও পরাজয় যখন বিগত বিজয়কে ধূলিসাৎ করে দিল, তখন বারেক হতবুদ্ধি চোখে সেই কোন্ দূর অতীতে নিজেদের হাতে গড়ে তোলা মহিমান্বিত কল্পনার কত কত অদ্ভুত, আশ্চর্য অপরূপ দেবদেবীর জমকালো মূর্তি সব কেমন যেন বড় বেমানান, বড্ড ফিকে ঠেকতে লাগল।

বহুদিন আগে জাতির জীবনে এই পরাজয়ের বিষণ্ণতা নেমে আসা থেকে সেই যে মন্দির-মহিমা, দেব-দেবীর রহস্যময় শক্তি-পরিক্রমায় বিশ্বাস আস্তে আস্তে বিদায় নিতে বসেছে, আজকের প্রকাশ্য দিবালোকে পৃথিবীর দূর-দূরান্তের দর্শকের দৃষ্টি থেকে সে-দৃশ্য এড়ানো যাবে কেমন করে!

॥ ২৪ ॥ রামেশ্বর থেকে মাদুরা

"তোমার পথ ছাইয়্যাছে
মন্দিরে মসজেদে।"

সেই কবে বাঙলার বাউল প্রাণমাতানো গানে এ কথা বলে গেছেন, আর আজ তাই মনকে শুধাই ঃ মন্দির গড়ল কে?

—মানুষে।

—রামেশ্বরেরই বা প্রতিষ্ঠা করলে কে?

—রঘুপতি রাম।

তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, তিনিই বা কে?

সহসা উত্তর মেলে, পূর্ণতর মানব, নরশ্রেষ্ঠ রাঘব।

তবে যে মন্দির আড়াল করলে মানুষকে! মন বলে, আর নয় রে, এবারে মানুষ দেখ ভাল করে। দেখতে দেখতে তোর "নয়ন ডুবুক রসের তিমিরে।"

মানুষ দেখতে কোথায় যাই এখানে! ঘুরে-ফিরে এলাম আবার মন্দিরে!

অঞ্জনা নদী-তীরে চন্দনা গাঁয়ে যে পোড়ো মন্দিরখানা, জীর্ণ ফাটল ধরা—তার এক কোণে পড়ে থাকে অন্ধ কুঞ্জবিহারী। কিন্তু এখানে রামেশ্বরের মন্দিরে কত মানুষ আসে যায়, কারো পদচিহ্নটুকু দিনেকের তরে পাথরের মেঝে ধরে রাখে কিনা সন্দেহ। যুগ যুগ ধরে দিক্-দিগন্তরের মানুষের এখানে আসা-যাওয়া, ছুটে চলা। সেই চলমান জনতার স্রোত কখনো মন্থর, কখনো বা দুর্বার। এ স্রোত কিছুক্ষণের জন্যে আজ সন্ধ্যা আটটায় থমকে দাঁড়াবে। ওই সময় দেবতার মশাল-শোভাযাত্রা হবে সোনার পালকিতে। দেবতা যে কত ঐশ্বর্যবান তারই সামান্যতম নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে হর-পার্বতীর স্বর্ণ-সিংহাসনে।

মানুষ চলেছে আজ উতলা হয়ে সারে সারে। মলিনবসন, মলিনমুখ নর-নারী, তাদের চোখ দুটি শুধু বুভুক্ষা ভরা। এ বুভুক্ষা কি ভক্তিপ্লুত অন্তরের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষারই?

সহসা কানে এল ঃ শুনিয়ে বাবুজী।

তাকিয়ে দেখি, পঞ্চাশোর্ধ বয়স, লম্বা লাঠির মত একজন। মাথায় বহুকালের ময়লা পাগড়ি, হাতে ক্ষুদে এক নোটবুক, তার সঙ্গে পেন্সিলের একটা টুকরো সুতো দিয়ে বাঁধা। আর তারই উপযোগ দেখা যাচ্ছে নোট নেবার ব্যস্ততায়।

দাঁড়িয়ে পড়তে লোকটি নিজের বক্তব্য বলবার আগেই পরিচয় পেশ করে নিলেন। নাম তাঁর নন্নীলাল, পালুহা গ্রাম, জেলা হোসেঙ্গাবাদ, প্রান্ত—মধ্যপ্রদেশ। তারপর বললেন যে, টোকা খাতায় আমাদের নামধাম দিতে আপত্তি আছে কিনা।

সামান্য ছোট্ট একটু দাবি। দ্বারকা থেকে রামেশ্বর পর্যন্ত যে ধর্মপ্রাণ যাত্রীদের তীর্থযাত্রা, তাদের একজনের মুখ থেকে এ দাবিটুকু যেন এক অমূল্য উপহার! সারা ভারতের সাধারণ মানুষের শত বৈচিত্র্যের এ এক বৈচিত্র্য—এই মৈত্রীর আহ্বান! সেই মুহূর্তে অন্তরে উপলব্ধি করলাম, মন্দিরে না এলে আজিও এ দেশের অকৃত্রিম সরল মানুষের সঙ্গে রাখীবন্ধন সম্পূর্ণ হয় না।

দেশের মানুষ আজো ঝাঁকে ঝাঁকে মেলে এসে মেলায়, পূজা-পার্বণে; যোগে, তীর্থ-দর্শনে, মন্দিরে তাদের প্রত্যক্ষ না করলে এ ভারতের আত্মার সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় ঘটা অসম্ভব।

নন্নীলাল তাঁর দাবি মিটিয়ে নিতে না নিতে গুলাবচাঁদ ধরে বসলো, তাকে কিছু মন্দিরের কথা বলতে হবে। সে কথা তার দেশওয়ালী ভাইদের দেশে গিয়ে শোনাবে। তারা পয়সা খরচা করে এত দূরে না পারে আসতে, না পারে পড়তে। কাজেই গুলাব-চাঁদের মুখে মুখে তারা রামেশ্বরমের সকল বৃত্তান্ত জেনে নেবে।

হয়তো আজ থেকে বছর পঞ্চাশ আগেও সারা দেশের সাধারণ মানুষের জ্ঞানের মাধ্যম ছিল এই পরের মুখে শোনা বর্ণনা। সেকালে কি রামায়ণ আর কি-ই-বা কবিতা, সবই বলায় আর আবৃত্তিতে গ্রামে গ্রামে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ত। সে সহজ সুলভ

সর্বজনবোধ্য মাধ্যম আজ আর তেমন চলতি নেই। ফলে গ্রামের গাঁথক, গল্পকার এ কালে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে।

গুলাবচাঁদ শুনতে শুনতে তন্ময়। হঠাৎ তার পরিবার তাকে ডাকতেই সে বিদায় নিলে। আমরা আরো কত আশ্চর্য আশ্চর্য লোকজনের মধ্য দিয়ে মন্দিরের অভ্যন্তরে এগিয়ে চলেছিলাম।

এ যেন এক প্রকাণ্ড রাজবাড়ীর ব্যবস্থা সব। সকল ব্যবস্থা বর্তমানে যদিও টিমটিম করে চলছে, তবুও এ মন্দির এখনো কাউকে চিরতরে পরিত্যাগ করেনি। এর অভ্যন্তর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার ভার যে ঝাড়ুদারের উপর, সে সেই ভরসন্ধ্যায় ঝাড়ু শেষ করে এইমাত্র বিশ্রাম নিচ্ছে। বাতি দেবার বরাদ্দ যার, সে এখন ভয়ঙ্কর ব্যস্ত। মশালচি রাত্রির মশাল-শোভাযাত্রার আয়োজনে লিপ্ত। দেব-দেবীর রত্নাগারের দ্বারী বন্দুক হাতে পাহারারত। এমনি আরো কত কতজন এই মন্দিরকেই তাদের পুরুষানুক্রমিক জীবিকার একমাত্র অবলম্বন রূপে গ্রহণ করেছে সেই সুপ্রাচীন অতীত থেকে। মন্দিরের ঢলঢলে সুদিনে তাদের ছিল পোয়াবারো। এখন দিনকাল খারাপ, তাই তাদের বারমাসই মাঘের শীত।

আগে তাদের কাছে যাত্রীদের মিনতির শেষ ছিল না। এখন কাল পালটেছে! তারাই যাত্রীর দয়া-দাক্ষিণ্যের ভিখিরী। আর কিছুকাল বাদে এদের কপালে কী যে ঘটবে, সে ভাবনা ভগবান ছাড়া সংসারে আর কারো কি ভাববার কোন দায় নেই!

যেখানটাতে সোনার পালকি রাখা হবে, তার চার পাশে কাতারে কাতারে দর্শকের ভীড় দেখতে দেখতে জমে উঠল। পুরনো মন্দিরের মলিন প্রাচীরের দৃশ্যমান জরাজীর্ণতাকে চাপা দিল ভক্তদের দর্শন-আকাঙ্ক্ষার উজ্জ্বল প্রভা। সকলের চোখে সুতীব্র কৌতূহলঃ এই মরুদ্বীপে সোনার পালকি না জানি কত সুশ্রী-দর্শন। যেখানে মানুষমাত্রেই দৃশ্য ও অদৃশ্যভাবে ভিক্ষান্নজীবী, জমি রুক্ষ, প্রকৃতি ধূসর, চরাচর বিষাদে ভরপুর, সেখানকার মহামন্দিরে দেবতার স্বর্ণ সিংহাসন শ্মশানে স্বর্ণ-প্রদীপের প্রবাদ

বচনেরই মতন। তাই বুঝি অনেকেরই দৃষ্টিতে ব্যগ্রতায় প্রায় অবিশ্বাসের কৌতুকী ঝিলিক দেখা যায় !

কিন্তু কী অদ্ভুত। সোনার পালকি না দেখে কারো নড়নচড়ন নেই। দীর্ঘ সময় বয়ে যায়। কোথায়—সোনার পালকি কোথায়।

প্রতীক্ষার অধীরতা বিরক্তিকর ক্লান্তির ভারে যখন নুইয়ে আসছে, এমন সময় সোনার পালকি নয়, জমকালো সাজসজ্জায় সুসজ্জিত মাতঙ্গের আবির্ভাব হল। তবু মন্দের ভাল, এ মন্দিরে রাজকীয় সজ্জায় সত্যিকার হাতী দেখা গেল। গজের গাত্রসজ্জা জমকালো হলেও তাতে কালের করাল হস্ত যে কালো ছায়া ফেলেছিল, সে কারো দৃষ্টি না এড়ালেও সকলেই দুধের আস্বাদ যেন ঘোলে মেটাতে চাইছিল।

সত্যি সত্যিই এবারে পালকি এল। সঙ্গে সঙ্গে দর্শকজন হুমড়ি খেয়ে প'ল। অমনি ওদিকে মহাসমারোহে বেজে উঠল কড়া ঢাকের সাথে তীক্ষ্ণস্বর নাদেশ্বরম। কিন্তু সেদিকে কারো কান যে ছিল না সে এক রকম সুনিশ্চিত। কারণ সমারোহহীন দীন পরিবেশে পরিবর্ধিত বুভুক্ষু নয়নের সুমুখে এখন যে বিপুল ঐশ্বর্যের হাতছানি ইসারা দিচ্ছে, তার জৌলুসে চোখ যেমন ধাঁধায় পড়ে গেছে, কান তেমনি হয়েছে বধির। শোনা যায়, সাপে যখন চোখ দিয়ে দেখে, তখন কিছুই শুনতে পায় না। তবে কি এরা ওই সরীসৃপের স্তরে আবার নেমে গেছে !

তা নয়। সোনার দেশে জন্মে যারা আজীবন চিরদারিদ্র্যের মাঝে কাটালো, কখনো এক সঙ্গে একতাল সোনা হাতে করা দূরে থাক, দু'নয়ন ভরে দেখবারই সুযোগ পেল না ; তাদের চোখের সামনে, উনিশ শ' ছাব্বিশ সালের সঠিক হিসাবে, এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকারও বেশী মূল্যের সোনার পালকি নামিয়ে রাখলে দৃষ্টিবিভ্রম না হয়ে কখনো যায় !

কেবল দৃষ্টিবিভ্রম নয়, সে কি ভক্তিশ্রদ্ধা ! বাহকের স্কন্ধের ঘামে যে দণ্ড দু'টি দু'পাশে ঈষৎ বর্ণ হারিয়েছে, তার 'পরে মাথা ঠুকে সে কি প্রণামের ঘটা ! সেখানে লোকের ভীড় যখন আর ধরে না, তখন পালকির সারা গায়ে আক্রমণ শুরু হল। ও-পর্যন্ত যাদের মাথা পৌঁছুল না, তারা

পালকির ছায়ায় শির ঠেকিয়ে পরম গর্বে ঘোষণা করতে লাগল, জীবন আজিকে ধন্য !

বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে জনকোলাহল কাছে আসতে থাকায় আমরা সেদিকে চোখ ফিরিয়ে দেখি, সারা রামেশ্বর ভেঙ্গে পড়েছে। মশালচি ঘৃতের মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে পথ দেখিয়ে চলেছে। তারই পেছনে যেন কোন্ এক কুবেরপুত্রের বিবাহ-উৎসবের শোভাযাত্রা। কেবল বর-কনের স্থান নিয়েছেন দেব-দেবী। আর শোভাযাত্রী পূজারী, ভক্ত, দর্শক আর ভিখারী যেন বরযাত্রী। জাঁকজমক আর ঠাটের অন্ত নেই। কিন্তু সবার মুখে-চোখে মশালের আলোতে দারুণ উদ্বেগের সুতীক্ষ্ণ চিহ্ন মন্দিরের ফাটলের মত ফুটে ফুটে উঠেছে। না-জানি ওই চিহ্ন আগামীর কোন অনাগত অঘটনের সূচনা, কিম্বা ও কিছু না !

দেবীকে এনে সোনার পালকিতে চড়ানো হল। বাজনা বিপুল বাদ্যে বেজে উঠল। চারদিক থেকে আনি, দোয়ানি, সিকি, আধুলি, টাকাটা-আসটার বৃষ্টিতে সোনার পালকির মেঝে ধাতব আচ্ছাদনে ছেয়ে গেল। কিন্তু ভক্তির আতিশয্য সোনার পালকির উপরে যতটা, দেবীর উপরে ততটা ঠিক মনে হল না। এইজন্যেই কি এই সোনার দেশের বিদেশী শাসকেরা চিরদিনই মাত্রাতিরিক্ত জাঁকজমকের আমদানীতে গরিব দেশবাসীর বুভুক্ষু দৃষ্টি ধাঁধিয়ে দিতে চেয়েছিল।

মাসিমার কিন্তু কেন জানি এতবড় জমকালো শোভাযাত্রা, পঁচিশ বেহারার সোনার পালকি, সোনার দেবীমূর্তি মনে তেমন ধরেনি। তাই তিনি আমাদের ধরে পড়লেন, তোমরা চল শীঘ্রি।

সেই সুপ্রাচীন অলিন্দ-পথে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে অন্তরে অন্তরে যে সকল মিশ্রভাবের ঘূর্ণী জেগেছিল তার বর্ণনা দেবার সাধ্য থাকলে হয়তো প্রকাশ পেত এমন সব প্রশ্ন, যার সমাধান ইতিহাস আজো বাৎলায়নি। তবে ভাবীকালের ইতিহাস সে সকল সমস্যাসঙ্কুল প্রশ্নের সমাধান না করলে আশঙ্কা হয়, মুশাকিল শেষে মুশকিল-আসান হয়ে না দাঁড়ায় !

আস্তানায় ফিরেই মাসিমা অস্থির হয়ে উঠলেন, তিনি আর রামেশ্বরমে রাত কাটাতে চান না। কেন যে চান না, সে অনুমানসাপেক্ষ। কিন্তু অনুমান সকল সময় সঠিক নাও হতে পারে। সে যাই হোক, সেই রাত্রিতে আমাদের আস্তানা তুলে আবার এক মন্দিরের ডাকে বেরিয়ে পড়তে হল। রামেশ্বরের আকাশ, টিমটিমে পথের আলো, পরম তীর্থের আকর্ষণ সবই পেছনে পড়ে রইল—পরিত্যক্ত হৃদয়ের ব্যথাহত দীর্ঘশ্বাসের মত !

* * * *

রাতের তৃতীয় প্রহরে মাদুরার একখানি সোজা গাড়ী আছে। সে গাড়ীতে গেলে পথে কোথাও গাড়ী বদলের ঝামেলা নেই, অথচ মাদুরায় পৌঁছাবে সেই মধ্যাহ্নের আগেই। কাজেই সময়টা চমৎকার ভাবে কেটে যাবে বলেই আশা করা গেল।

কিন্তু রাত যে এখন সবে সওয়া ন'টা। আমাদের বিদায় দিতে বামনরাও মধুকর যোশী স্টেশন পর্যন্ত হাজির। তাই না দেখে মাসিমা বললেন, যোশীজী আপনি ঘরে যান। আর রাত করবেন না। আমরাও চললাম।

যোশীজী সাধারণ পুরোহিতের চিরাভ্যস্ত বুলিতে বললেন, আপনারাই আমার সব। যাত্রীর সুখ-দুঃখ আমাদের না দেখলে কি চলে। যাত্রী বলতে গেলে তো মা-বাপ।

তবু মাসিমা শুনলেন না। জোর করে একরকম ঠেলে যোশীজীকে বিদায় করতে করতে বললেন, যা খাটুনিটা দিনভর ঠাকুরমশা'র গেছে, তা ছাড়া ঘরে কাচ্চাবাচ্চা······জীবনে একটু-আধটু শান্তিও তো চাই।

সেই মুহূর্তে মাসিমা বামনরাও মধুকর যোশীকে পূজারী পুরোহিত থেকে একেবারে রাজা-বাদশার মসনদে পৌঁছে দিলেন !

* * *

বিশ্রামাগারে বিজলী বাতির তার এসেছে, তখনও বিজলী আসেনি। মাঝে রামেশ্বরমের শেষ গাড়ী কখন যে এসে পৌঁছেছে তার সঠিক খবর নেবার ফুরসৎ হয়নি। দিব্যি বিছানা ছড়িয়ে তার বুকের উপরে নিদ্রা-

দেবীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম, হঠাৎ মশার কামড়ে ছটফট করে উঠলাম, ঘরের জানলা দিলাম হাত বাড়িয়ে খুলে।……অমনি সমুদ্রের গভীর হিমেল হাওয়া উড়ে এসে শরীরটাকে জুড়িয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে কানে এল, সঙ্গীরা এখনও জেগে।

যিনি কথা বললেন তিনি যে একদমই ঘুমননি সেও জানানো হল অতঃপর রাত্রি জাগরণের অবসাদ স্বচ্ছ করে তুলতে কথার তুফান তোলা গেল !

সে তুফানের আঘাতে পাশের আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়া যাত্রীর আর বোধ হয় চুপ থাকা সম্ভব ছিল না। তাই অকস্মাৎ তিনিও আমাদের সঙ্গে তরঙ্গভঙ্গে মিলে যেতে চাইলেন। বেশ হল। ঘরের অন্ধকার কথার আলোর ঝলকে ঝলকে পলকে পলকে মিলিয়ে যেতে লাগল। অলস সময় কোথা দিয়ে বয়ে চলল, কেউ তার ঠিক-ঠিকানা রাখল না। ক্রমে রাতের দ্বিতীয় প্রহর বালুর ঘড়ির মত, রাত্রির তারার আলোর মত, ঝিরঝির করে ঝরে গেল !

গাড়ীর সময় হল ছাড়বার। সমুদ্রের সুর ভেসে এল রূপসীর হাসি উজাড় করা ভাণ্ডারের মাদক সুঘ্রাণে। এবারে শুরু হবে এগিয়ে চলা। সে আনন্দে আগামী ভোরের আলো নেচে নেচে যোগ দেবে। তার আগে রামেশ্বর থেকে বিদায় নেবার কালে এখনি যোগ হবে নতুন পান্থের এ পথযাত্রায় সাথিত্ব দেওয়া। এখন তাই বিষাদের হেতু নেই, আসুন এবারে আমরা অদ্ভুত চলার গতির আহ্লাদিনী সুরে সুরে দূর হতে দূরকে নিকটে টেনে নেবার কামনাকে স্বাগত জানাই। আমরা এখন মাদুরার পথে।

॥ ২৫ ॥ মাদুরার নৃত্যাঙ্গনে

শহর মাদুরা। তামিলে বলা হয়, মথুরাই। দক্ষিণের মথুরা বলেই চালিয়ে দেওয়া যায়। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত যে মথুরা নগরীর প্রাচীরের তলে সুপ্ত ছিলেন সে এই মথুরাই, না উত্তর ভারতের মথুরা, জানা নেই। কিন্তু কবির 'অভিসার' কবিতার সেই নগরীর নটী বাসবদত্তাদের চলাচল এককালে এখানে যেমন চলিত ছিল, তেমনি ওই ধাঁচের কবিকাহিনীও এদেশে সুপরিচিত।

অপরাহ্নে সেই পথের সাথী আমাদের শহর দেখাতে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। বিরাট শহর। কলকাতাকে ছেড়ে দিলে সারা বাংলায় এর কোন তুলনা নেই।

আজ থেকে শ' চারেক বছর আগে সুদূর সৌরাষ্ট্র থেকে একদল মানুষ মাদুরায় আসে। তাদের অনেকেই এ শহর ছেড়ে আর নড়ে না। আজিও তারা মাদুরাতে বহাল-তবিয়তে বসবাস করছে। এর থেকে বোঝা যায়, চার শ' বছর আগেও এ শহরের দুর্বার আকর্ষণ সুদূর সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু এদেশের ইতিহাস দাবি করে যে, চার শ' বছর আগে থেকেই নয়, খ্রীষ্টের জন্মের আগে থেকে এখানে পাণ্ডীয় রাজারা সুবিপুল বিক্রমে সুশাসনের ঐতিহ্যকে পরিপুষ্ট করেছেন। পাণ্ডীয় রাজাদের রাজত্বের অবসান ঘটিয়েছিল বিজয়নগরের সাম্রাজ্য-সম্প্রসারণ অভিযান। সে সপ্তদশ শতাব্দীর ঘটনা। এদেশের সুপ্রাচীন সাহিত্যে মাদুরার সুখ্যাতি ভরা। অতি পুরাতন তামিল ক্লাসিক 'সিলপ্পতিকারম'-এ মাদুরার উল্লেখ রয়েছে। এই ক্লাসিকখানি নাকি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর অপূর্ব সাহিত্য-নিদর্শন। কিন্তু মূল মন্দির এখানকার মুসলমানের ধ্বংস-কাণ্ডের হাত থেকে পরিত্রাণ পায়নি। মালিক কাফিরের দুর্ধর্ষ সৈন্যদল বিধর্মী কাফেরের মন্দিরকে চূর্ণবিচূর্ণ করে তবে ক্ষান্ত হয়। সে ঘটনাও ঘটে খ্রীষ্টাব্দ তের শ' দশে। তারপর সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের পুনরুদ্ধার

শুরু হয় ষোড়শ শতাব্দীতে আর তার শেষ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে।

কিন্তু আমাদের শহর থেকে আপাতত মন্দিরকে আমরা ভুলে যাই। শত শত বছরের যে শহর, তার শিকড় মাটির বহু তলায়। তাই শত ঝড়ে, শত ঝঞ্ঝায় এর ভিত নড়ে না, এর বুকে অগভীরতার আলোড়ন জাগে না। এ যেন সুগভীর সাগরবক্ষের মত সুগম্ভীর, শান্ত।

এহো বাহ্য! পথের সাথী আমাদের মন্দিরের দ্বার পর্যন্ত নিলেন কিন্তু ভেতরে না ঢুকিয়ে বললেন, এই যে পশ্চিম গোপুরমের পাশের পথ দেখছেন, এরই ঠিক সমান্তরালে পূর্ব গোপুরম পাশে রেখে চলে গেছে আরেকটি পথ। উত্তর-দক্ষিণের সমান্তরাল পথ দুটি সমকোণে পূর্ব-পশ্চিমের সঙ্গে মিলে যে চতুষ্কটির সৃষ্টি করেছে, শহর মাত্নরাময় এই রকম অসংখ্য চতুষ্কের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আর সমান্তরাল পথ এর চারপাশে একের পর এক হিসাবে সংখ্যা বাড়িয়ে একই ভাবে চতুষ্কের পর চতুষ্ক তৈরী করে দৌড়ে গেছে।

এই চতুষ্কগুলি খোলা অঙ্গন হলে দেখতে কি চমৎকারই না হত! তবে মুক্ত অঙ্গন না হয়ে সারি সারি বাড়ীতে ভরাট হওয়ায় একে দেখায় সন্তান-সন্ততি পরিবেষ্টিত মাধুর্যময়ী জননীর মত। অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে এর গায়ে শুচিতার যতটা ছাপ রয়েছে, মালিন্যের কদাচার-স্বাক্ষর নেই ততটা।

আর চলমান জনতার চীৎকারে এখানে কর্ণ বধির হয় না। যদিও মানুষের চলাফেরায় সুশৃঙ্খলতার ছাপ নেই তবুও গলা ফাটিয়ে কেউ কারো কর্ণ বধির করতে ব্যস্ত নয়।

সারে সারে বিপণিতে থরে থরে পশরা সাজানো। শহরের ঐশ্বর্য উপছে না পড়ুক, অপ্রাচুর্যের নখরাঘাত দুর্লভ। কেমন যেন চমৎকারভাবে সকল কিছুই এখানে সীমার শাসনে সুন্দর।

যে মানুষ গড়ল শহর, তারই এক দল জীবনকে সুন্দর করতে সভ্যতার ঊষাকালে গেয়ে উঠেছিল প্রথম গান। মন দিয়ে যার নাগাল পেলে না,

তাকে স্পর্শ করতে চাইলে গানে। আর এক দল গানের তালে তালে চরণ মেলাতে নেচে উঠল। ক্রমে গানের সুরের পর সুর সৃষ্টি হল। সেই সুরের আলো অনুসরণ করে এগিয়ে চলল চরণছন্দ। সুরের রূপ করলে সৃষ্টি অরূপকে। অঙ্গের নৃত্য অনঙ্গ হয়ে সে-অরূপের স্বরূপ ফুটিয়ে তুললে নবতর নৃত্যের বিন্যাসে।

সেই নৃত্য তার প্রোজ্জ্বল ঐতিহ্য নিয়ে দক্ষিণ দেশে বেঁচে আছে। আজ সন্ধ্যায় আমাদের তারই অনুষ্ঠানে নিয়ে চলেছেন পথের সাথী।

অনুষ্ঠানের জন্যে প্রকাণ্ড যে হলঘরটি বন্দোবস্ত হয়েছে তার অভ্যন্তরে ছ'টা না বাজতেই তিল ধারণের স্থান নেই। অগণিত লোক। কিন্তু কেউ ভুলেও আওয়াজ তুলছে না। কোথাও টুঁ শব্দটি নেই। আমাদের জন্যে আসন নির্দিষ্ট করা ছিল। পথের সাথী তাঁর পরিচয় দিতেই স্বেচ্ছাসেবক আমাদেরকে আসনে পৌঁছে দিলে।

নৃত্যানুষ্ঠান সেই সাড়ে ছ'টায়। তার এখনো আধ ঘণ্টা বাকী। সময় কাটাতে সবচেয়ে যখন সমস্যায় পড়া গেছল তৎক্ষণাৎ পথের সাথী শুরু করলেন ঃ ভরতনাট্যম কি জানেন? বললাম, সামান্য একটু আধটু জানি, কিন্তু সে না-জানারই মত। বরং আপনার কাছ থেকে এই বেলা জেনে নিই!

তাতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। উৎসাহের সঙ্গে তিনি বলতে লাগলেন, অতীতকালে ভরতমুনি যে নাট্যশাস্ত্র রচনা করেন, তার থেকে নৃত্যের বৈশিষ্ট্য বেশ কিছুটা জানা যায়। মুনির একান্ত ইচ্ছে ছিল, মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করা, বুদ্ধিবৃত্তি অসাধারণত্বের কোঠায় পৌঁছে দেওয়া, জনসাধারণের শিক্ষার প্রসার ঘটানো, আর তারই অন্যতম মাধ্যম হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন নৃত্যকে।

কবিগুরুও নৃত্যের মাধ্যম বেছে নিয়েছিলেন পূর্ণতর শিক্ষার ক্ষেত্রে। কিন্তু সে কথা নয়, নৃত্যকে বিশ্বের যৌবন-উচ্ছ্বাস রূপে কল্পনা করা হয়। এ কল্পনা কত যে আশ্চর্য সুন্দর তারই দর্শন পাবেন ভরতনাট্যমে।

নৃত্য শুরু হল। নৃত্য চলল। মাঝে সামান্য একটু বিরতি।

আবার শুরু। আবার চলা। তারপর ঘণ্টা আড়াই বাদে কুমারী শুভলক্ষ্মীর একক নৃত্যের সমাপ্তি।

দর্শকজন আড়াই ঘণ্টা একটানা চুপচাপ। হঠাৎ আলোর ঝলকে চোখমুখের বিস্ময় বিদ্যুৎ-দীপ্ত।

পুরো আড়াই ঘণ্টার নৃত্যানুষ্ঠান। নৃত্য, নৃত্য এবং অভিনয়মের বিনিসৃতির মালা যেন একখানা। যেমন চোখমুখ উচ্ছ্বাস-উদ্দীপ্ত, তেমনি পায়ের কাজের সূক্ষ্ম কারিকুরি। যখন দুই বাহু নাচে, তখনি সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ-উপাঙ্গ, সেই সঙ্গে সর্বাঙ্গ নৃত্যের হিন্দোলে যেন মুহূর্তে অনঙ্গ হয়ে ওঠে। আর কি চমৎকার অভিনয়ম্। মঞ্চের একপাশে বসে নাটুনার কর্ণাটিক রাগ-রাগিণীর বিস্তারে যে গীতিকাব্য জীবন্ত করে তুলছেন, আঁখিতে, আঁখিপল্লবে, কপোলে, ওষ্ঠের হাসিতে সেই গীতিকাব্যকে প্রাণময় ব্যঞ্জনায় প্রস্ফুটিত করে তুলছেন নৃত্যশিল্পী। দেখতে দেখতে মনে হয়, এমনটা জীবনে কখনো দেখিনি। অন্তরের ঘুমন্ত আত্মা অকস্মাৎ জেগে উঠে কানে কানে যেন কথা কয়, এ নৃত্য দর্শককে অন্য জগতে নিয়ে যায়।

আশ্চর্য, তথাকথিত নৃত্যের সঙ্গে এর সাদৃশ্য খুঁজে মেলা ভার। প্রথম দিকে নর্তকীর সজ্জার উপরেই আর দশজন দর্শকের মত আমারো চোখদুটি হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। কিন্তু না, এ সজ্জায় দেহকে বিপণি করবার নিদারুণ প্রয়াস কোথাও কিরীচের মত উচিয়ে ওঠেনি। পরে নয়ন-কটাক্ষ যত বারই নয়নে বিদ্যুৎ হেনেছে, তার মধ্যেও মোহবিভ্রম সৃষ্টির সাদর আহ্বান চোখে পড়েনি। কি নৃত্যে কি অভিনয়ে কোথাও আদিম রিপুকে উসকে দিয়ে সাধারণ দর্শকের ফুসফুস ঝাঁজরা করবার ব্যভিচার দেখা যায়নি। কেবল যেন একটি কুঁড়ি নৃত্যের ছন্দে ছন্দে আলোর ঝর্ণা ধারায় নাইতে নাইতে দলে দলে বিকশিত হতে হতে দুর্বার প্রাণের আবেগে শতদলে বিকশিত হয়ে উঠেছে। না, একটুখানি অন্য প্রকারে এ বিকাশ সম্ভব হয়েছে। নর্তকীর মসৃণ ও ছান্দিক দেহ অতি মাত্রায় নৃত্যের অনঙ্গ নির্দেশে ব্যাকরণের তাড়ায় বিদ্যুৎ-দ্যুতি

লাবণ্য লালিত্যকে কঠোরভাবে সংকুচিত করে চমৎকার রক্ত-মাংসের সুন্দর দেহকে কঠিন পাথরের ভাস্কর্যের ছাঁদে ভেঙ্গেছে গড়েছে। ফলে বিস্ময়কর দৃষ্টি-বিভ্রম সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভরতমুনির সূত্র স্বীকৃতি পেলেও নৃত্যের দ্যুতিমান শ্যামল সুষমা কিছুটা আত্মহারা না হয়ে যায়নি। শাস্ত্রের সূত্র তার ন্যায্য প্রাপ্য পেয়েছে বটে কিন্তু সৃষ্টি যে নিত্য-নতুন আত্মপ্রকাশে সার্থক, সে সার্থকতা সুসম্পূর্ণতার সুকঠিন পাত্রের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করেছে।

হলঘরের বাতিগুলি দপ করে জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভাল করে চেয়ে দেখি, পথের সাথী আমাদের আসন থেকে তুলে এনে কখন দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন গ্রীন-রুমে। কুমারী শুভলক্ষ্মীর এই প্রথম মঞ্চাবতরণ। এই দিনটির জন্যে, পথের সাথী বলছিলেন যে, তাঁর বন্ধু-কন্যা প্রতীক্ষা করেছেন পাঁচটি বছর। কাউকে কাউকে নাকি আরো দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করতে হয়।

নৃত্যশিল্পী এখন আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সাফল্যের চিহ্ন বহন করেছে তাঁর গলায় একগাদা ফুলের মালা। কিন্তু কত সলজ্জ তাঁর কাব্যিক চোখদুটো। যেন সাফল্যের ভার আর সহ্য করা সত্যিই তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

দীর্ঘ একটানা একক নৃত্যের পরিশ্রমে তাঁর সর্বাঙ্গ এখন ঘামে ভিজে গেছে। চোখদুটি হাসি হাসি অর্ধনিমীলিত, ভরতনাট্যমের আঁটো পোশাক এখানকার আলোতে আর আগের মত বর্ণাঢ্য নয়, এবং তাঁর সেই সদ্য অতীত অভিনয় এই মুহূর্তে আর সত্য বলেও ভাবা অসম্ভব। তথাপি সে অভিনয়ে যে প্রাণ ছিল, তার সন্ধান কেবল পেশাদারী অভিনেত্রীর কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। অভিনয় যাদের পেশা, তারা অবিকলকে নকল করতে দক্ষ। কিন্তু নকলের ঊর্ধ্বে প্রাণের ছাপ ফেলতে হলে যে অবিমিশ্র আন্তরিকতার প্রতিফলন প্রয়োজন, তাই যেন এই নৃত্যশিল্পীর অভিনয়মে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

বেশ রাত্রিতে আমরা বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরলাম।

সে রাত্রিতে কেবলি নৃত্যের কথা ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে এক সময় মনে হল, সে কোন্ নাচ, যার কল্যাণে বাংলার বহু বনেদী পরিবার ত্বই-এক পুরুষের মধ্যে জাহান্নমে গেল। হ্যাঁ, নাচই বটে। দক্ষিণে 'নাচ' বলতে বুঝায় সেই বস্তুকে, যা বাইজীদের করায়ত্ত এবং যার দৌলতে রাতারাতি ভোগবিলাসের মত্ততায় মানুষ মাত্রেরই অপমৃত্যুর পরোয়ানা তৈরী হয়।

এমনিতর এক নৃত্যানুষ্ঠান দেখেছিলেন ফরাসী পর্যটক পিয়ের লোতি অনেককাল আগে পণ্ডিচেরীতে। মাত্বরার এ রাত্রিতে নৃত্য প্রসঙ্গে সেই নাচের কথা কখন যে সারা মন জুড়ে বসল। "সেই দীর্ঘায়ত আঁখিযুগল, বর্ণভূষিত একখানি মুখ, ইন্দ্রিয়াসক্তিতে ঢলঢল, তিমিররাজ্যের নেশায় বিভোর—খুব লঘুভাবে, লঘু-দ্রুত গতিতে একবার এগিয়ে আসছে, আবার চলেছে পিছিয়ে। চোখের ত্বটি চকচকে তারা, মিনা-র সাদা জমির উপর বসানো কৃষ্ণকান্ত মণির মত কালো ত্বটি তারা আমার চোখের উপর নিবদ্ধ। দূরদেশী দর্শকের হৃদয়ত্বর্গ দখল করতে একবার ও আমায় করছে আক্রমণ, আবার যেন ব্যর্থ হয়ে পরাজিত অরির মত পালিয়ে ছায়ান্ধকারে যাচ্ছে মিলিয়ে। এই যে এগিয়ে আসা, পিছিয়ে যাওয়ার লাস্যলীলা—সমস্তক্ষণ নর্তকীর চোখের ত্বটি কৃষ্ণকলি তারা আমার চোখের উপরে একটানা নিবদ্ধ। ওই শ্যামল যৌবনটলমল মুখখানি মণিরত্নে বিভূষিত; হীরকখচিত একটা সোনার সিঁথি ললাট বেষ্টন করে, কেশ ঢেকে নেমে এসেছে রগের দিকে। কানে ও নাকে ঝিকমিক করছে আরো কতকগুলি টুকরা হীরার ঠিকরে-পড়া আলো।"

সেই রাত্রিতে নৃত্যস্থলে আলোকচ্ছটায় পিয়ের লোতির চোখ ঝলসে গেছ্‌ল যে নর্তকীর নাচের ঘটায়, আজ রজনীতে আমার জেগে থাকা চোখ ত্বটিতে তারই অত্যুজ্জ্বল আভা ক্ষণে ক্ষণে বিত্যুতে ভেসে উঠছে। জনতার মধ্যে, ওই নর্তকীকে ছাড়া আমি কাউকে দেখছি না। ওর ঐ সিঁথি বিভূষিত মস্তক আমার দৃষ্টিকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আকর্ষণ করেছে।

দর্শকবৃন্দের সহস্র দৃষ্টি হুমড়ি খেয়ে পড়ে ওই রমণীকে একদৃষ্টে দেখার তীক্ষ্ণ ব্যগ্রতায় তার চলার পথ সঙ্কীর্ণ করে তুলেছে। সেই আসা-যাওয়ার সরুপথে মরাল-গতিতে ছন্দপাত না করে নর্তকী একবার ছুটে আসছে আমার অতি সন্নিকটে, আবার ছুটে পালাচ্ছে। এ ছোটায় সৌন্দর্য ছিটকে দিয়ে চলেছে সে।

"বহু দর্শকের ব্যাকুল চাহনি, ভিড় ভেঙ্গে পড়া পরিবেশ, কিছুরই প্রতি আর আমার দৃষ্টি নেই। আমার বিমুগ্ধ আঁখিতে জনতার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বস্তুত সেই নর্তকীকে ছাড়া, তার সেই শিরোভূষণটি ছাড়া, তার সেই চোখের কৃষ্ণকালো তারা ও কালো ভুরুর খেলা ছাড়া আমি যেন আর কাউকে দেখছি না—কিছুই দেখতে পাচ্ছি না…… নর্তকী বেশ মোটাসোটা ও মাংসল হলেও, ওর দেহযষ্টি ভুজঙ্গসম সুনম্য। আর তার বাহু দুটি বিধাতা যেন মনোহরণ ও আলিঙ্গনের জন্যেই গড়েছেন। নর্তকী হীরামাণিক্যখচিত বলয়-কেয়ূরাদি ভূষণে আস্কন্ধ বিভূষিত বাহুযুগলকে ভুজঙ্গগতির অনুকরণে কত রকমেই না বাঁকিয়ে চলেছে……কিন্তু না, সর্বাগ্রে ওই দৃষ্টি দুর্লভ চোখের অন্তস্থল পর্যন্ত এমনভাবে ভেদ করছে যে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠছে। ওই চোখে কত না ভাবের খেলা—কখনো পরিহাস, কখনো স্নিগ্ধকোমল প্রেমাবেশ ওর ওই মণিরত্নখচিত শিরোভূষণের ও কর্ণনাসিকার অলঙ্কারের এরূপ উজ্জ্বলতা বিধান এবং ওই উজ্জ্বল সোনার সিঁথিটি এমন পরিপাটিরূপে ওর মুখটি বেষ্টন করে রয়েছে যে, তাতে ওই সুন্দর শ্যামল মুখখানিতে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে কেমন যেন এক অস্পষ্ট দূরত্বের ভাব—আমাকে স্পর্শ করলেও সে দূরত্ব যেন কিছুতেই ঘুচবার নয়।"

কে এই নর্তকী? পিয়ের লোতির মনোরঞ্জনের জন্যে যাকে সে রাত্রিতে নাচানো হয়েছিল, তার আবাস পণ্ডিচেরীতে নয়। লোতির কথায়, "আজিকার রাত্রির জন্য ওকে বহু দূর হতে আনা হয়েছে। এই প্রখ্যাত নৃত্যপটীয়সী দক্ষিণ প্রদেশের কোন এক বৃহৎ দেবালয়ে মহাদেবের সেবায় নিযুক্ত।"

বৃহৎ দেবালয়ে মহাদেব রামেশ্বরম, তাঞ্জোর, ত্রিচী আর এই মাতুরাতেই প্রতিষ্ঠিত। এরই কোন দেবালয়ের মহাদেবসেবিকা লোতির বাইজী, আসলে সে কি তা হলে দেবদাসী ?

"চিন্তা অন্যদিকে ঝুঁকেছিল। সহসা নর্তকী সম্মুখে ঝুঁকে ধনুকের মত বেঁকে হাতের অঙ্গুলিগুলি বাঁকিয়ে, পায়ের আঙ্গুল ঘুরিয়ে বিচিত্র ভঙ্গীতে নাচতে লাগল। তার সর্বাঙ্গ সর্বক্ষণই যেন স্তনময়।..."

"এইবার নর্তকী মনোহরণ ও ভর্ৎসনার দৃশ্যে অবতীর্ণ। পশ্চাতে বাদকদল গান গেয়ে দৃশ্যটির ভাবকে ব্যক্ত করছে আর গানের সঙ্গে বাঁয়া-তবলা ও বাঁশি বাজাচ্ছে।......"

"নৃত্যশালার এক প্রান্তে নর্তকী কিছুক্ষণ অন্ধকারে নিজেকে আড়াল করেছিল—সহসা আবার এসে উপস্থিত হল। দেহ আপাদমস্তক সোনা ও জহরতে আচ্ছন্ন, চোখ দিয়ে ছুটছে যেন আগুনের হল্কা, কুপিতা নায়িকার ন্যায় রোষকষায়িত নেত্রপাতে আমার উপরে তীক্ষ্ণ অগ্নিবাণ বর্ষণ করছে। আমি যেন ওর কাছে কি এক অপরাধ করে বসেছি, আর তারই জন্যে যেন সে স্বর্গমর্ত্যকে সাক্ষী রেখে আমায় ভর্ৎসনা করছে..."

"অতঃপর এ কি দেখছি! এ কি নিদারুণ উপহাস! নর্তকী হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলে, সে হাসি পরিহাসের হাসি, ঘৃণার হাসি,......... কণ্ঠ একটু উঁচু করে, একটু গম্ভীর স্বরে সে এখন তীব্র হাসি হাসছে। তার হাসি মুখ দিয়ে, ভুরু দিয়ে, উদর দিয়ে, কম্পমান বক্ষ দিয়ে যেন ফেটে বেরিয়ে আসছে। হাসির আবেশে বিহ্বলা রমণীর সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠছে। আর দুর্দমনীয় হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে সে-হাসি দর্শকের রক্তে রক্তে সংক্রমিত করে নর্তকী ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে।......"

অনেকক্ষণ ধরে সে রাত্রিতে দেবদাসী যে নাচ নেচেছিল, পিয়ের লোতি তাতে ক্লান্তিবোধ করলেও তার মুহূর্তে মুহূর্তে ভয় হচ্ছিল, হঠাৎ কখন না-জানি নর্তকীর নৃত্যের অবসান হবে, আর তিনি তাকে দেখতে পাবেন না। কিন্তু নৃত্যাবসানে ফরাসী রসিকচূড়ামণি যে মন্তব্যটুকু লিপিবদ্ধ করেছিলেন, মাতুরার এই রজনীতে চোখের ক্লান্ত পাতায় সে

সহসা ভয়ঙ্কর সংকেতের মত নাড়া দিয়ে উঠল। "শত সহস্র বছর থেকে বংশানুক্রমে যাদের ব্যবসা চলে আসছে সেই পুরাতন নর্তকীর বংশে যার জন্ম, তার হৃদয়কন্দরে মোহবিভ্রম ও ভোগবিলাসের লালসা ছাড়া আর কি থাকতে পারে? ....*"

ভোর হয়ে এসেছিল। দোতালার কলতলায় কলকল জল পড়ার শব্দ। পূবের জানলা দিয়ে উষসী আলো নৃত্য-চঞ্চল অঞ্চল উৎক্ষেপে আমার ঘরের মেঝেয় এসে যখন নামল, কেমন যেন মনে হল, কুমারী শুভলক্ষ্মীর নৃত্যও কিন্তু এই উষসী আলোর মত বাস্তব অথচ অপার্থিব!

* দেবদাসী নৃত্য অংশ যথাসম্ভব পিয়ের লোতির কাহিনী 'ইংরেজ-বর্জিত ভারতবর্ষ' থেকে গৃহীত।

॥ ২৬ ॥ মীনাক্ষী-সুন্দরেশ্বর মন্দিরে

"শিলা জলে ভেসে যায়, পাষাণে সংগীত গায়,
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।"

লিখেছিলেন এক কবি। কোন কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে কবি রসের ভিয়ানে রসিয়ে যে রহস্য করে গেছেন, তার এমন সুন্দর সুস্বর রূপান্তর এখানে এই মাদুরা শহরে মীনাক্ষী-সুন্দরেশ্বরের মন্দির-অঙ্গনে ঢুকতে না-ঢুকতেই চোখে পড়বে, এ যে ছিল কল্পনারও অতীত।

রাতটা তো কেটে গেল বিনিদ্র। সকাল হতে-না-হতে পথের সাথী এসে দরজায় টোকা দিয়েছেন। তারই কিছু পরে স্নান সেরে বেরিয়ে পড়া গেছে মন্দিরে। মন্দির-অঙ্গনে প্রবেশ করে শতপদও এগিয়েছি কিনা সন্দেহ, অমনি পথের সাথী বললেন, পাথরে সুরের আওয়াজ শুনবেন ?

কথাটা স্পষ্ট কানে গেলেও প্রত্যয় হবার নয়। তাই সন্দেহ নিরসন-কল্পে আমরা সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম, কিনা—দেখি কোথায় পাথরে সুরের আওয়াজ হয়। গান যদিও দেখবার নয়, শোনবার; তবুও শোনার আগে দেখতেই তখন আমরা বিশেষ ব্যস্ত।

পথের সাথী ঝকঝকে পরিষ্কার অঙ্গনের এদিকে ওদিকে খুঁজে পেতে একখণ্ড নুড়ি সংগ্রহ করে একটি বহুবাহুসমন্বিত পাথরের স্তম্ভে আঘাত করতেই মিষ্টি আওয়াজ ঝরে পড়ল। এ বাহু, সে বাহু, ও বাহু—যেটিতে আঘাত করেন, অদ্ভুত আওয়াজের ঝঙ্কারে কান পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কবে কে যে এই মন্দির-অঙ্গনে অস্থানে এই সঙ্গীতমুখর বহুবাহু গ্রানাইটের স্তম্ভগুলি নেহাৎই খেলনা হিসাবে তার খেলাশেষে ফেলে রেখে গেছে। সেই থেকে অযুত লক্ষ যাত্রী দর্শক এ মন্দির-অঙ্গন অতিক্রমণকালে একবারটি অবিশ্বাসের হাসি নিয়ে এইখানে ক্ষণকালমাত্র দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে সামান্য নুড়ির স্পর্শে সূক্ষ্ম তারযন্ত্রের মত এই পাথরের স্তম্ভের সঙ্গীতমুখর হয়ে ওঠে! দর্শকমাত্রেই কানকে অবিশ্বাস

করতে পারলেই যেন বাঁচে। শ্রবণেন্দ্রিয় দর্শনেন্দ্রিয় উভয়ই শুনে-দেখে পরখ করে বারেক বিমুগ্ধ হয়ে বলে ওঠে, দেখলাম, শুনলাম, তবু যেন প্রত্যয় হতে চায় না।

আর আমরা ভাবছিলাম, এই মহাভারতে কিছুই যেন অসম্ভব নয়। এখানে বাদ্যযন্ত্রের আলাপে কত সূক্ষ্ম হাসি কান্না বাঙ্ময়! এ মহাভারতেরই একপ্রান্তে নর্তকীরা কাঁচা সরার উপরে নাচত, এ কথাও হয়তো মিথ্যা নয়। এই তো গত রজনীতে যে ধ্রুবনৃত্য দেখলাম, দেহের প্রতি অঙ্গ দেখতে দেখতে অনঙ্গ হয়ে উঠল, রূপ অরূপসাগরে লীন হয়ে গেল ; এই আবার প্রত্যক্ষ পাথরে সঙ্গীতের সুর !

পথের সাথী বললেন, এ আর কি, দক্ষিণী সংগীতের সেরা সমাবেশ দেখবেন তো যাবেন শূচীন্দ্রম মন্দিরে। সেখানে নানা স্তম্ভে নানান সুরের কারিকুরি। ভাবুন দেখি একবার, যে দেশ পাথরে সুর বেঁধে রেখে গেছে, তার সংগীত সম্পদ কি তুচ্ছ করবার ?

এ অতিবিনয়ে আমরা খুশী না হয়ে পারলাম না। কিন্তু পথের সাথী না হয়ে আমরা হলে হয়তো আরো কিছু বলতাম। তবে যাদের ঐতিহ্য-গরিমা অসাধারণ, তারাই হয়তো মহান দাবিকে সহজ কথায় এভাবেই জগতের কাছে প্রকাশ করতে সক্ষম !

বাইরে বিশ্বময় এ মন্দির আজ মীনাক্ষী মন্দির নামে সুপরিচিত। কিন্তু এর আসল নাম, মীনাক্ষী-সুন্দরেশ্বর মন্দির। যিনি শিব তিনিই সুন্দর ! আর সেই সুন্দরেশ্বর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে স্বীয় স্ত্রী মীনাক্ষীর সঙ্গে পূজিত হয়ে আসছেন এ মন্দিরে।

আমরা মন্দিরে প্রবেশ আপাতত বন্ধ রেখে এদিকে ওদিকে ঘুরতে লাগলাম। পথের সাথী তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে যেখানে যা কিছু চোখে পড়ে তারই বর্ণনা দিয়ে চলেছেন।

কিছুদূর অগ্রসর হতেই অসংখ্য দোকানপাট। মনিহারী দোকানের এলাকা ছাড়ালেই ফুলের হাট। মন্দিরের পূজায় ভক্তরা যত ফুল দেয়, দিনরাত্রি সে ফুল এখান থেকেই যায়। অপূর্ব সুন্দর থরে থরে সাজানো

গোলাপের মালা। প্রিয়ার গলায় পরিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। তাই বুঝি মন বলে, 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।'

ওদিকে আরেক সারি দোকানে গোলাপজল আর যত পূজা-উপচার। সরকারী বাঁধা দরে সকল পূজার সামগ্রী ওখানে পাওয়া যায়। দরদামের তাই বালাই নেই।

পশ্চিমদ্বার দিয়ে আমরা ঢুকেছিলাম। প্রায় এক ফার্লং পেরিয়ে পূর্বদ্বারে এসে পেঁৗছলাম। তারপর আবার ফিরতে ফিরতে একসময় ঢুকে পড়লাম সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপে।

ঢুকে পড়লাম, কথাটা বলা যত সহজ, কাজের বেলায় তত সহজে হয়নি। কারণ, দিবালোকে প্রায়ান্ধকার সহস্রস্তম্ভ-মণ্ডপের দ্বারে প্রথমত প্রকাণ্ড একটি তালা লটকানো ছিল, দ্বিতীয়ত বকাসুরসম বৃহৎ-উদর দ্বারী কিছু-না-কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশা করছিল।

তার প্রত্যাশা শুধু কথা দিয়ে পথের সাথী পূরণ করতে চাইছিলেন। আমরা তাতে মৃদু আপত্তি করায় তিনি যেন একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। কিন্তু মাসিমা চকচকে একটি সিকি এগিয়ে দেওয়ায় দ্বারী সেটি ট্যাঁকে গুঁজে প্রকাণ্ড তালায় চাবি লাগিয়ে যেই-না তালা খুলে দরজা সরিয়ে আমাদের পথ করে দিলে অমনি পথের সাথীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,

"এন্নাড়া নী ওরু কালানা তোলাঞ্জিবিট্টা নী এপ্পিড়ি সম্পাদিপ্পে।"

সে কথা শুনে দ্বারী একবার চোখ কুতকুত করে চাইলে। ততক্ষণে পথের সাথীর সঙ্গে সঙ্গে আমি দু-তিনটি স্তম্ভ পেরিয়ে গেছলাম। আরো কিছুটা এগিয়ে মোলায়েম করে জিজ্ঞেস করলাম, এন্নাড়া নী ওরু কালানা ইত্যাদির অর্থটা কী?

পথের সাথী এবারে কিছুটা সহজ হবার চেষ্টা করে বললেন, অর্থ তেমন কিছু না। কিন্তু কি জানেন, তামিলে আমরা ঘরে ঘরে বলে থাকি, একটা পয়সা বেরিয়ে গেলে সে-পয়সাটা আর কি কখনো আয় করা যায়?

—কেন যাবে না! একটি তো মাত্র পয়সা!

পথের সাথী সোৎসাহে ও সগৌরবে হেসে বললেন, সে আপনারা বুঝবেন না। আমাদের অর্থনীতির বনিয়াদ পয়সার পরিকল্পনার উপরে গড়া।

এরই ব্যতিক্রম কেবল দেশময় মন্দিরমালায় দেখতে পাওয়া যায়।

সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপ অতি প্রকাণ্ড। আগাগোড়া পাথরে গড়া! এখন তার দশা দেখলে পাষাণেরও চোখ সজল হয়ে ওঠে। যেখানে এককালে অগণিত জনতার সমাবেশ হত সে স্থান আজ পাছে হঠাৎ মানুষের অপঘাত মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এই আশঙ্কায় এ মণ্ডপে সহসা কাউকে বড় একটা ঢুকতে দেওয়া হয় না। স্তম্ভে স্তম্ভে অপূর্ব ভাস্কর্যের নিদর্শন দর্শনাকাঙ্ক্ষায় যারা এ মণ্ডপে প্রবেশ করে, তাদেরও যত সত্বর সম্ভব বিদায় করবার তাড়া পড়ে যায়।

মীনাক্ষীর স্বামী সুন্দরেশ্বর স্বয়ং শিব, স্বয়ং নটরাজ। আমাদের শাস্ত্রে বলে, শিব দেবাদিদেব, তিনি রাজার রাজা, তিনি যেমন নটের গুরু তেমনি সংগীত থেকে শুরু করে চিত্রকলাদির আদি স্রষ্টা। এহেন দেবতার রাজত্ব যে-মন্দিরে যুগে যুগে জমজমাট, সেখানে তাঁর কত সভার আয়োজন! একে একে নটরাজের পঞ্চসভার দর্শন পেলাম। কনক-সভা, রত্নসভা, দেবসভা, চিত্রসভা ও রাজসভা বা রাজ্যসভা। আজ এ সভাগুলির আর সেদিনকার মত সুদিন নেই—যেদিন লোকের বিশ্বাস ছিল এই সভাগুলিতে মীনাক্ষী সুন্দরেশ্বর উভয়েই কোন-না-কোন সময় ভক্তজনে দর্শন দিতে আবির্ভূত হন।

এখনকার অবস্থা দেখে কেমন যেন মনে হয়, দেশের সাধারণ মানুষ ধূপধুনার বহু জাঁকজমক করেও দেবতার দর্শন না পেয়ে আজকাল মানুষ পূজো করতে কৃতসংকল্প হয়ে উঠেছে।

মাসিমারও কেমন যেন হয়েছে। তিনি মীনাক্ষীদেবীর পূজোর সরঞ্জাম কিনেই ক্ষান্ত হননি, সুন্দরেশ্বরের পূজা-উপচারও সঙ্গে নিয়েছেন। কিন্তু যতই মন্দিরের গর্ভগৃহের দিকে এগিয়ে চলেছেন ততই যেন তাঁর উৎসাহ কমে আসছে। রামেশ্বরমেও মাসিমার যথেষ্ট

উৎসাহ দেখা গেছল। হঠাৎ এই ভাঁটা কেন যে নেমে এল, কে জানে !

দেবীর দরজায় গোণা পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে পূজোর উপকরণ নিয়ে ভেতরে ঢোকা গেল। ঢুকতেই সৌম্যদর্শন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এগিয়ে এলেন। মাসিমার পূজা তিনিই করবেন। করলেনও। গোলাপজলে দেবীকে তুষ্ট করে মাসিমার মালা দেবীকে দিয়ে, দেবীকণ্ঠের মালা এনে আমাদের গলে গলে পরিয়ে দিলেন। তবুও যেন মাসিমার মুখে হাসি ফুটল না, চোখ ভরে আনন্দ উপছে পড়ল না, বুক ভরে উঠল না।

সৌম্যদর্শন পূজারী অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহারে আমাদের নিয়ে চললেন সুন্দরেশ্বরের কাছে। যথারীতি কয়েক মিনিটের মধ্যে 'টিকিট-বরাদ্দ পূজা সেরে সুন্দরেশ্বরের মাল্য এনে আবার সবার গলে পরালেন। কিন্তু কোথায় মাসিমার মুখে হাসি! তিনি যেন মনে মনে কি এক অদ্ভুত অখুশিকে লালন করে চলেছেন। এ নিয়ে প্রশ্ন করতেই ওষ্ঠে কাষ্ঠহাসি হেসেই থেমে গেলেন। তাতেই তাঁর সব কিছু যেন বলা হয়ে গেল।

দেবীর পূজাকালে আমাদের আশেপাশে যারা ভিড় করেছিল, তারা সকলেই সুন্দরেশ্বরের পূজাতেও দর্শক থেকে ভক্তে কেমন করে যেন রূপান্তরিত হয়ে গেল। সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জনে জনে যখন আশীর্বাদ দিচ্ছিলেন তখন যে ব্যক্তি সবচেয়ে ভক্তিসহকারে উভয়স্থানে আশীর্বাদ গ্রহণ করায় সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে বসল, এক সময় তার কাছে ব্রাহ্মণ স্মিতহাস্যে হাত পেতে দাঁড়াতে আমরা সবাই ক্ষণিকের জন্যে বিমুগ্ধদৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিয়ে ছিলাম। দৃষ্টি বিমুগ্ধ হওয়ার কারণও ছিল। প্রথমত তার ওই আশ্চর্য ভক্তি, তদুপরি হাতের আঙুলে তার দু'জোড়া আসল হীরের আংটি আধো-আঁধারে জ্বলজ্বল করে চোখগুলিকে 'আমায় দেখ' বলে ডাকছিল। দ্বিতীয়ত, এই প্রথম আমাদের অন্তত এমন একজন এদেশী লোকের

সঙ্গে সাক্ষাৎ, যার পোশাক-পরিচ্ছদে রীতিমত মোটা টাকার ছাপ আঁকা।

কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে আর কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। তবে কি লোকটি তার হাতের একটি হীরক-অঙ্গুরীয়কই ব্রাহ্মণকে দান করবে! তার জন্যে এত সময়ক্ষেপ কেন? না, ওই যে লোকটি হাতে-ধরা ছোট্ট চামড়ার পোর্টফোলিওটির চেন খুলছে। এক্ষুনি হয়তো বেরিয়ে পড়বে আংটিতে বসানো হীরের চেয়ে বৃহত্তর একখণ্ড হীরক, কিংবা একশো টাকার নোট কয়েকখানা।

কয়েক মুহূর্ত। ঘড়ির কাঁটা থমকে দাঁড়ালো না তো! আমরা সবাই নিস্তব্ধ। প্রত্যেকটি দৃষ্টি তখন লোকটির পোর্টফোলিওর উপরে ঝুঁকে পড়েছে। ভেতরে যথার্থই একতাড়া নোট। তাড়াটিতে হাত বুলিয়ে লোকটি কী যেন চিন্তা করলে। পর মুহূর্তে হাতখানি তুলে নিয়ে পকেটে গলিয়ে কিছুক্ষণ কী একটা নেড়েচেড়ে ধৈর্যের বাঁধ আমাদের ধ্বসিয়ে দিয়ে হাতখানি যখন বের করে ব্রাহ্মণের হাতে উজাড় করে দিলে, তখন সকলেই হতবাক! পোর্টফোলিওর মুখ আলগা করে নোটের তাড়া দেখিয়ে শেষটায় কিনা গোণা দুটি আধ আনা দক্ষিণা! কিন্তু সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কিছুই যেন ভাবলেন না, আমাদের পথের সাথীরও চোখেমুখে তেমনি কিছুমাত্র ভাবান্তর দেখা গেল না। মাঝ থেকে আমরাই যেন লজ্জায় মরে যেতে লাগলাম। অত টাকার মালিক কিনা অনায়াসে ভিখিরীকে দেবার যোগ্য যা তাই দিয়ে খালাস পূজারী ব্রাহ্মণকে!

মন্দিরের যেদিকে তাকানো যায় শুধু চোখে পড়ে পাথরের স্তম্ভে, খিলানে, থামে ভাস্কর্যের আশ্চর্য বিন্যাস। এক-একটি থাম অদ্ভুত দৃঢ়তায় ভারতীয় ঐতিহ্যে সোজা আকাশের দিকে উঠে গেছে। অসংখ্য থাম। প্রত্যেকটি চতুর্মুখী। এবং সর্বাঙ্গে, মাথার দিকে ভারতীয় দেবদেবীর অদ্ভুত অদ্ভুত কাল্পনিক মূর্তি বিভূষিত। পুরাণ এখানে পাথরে পাথরে কুঁদে প্রকাশ করা হয়েছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর থেকে শুরু করে দেবতাদের

অসংখ্য ভক্ত অনুচরদের পর্যন্ত সাক্ষাৎ এখানকার থামে থামে, স্তম্ভগাত্রে সাকার। একটি প্রকাণ্ড স্তম্ভে শিবভক্ত রাবণের নয় মাথার মূর্তি দেখতে পাওয়া গেল। দশাননের দশ মাথাই জানা ছিল, তার একটি হঠাৎ অন্তর্ধানের কারণ জানবার কৌতূহল মনের কোণে ফেনিয়ে উঠতে পথের সাথী তৎক্ষণাৎ সে-কৌতূহল চরিতার্থ করতে গিয়ে যে কাহিনী বলে গেলেন, তার তুলনা চলে কর্ণের কবচকুণ্ডল দানের সঙ্গে।

শিবভক্ত নিকষাতনয় একবার ভাবলেন, নিত্য নিত্য মহাদেবের দর্শন প্রত্যাশায় কৈলাসে কে যায়? তার চেয়ে কৈলাস পর্বতটাকে উপড়ে এনে লঙ্কায় বসিয়ে রাখলেই তো হয়। যেমন ভাবা, অমনি কাজটাকে সেরে ফেলতে দশানন কৈলাস ধরে দিলেন টান।

তখন শিব উমাকে বামে নিয়ে গজাননকে বেদজ্ঞ করে তুলছিলেন। হঠাৎ কৈলাস নড়ে ওঠায় উমা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। উমাকে কিছু না বলে রাবণকে একটু শিক্ষা দিতে শিব কড়ে আঙ্গুলে কৈলাসকে একটু চাপ দিলেন। আর যাবে কোথায়, দশাননের প্রাণ বুঝি খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে যায়! কিন্তু তার অমন মৃত্যু হবার উপায় তো নাই! তাই প্রাণের প্রাণান্ত দশায় অসহনীয় যন্ত্রণায় রাবণ ছটফট করেন আর ভাবেন, এখন উপায়!

উপায় একমাত্র মহাদেবকে তুষ্ট করে পরিত্রাণ লাভ। কিন্তু সহজে কি শিব এখন তুষ্ট হবেন! কঠিন কিছু করা চাই। চকিতে নিকষানন্দনের মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। তাইতো, শঙ্করকে সামবেদ সঙ্গীতে তুষ্ট করতে পারলে হত। তৎক্ষণাৎ দশানন নিজের একটি মুণ্ড নিপাত করে স্বীয় তন্ত্রী ছিঁড়ে বীণা বানিয়ে শুরু করলেন শিবকে তুষ্ট করতে সামবেদগান।

এই দৃশ্যটি পাথরে কুঁদে তোলা হয়েছে, তাই এখানে লঙ্কার রাবণের দশটি মুণ্ডের জায়গায়, নয় মাথা। আর ঘাড়ে তার কৈলাস। তারই শিখরে বামে—উমা শঙ্কর, গজানন আসীন।

এমনিতর আরো অত্যদ্ভুত কল্পনার ভয়ঙ্কর সুন্দর পৌরাণিক কাহিনী সব সারা মন্দিরে পাথরে পাথরে ছড়ানো রয়েছে। এর মধ্যে কোন কোন মূর্তি অতি সুপ্রাচীন। আর মন্দিরের যে অংশ তিন-চারশো বছর আগে সুসংস্কৃত হয়েছে, সেখানকার মূর্তিগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কিন্তু কী আশ্চর্য, এ মন্দিরে কেন, দক্ষিণের যত মন্দির দেখলাম, ভাস্কর্যের বয়স যত কমের কোঠায় ততই তার শ্রী-সুষমায়, গঠনের নিখুঁত সামঞ্জস্যে যেন ক্রমেই খাদ ঢুকে পড়েছে। খাদের মাত্রা ক্রমবর্ধমান এবং একালে এর বিবর্তন চরম দশায় এসে যে ঠেকেছে তারই প্রমাণ দেখা যায় মাদুরার মন্দিরের পূর্বতোরণের পাশে ছোট্ট একটি গোপুরমের আধুনিকী-করণে। এ যেন ভাস্কর্যের আধুনিকতম ব্যভিচারিতা। যেমন এর চোখটাটানো রঙ, তেমনি মূর্তিগুলির বেঢঙ! বিন্যাস বলতে যা বোঝায় তার শেষ সাক্ষাৎ বৃহত্তর মন্দির-ভাস্কর্যে পাওয়া যায় মেরেকেটে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত। তার পর থেকে ভাস্করের অন্ধকারময় যুগের ঘোর অমানিশা সেই যে শুরু হয়েছে এখনো সে সুচির শর্বরী ঘুচবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

অথচ এই মন্দিরের পাথরে কুঁদে তোলা ভাস্কর্যের সেরা নিদর্শন শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠারূপে সম্ভবত বিশ্বে শ্রেষ্ঠ আসনের দাবি করতে পারে। এর ভাস্কর্যভূষিত সেকালের অগণিত থামের অরণ্যে তাকাতে তাকাতে অকস্মাৎ যেন দৃষ্টিবিভ্রম হয়। ওগুলি তো থাম নয়, শান্তির যুগে সৃজনের অমর নিশানা। আর ওই যে একশো ষাট ফিট উঁচু দক্ষিণের গোপুরম সৌন্দর্যের ঋজুতায় স্বর্গপানে ধাওয়া করেছে, তাকে বলা যায় মহাভারতের মোহনীয় শান্তিকামনার সুন্দর ধ্বজস্তম্ভ। এর পায়ের কাছে একবার এসে দাঁড়ালে বলদর্পীর নররক্তপায়ী তলোয়ার আপন তুচ্ছতায় অতি সামান্য ক্ষমতার সীমায় লজ্জায় মুখ লুকায়।

পথের সাথী দুপুর নাগাদ আমাদের নায়েক প্যালেস দেখিয়ে দিলেন।

মীনাক্ষী-সুন্দরেশ্বরের মন্দির যেমন দ্রাবিড় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের অন্যতম সেরা নিদর্শন, নায়েক প্যালেস তেমনি মাদুরাই নায়েকদের ইমারত

শিল্পের অসাধারণ আত্মপ্রকাশ। মন্দিরে কেবল পাথর, পাথর আর পাথর। নায়েক প্যালেসে পাথরকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। এর অতি প্রকাণ্ড স্তম্ভ সোজা আকাশে মাথা তুলেছে। প্রকাণ্ড প্রাসাদে কড়ি বরগার চিহ্ন নেই। প্রাসাদশীর্ষ গম্বুজের পর গম্বুজে সম্পূর্ণ হয়েছে— কেবল গম্বুজগুলির মাথা কিছুটা চাপা। আর এক বৈশিষ্ট্য, এ প্রাসাদে প্রাচীরের পর প্রাচীর তুলে কক্ষবিভাগের বীভৎসতা নেই। অথচ প্রয়োজনে বিরাট প্রাসাদকে বহু কক্ষে অনায়াসে বিভক্ত করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে এরই ক্ষুদ্রতর অনুকরণ দেখা গেছে মহীশূরের শ্রীরঙ্গপটমে টিপু সুলতানের গ্রীষ্মাবাসে। সেখানে অতিরিক্ত হিসাবে জালি এসে ঢুকেছে মাত্র।

কিন্তু নায়েক প্যালেস দেখে বারেক হতবুদ্ধি হয়ে থমকে দাঁড়াতে হয়। বিদেশী ব্রিটিশরাজের বহু বিকৃত রুচিকর সুন্দরধ্বংসী কার্যকলাপের কিছু কিছু ইতিহাস জেনে না-জেনে যাঁরা সময়ে অসময়ে নাসিকাকুঞ্চনে অভ্যস্ত, তাঁদের আমলে তাঁদেরই চোখের সামনে আজো এখানে স্নানের ঘরে পর্যন্ত আদালতের সদর্প অধিষ্ঠান কোন্ প্রকারের সুরুচির পরিচয়বাহক সাধারণ মানুষের বুঝে ওঠা ভার। জাতীয় সৌধের এই বিজাতীয় অবমাননা ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলে না। যেখানে শিল্পরুচির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে আর্ট গ্যালারি ও মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হলে রুচি বাঁচে, সেখানে আদালত বসলে তাকে ভ্যাণ্ডালিজ্‌ম্ ছাড়া কি আর বলা যায়!

॥ ২৭ ॥ মালাবারীদের দেশে

তীর্থযাত্রায় পুণ্যলোভাতুর মন যার, তীর্থের পথ শেষ হলেই তার আর কিছুরই আকর্ষণ থাকে না। কিন্তু তীর্থ যে করে না, পুণ্যের লোভ যার শূন্য, শুধু মন্দিরে মন্দিরে সুন্দরের আহ্বানে সুদূরের ডাকে সাড়া দেবার জন্যে যে সততচঞ্চল, গার তীর্থের পথ কমে এলেই আকর্ষণ নতুন পথে এগিয়ে চলে।

মাসিমা মাদুরাতেই হাঁপিয়ে উঠেছেন। আর কিসেরই বা আকর্ষণ বাকী আছে! আমার অবস্থাটা অন্য রকম, কেবলি পথের আকর্ষণ বেড়েই চলেছে। পুরাকালের মন্দিরের পুরাকাহিনী, পাথরের ভাস্কর্য, সেকালের স্থাপত্য, সুদূর অতীতের অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পিত দেবদেবীর কল্পনা আমায় আকর্ষণ করেছিল। সে আস্তে আস্তে পথচলার বাঁকে বাঁকে ক্রমেই সন্ধ্যাসূর্যের মত অস্তমান। এখন সুমুখে আগামী ভোরের সূর্যের আলোর হাতছানি। কত বিচিত্র প্রাণের বৈচিত্র্যময় ছন্দোবদ্ধ কলকাকলি। এদের আকর্ষণ আরো তীব্র, আরো অনবদ্য।

এই যে প্লাটফরমে পথের সাথী বিদায় দিতে এসে গাড়ী ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে দূরপ্রান্তের পথিকের পাশে দাঁড়িয়ে, মুখে কথা নেই, চোখে অব্যক্ত ভাষার মুখরতা—এই প্রাণের কথা যে মানুষটির, এঁর আকর্ষণ আজ যদি মন্দিরের প্রস্তর-সৌন্দর্যকে ম্লান করে দীপ্ত হয়ে উঠে থাকে, দোষ দেব কাকে। মন্দিরে মন্দিরে যুগে যুগে মানুষের বংশপরম্পরা যা কিছু খুঁজে ফিরেছে, তার সন্ধান যদি না-ই মেলে অথচ মানুষ সবার উপরে সত্য হয়ে দর্শন দেয়, বাউলের সুরে সুর মিলিয়ে বলতেই হয়, 'মানুষ দেবের সার।'

চিন্তার অতলে তলিয়ে গেছলাম। গাড়ী ছাড়ার হুইস্‌লে চমকে উঠতে দেখি, অচিন্ত্য ইঙ্গিতে উঠতে বলছে গাড়ীতে। তখনো পথের সাথী পাশে। শুধু একবার, শেষবারের মতন বললেন—চললেন……

বয়সের ব্যবধান, স্থান কাল সব ভুলে কী যেন বলতে চাইলাম, তৎক্ষণাৎ মুখের কথা মুখে থাকতে ত্রিবান্দ্রমের পথে লৌহরথ ছুটতে শুরু করল।

সোনালী সকাল! গাড়ীর কামরায় ভীড় মন্দ নয়। যাত্রীদের দেখলে দিব্যি মোলায়েম বলে মনে হয়। এবং চোখেমুখে এমন একটুখানি লাবণ্যের ছোঁয়া লেগে আছে যার দৌলতে সদ্য পেছনে ফেলে আসা লোকদের থেকে এদের অনায়াসে আলাদা করে দেখা যায়। সত্যিই তাই, তামিলনাদ ছাড়িয়ে আমরা চলেছি কেরালায়, মালাবারীদের দেশে। তামিল চেহারায় সচরাচর যে রুক্ষতা, মালাবারীদের মধ্যে তার চিহ্ন তেমন নেই।

রেলগাড়ী এখনো তামিলনাদের মধ্যেই রয়েছে। তবে যাত্রীসাধারণ সবাই এ কামরায় মালবারী। সহজ হাসিঠাট্টায় সকলেই মশগুল। কেবল মাঝে মাঝে বহিরাগত তিনটি নরনারীর উপস্থিতি যা একটু আধটু বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নইলে বেশ অনুমান করা যায়, ঘরমুখো এগিয়ে চলার আনন্দে এদের এখন উচ্ছ্বাসের বলগা ছেঁড়ার সময় আসন্ন।

কেবল মানুষ নয়, মাটিও এদিকে পালটাতে শুরু করেছে। শঙ্কর-নয়ইনারকোয়েল স্টেশন পেরোতে যদিও রীতিমত রুক্ষ প্রান্তরের আগুনে হাওয়ায় পুড়তে হল কিন্তু আর সামান্য কয়েক মাইল যেতেই আবহাওয়ায় স্নিগ্ধতার আমেজ লাগল। 'টেনকাসি' প্লাটফরমে গাড়ী দাঁড়াতে অদূরে আকাশ-আড়াল-করা যে পাহাড় চোখে পড়ল, তার শ্রী, অরণ্যসমারোহ সবচেয়ে বড় করে যে বিজ্ঞাপনটি জাহির করল সে হচ্ছে, বরুণ দেবতা এখানে অকৃপণ, প্রকৃতি এখানে রূপশ্রী। আর তার অঞ্চল শ্যামল, সবুজ শোভায় টলমল।

দুচোখ ভরে নিতে চাইছিলাম ওই অচঞ্চল শোভায়। এমন সময় পাহাড় যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। পাহাড় নয়, লৌহরথ পাহাড়ী পথে রওনা দিল। হঠাৎ কে একজন ছুটতে ছুটতে এসে এদিকের হাতল ধরে ঝুলে পড়ল। একটা আর্তস্বর অকস্মাৎ চারিদিকে মুখর হয়ে

উঠতেই চেয়ে দেখি, যে ঝুলছে তার বগলে একপাঁজা কী যেন এক্ষণি চটপট করে ঝরে পড়বে আর তা সামলাতে গেলেই লোকটি পাকা আমটির মত টুপ করে খসে পড়বে চলন্ত গাড়ীর দরজা থেকে একদম পাথুরে মাটিতে।

সেই ভয়ঙ্কর অবস্থা অন্তরে যে শঙ্কার তুফান তুলেছিল, তার অবসান হবার পূর্বেই স্বয়ং অচিন্ত্যচরণ একটি কাজের মত কাজ করে বসলে। দরজা খুলে সোজা লোকটিকে টেনে তুলে এনে হাজির করলে মাঝ-খানটাতে।

অবাক কাণ্ড! এ যে মৌনীবাবা। তাঁর বগল থেকে ঝুপ করে যে বস্তুগুলো মেঝেয় প'ল, তার উপরে হুমড়ি খেয়ে কামরাসুদ্ধ লোক সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল, কোর্টালম!

অমনি টানাটানি পড়ে গেল ওগুলি নিয়ে। আমাদেরও চোখ পড়ল, ছবি, ছবি আর ছবি। নিসর্গচিত্রে দেখছি হাত আছে মৌনীবাবার। আকাশ থেকে ঝরণা নেমে এসেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। শরতের ঝরণা, গতিবেগে মেঘে মেঘে যেন অশনির চমক লাগিয়ে দিতে চাইছে। কোন ছবিতে বা পাহাড় ঢেকেছে মেঘে। হঠাৎ সূর্য জেগে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে মেঘ-পাহাড়ের হৃদয় ছুটিতে। চারপাশের অরণ্যে রঙে রঙে কানাকানি পড়ে গেছে।

ছবিগুলি দেখেশুনে সবাই রেখে দিলে; যে যার নিজের ব্যাপারে নিজেকে গুটিয়ে নিলে। আমরা সরে বসে মৌনীবাবাকে বসতে দিলাম। একটুক্ষণ বাদে তিনি চিরকুট মারফৎ আবেদন পেশ করলেন, জানলার পাশে বসতে পেলে কৃতজ্ঞ হবেন।

এতক্ষণে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাবার ফুরসৎ হল। আহা, মরি মরি! এ কোন্ রাজ্যে এলাম। এই যে পাহাড়, যেন হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায়। কি তার রং, কি বিরাট তার দেহে অরণ্যের বন্ধন। উপরে সজল মেঘের নীল অঞ্জন, মাঝখানে মেঘ বিদীর্ণ করে ভানু যেন 'ভানুমতীর-কুহক' হেন রঙের হাট বসিয়েছে। কোন ক্লান্ত পসারিণী প্রকৃতির

আঁচল বিছিয়ে পসরা সাজিয়ে ইশারায় ডেকে ডেকে বলছে, আয়, কে নিবি তোরা আয়।

মাদুরা ছাড়িয়ে কিছু পথ পেরিয়ে যে পাহাড় দৃষ্টিপথে এসেছিল, সে ছিল কোন এক নিকষা রাক্ষসী। নাতি-নাতনির হাড় চিবিয়ে যার বিকৃত ক্ষুধার দাঁতগুলো বেরিয়ে এসেছে। আর চারদিকের জ্বলন্ত চিতায় মেঘ সদয় হয়ে জল ঢালতে এলে সে যেন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে মেঘকে বহুদূর পর্যন্ত তাড়া করে ফিরছে। ওই রাক্ষসী পাহাড় পেছনে ফেলে পশ্চিমঘাট শৈলমালার স্নেহাঞ্চলের মেদুর পরিবেশ দিয়ে গাড়ী আমাদের আনন্দে উল্লাসে ছুটে চলেছে। হাওয়া বিলকুল পালটে গেছে, অগ্নিদাহের দস্যিপনা ঘুচিয়ে দিয়ে নীলাঞ্জনের প্রলেপে প্রাণটাকে নতুন করে মাতিয়ে দিয়েছে।

পাহাড়ের মাঝে মাঝে নারিকেলকুঞ্জের ঘনসন্নিবেশ। আশেপাশের উপত্যকায় হাসছে সবুজ ক্ষেতে প্রাণবন্যায় শ্রমের রক্তকণা ধান। ঐ ধানের ক্ষেতে পাহাড়ী বাতাস, নাচছে যেন উমার লাস্যনাচ। তারই নাচের তালে তালে ফুল ফুটেছে থরে থরে পশ্চিমঘাটের সানুদেশে।

অধিত্যকায় ছোট্ট ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম। তালপাতার ও টালির কুঁড়েঘর। মাঝে মাঝে ছবির মতন নানা ফলমূলের বাগান।

কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্যলোকে পেঁ ৗছাতে আমাদের আরো কিছু বাকী ছিল পথ। একটি পাহাড়ী ছোট্ট নদীর পুল পেরিয়ে, ট্যানেলের মধ্যে দিয়ে পর্বতের বক্ষ ভেদ করে ওপাশে পৌঁছাতে যে দৃশ্যের দর্শন পেলাম তার বুকে একখানি কুঁড়ে বেঁধে আমৃত্যু কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। হিমালয়ের বরফমোড়া মহিমময় গরিমায় আর যাই হোক, ঘর বাঁধা যায় না। কিন্তু পশ্চিমঘাটের এই শৈলমালার অঞ্চলে বরফ না পেলেও ক্ষতি নেই। এখানে যে অরূপ রূপের খনি চারিভিতে রঙে রঙে ছড়ানো রয়েছে তাকে সহজে বরণ করে নেওয়া যেতে পারে। যাকে ধরতে ছুঁতে নিজেরই অপঘাতে অকস্মাৎ হারিয়ে যাবার ভয়, সসঙ্কোচে শঙ্কিত শ্রদ্ধায় তার পায়ে শির নত হয় বটে, তবে তা শঙ্কিত শ্রদ্ধাই। কিন্তু ভালোবাসায় ভরা অন্তরের টান আলাদা বস্তু। তাই

গৌরীশঙ্করে চড়েও তুঃসাহসী তেনসিংদের তুরুতুরু বুকে ঘরে ফিরতে পারলে তবেই নিঃশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়। সুতুর্গম হিমতীর্থে যে যাত্রীরা যায়, তারাও বোধ করি ভয়ঙ্করের কঠিনতম শাস্তিকে ফাঁকি দেবার প্রয়াসে অপেক্ষাকৃত কম ভয়ঙ্করের পথ অতিক্রম করে ক্ষমাসুন্দর কেদারবদরীর কৃপা-অভিলাষেরই কামনায়। ভালোবাসা, বুকের টান, অন্তরের আসক্তি, সৌন্দর্য-অনুভূতি সব কিছু সেখানে গিলে ফেলে পদে পদে ধ্বসে যাওয়ার প্রতীক্ষারত, প্রাণঘাতী, প্রাণহীন অতি প্রকাণ্ড বরফের ভয়ঙ্কুরে চাঁইরা। সে আসন্ন মৃত্যু পেরিয়ে ফিরে এলে পরে তবে অনুভূতি স্বাভাবিক হয়ে অতিসুন্দরের প্রশংসায় মেতে উঠতে পারে।

এখানে মৃত্যু পদে পদে ফাঁদ পেতে নেই। দেবতার পায়ে পাপ উজাড় করে দিয়ে পুণ্যের ভারা বয়ে স্বর্গের পথে পাড়ি জমাবার লোভাতুর পুণ্য কামনায় পথের সৌন্দর্যকে ঢাকা দেবার সম্ভাবনাও এপথে সুদূরপরাহত। তাই তুচোখ ভরে যায় প্রকৃতির উজাড় করা রূপের অযাচিত উপচারে। মনের স্বাদ যেন ঝলকে ঝলকে উপছে পড়ে।

আরো কয়েক মাইল পথ নিসর্গের বিচিত্রতর ছন্দোবদ্ধ রূপশ্রী দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেলাম। এক ইস্টিশনে গাড়ী দাঁড়িয়ে ফের রওনা হতে চলতি গাড়ীতে এক ভিখিরীর আবির্ভাব হল। সে তার নিজের তৈরি অদ্ভুত খঞ্জনী বাজিয়ে বেশ দৃপ্তসুরে গান ধরে দিলে। নির্বাচনকালে আজকাল একরকমের গালভরা প্রতিশ্রুতির চটপটে শব্দের যে সুরবিহীন গান প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়, তাতে গলায় যার সুর আছে তার পরশ পেলে যেমন শোনায়, ভিখিরীর গানও তেমন শোনাচ্ছিল। আর তাই শুনতে শুনতে আমাদের সুমুখে বসা মালাবারী মেনন মশায় মনে মনে গজরাচ্ছিলেন। তাঁর চোখমুখের ভাব দেখে ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলাম, কী গাইছে।

শ্রীমেনন ফেটে পড়লেন, গাইছে গোরস্থানের গান। কী বলছে জানেন? কুবের আর গরিব একসঙ্গে কখনো বাস করতে পারে না।

আমি বললাম, এতে অন্যায় কি আছে ?

তিনি বললেন, অন্যায়ের কথা নয়, ও যে এই গাড়ীতে ভিক্ষে করতে এসেছে, ওর টিকিট আছে ! বলুন দেখি ভিক্ষে না করে ওকে আমার ক্ষেতে গিয়ে কাজ করতে, করবে ভেবেছেন ! ওদের মাথায় বড় বড় বুলি ঢুকেছে। কাজ না করেই দিব্যি যাতে আপনার আমার মাথায় হাত বুলিয়ে চমৎকার দিন চালানো যেতে পারে তার নাকি ব্যবস্থা দেশের বড়লোকদের মেরে শীগ্রি হল বলে। যারা এদের ক্ষ্যাপায় তারা ভুলেও কি ভাবে, ঘৃণার বীজে বিযাক্ত ফলই ফলে, অমৃত কখনো মেলে না।

শ্রীমেনন বড্ড জ্বলে উঠেছেন। তাঁকে নিরস্ত করতে চাইলাম : আপনারা ঘৃণা না করলে ওদের বিষ আস্তে আস্তে ঝরে যাবে।

আমার কথায় তিনি আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তীব্র স্বরে বললেন, জানেন না তো এদিককার অবস্থা। যার সামান্য জমি আছে, কিছু পয়সা আছে, তারাই ওদের কাছে কুবের। তাদের রক্তে স্নান করতে না পারলে ওদের রাজত্ব আসছে না। অতএব মারো কাটো, লুটেপুটে নাও, ভেঙ্গে তচনচ করে দাও, আগুন জ্বালাও —এই এদের মোক্ষম বাত। এদের দাপট কত ভুক্তভোগী না হলে বুঝবেন না।

ভিখিরী একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল। গাড়ী লাইন-মেরামতি এলাকায় ধীরে চলতে টুপ করে নেমে অন্য কামরায় চলে গেল। শ্রীমেনন ওইদিকে কিছুক্ষণ কটমট করে চেয়ে রইলেন। তাঁকে ঘাঁটাবার আর ইচ্ছে না হওয়ায় আবার বাইরের দিকে দুচোখ মেলে দিলাম।

মৌনীবাবা সেই কখন থেকে সেই যে তন্ময় হয়ে নিসর্গের শোভায় তাঁর দৃষ্টিকে সমর্পণ করে দিয়েছেন, একবারটিও কামরার দিকে আর ফিরে চাইছেন না। তিনি শিল্পী। দেখবার চোখ আছে তাঁর। সে চোখে কোন্ রূপসীর সোহাগসিঁদুর পরশ দিয়ে গেছে সে আর কেউ জানে না। তাই চোখ দুটি তাঁর দূর পাহাড়ের রঙে রঙে

রূপসীর সুরের নাগাল খুঁজে ফিরছে। এদিকে এতক্ষণ যে ভিখিরী কুবেরে এত কাণ্ড, তার এক বর্ণও মৌনীবাবার কানে ঢুকেছে কিনা সন্দেহ।

গাড়ী এখন সমুদ্রতল থেকে হাজার ফিট উঁচু দিয়ে পার্বত্য উপত্যকা-পথে এগিয়ে চলেছে। অনেক নীচে নারকেল সুপারির বাগানের মধ্য দিয়ে পায়ে হাঁটা পথ গিয়েছে। দুপাশে পর্বতমালা উঠে গেছে আকাশ ভেদ করে। গায়ে তার নানারঙের মখমল। পোশাকে-আশাকে কত তার বাহার। দূরে দূরে শালবন। শাল নয়, সম্পদ। যত শাল, তত সম্পদ সমৃদ্ধি। শালের যত বয়স বাড়ে ততই বাড়ে দাম তার।

চলন্ত চিত্রপট—একটানা প্রকাণ্ড, অতিপ্রকাণ্ড ক্যানভাসের পর ক্যানভাস। জগৎস্রষ্টার নাট্যশালায় যত বৈচিত্র্যের সমারোহ তার অখণ্ড এক চিত্রশালা এখানটায়!

এ শোভা লেখার নয়, দেখার। এর ব্যঞ্জনা বলার নয়, চোখ দিয়ে, অন্তর দিয়ে স্পর্শ করবার। এমন এ রূপ, এ লোটার নয়, চোখে চোখে দুর্লভতার শতদলে ফোটার!

গাড়ী এতক্ষণ পার্বত্যঘাটের পথে পাড়ি জমাচ্ছিল, এবার সমতলে পড়ল। কি একটা স্টেশনে মেননরা দল বেঁধে নেমে পড়লেন। মৌনী বাবা ফিরে চাইতে না-চাইতে হঠাৎ টিকিট-চেকার এসে হাজির হলেন।

চেকারসাহেব ঘাড় বেঁকিয়ে গুরুগম্ভীর চালে আমাদের টিকিট ক'খানি দেখে নিয়ে মৌনীবাবার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তিনি তখনো বাইরের দিকে সমানে তাকিয়ে। এদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। চেকার সাহেব শিকার ধরার মেজাজে গায়ে একটু খোঁচা দিয়ে তাগাদা দিতে মৌনীবাবা এ কি করলেন! একেবারে মৌনতা ভেঙ্গে বলে উঠলেন, হোয়াট···

তাঁর মেজাজে খানিক কাজ হল। কিন্তু টিকিট দেখাতে বলায় তিনি যখন তখনকার সর্বোচ্চ শ্রেণীতে তাঁর রিজার্ভেশন রয়েছে বলে জানালেন তখন চেকার তো দূরে থাক আমাদেরও কেমন যেন খটকা লাগছিল।

আর রেলের বহুবিজ্ঞ কর্মচারীটি বিজ্ঞতার হাসি হেসে বললেন, আগে ভাড়াটা দিয়ে দিন তো, পরে রসিকতা করতে হয় করবেন।

এ কথা না শুনে মৌনীবাবা রেগেই আগুন! তড়বড় করে তিনি কি সব বলেন, হঠাৎ একটু কথা আটকায়। আবার চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে বলে ওঠেন, নেহাৎ ছোটলোক তাই তাঁর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গেলেন। নইলে এক্ষুনি বেয়াদপির শিক্ষাটা হাতে নয়, ভাতে মেরেই দিতে কসুর করতেন না।

শেষটায় ব্যাপারটা এতদূর গড়াল যে, মাসিমা কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকলেন। ভাগ্যিস, কি একটা বড় স্টেশনে সেই সময় গাড়ী থামায় রক্ষে।

গাড়ী থামতেই চেকারসাহেবের সবিক্রম ক্রোধের চাপা আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। মৌনীবাবাকে গর্জাতে গর্জাতে কামরা থেকে নামতে হল। অচিন্ত্য, আমিও নেমে পড়লাম। দেখাই যাক না ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়। অচিন্ত্য একেই মৌনীবাবার রকমসকম দেখে প্রথম থেকেই সন্দিহান, তায় ঐ যাঁর বেশবাস তাঁর আবার রিজার্ভেশন! বেমালুম ধাপ্পা ছাড়া কী আর হওয়া সম্ভব! সে সুনিশ্চিত হতে চাইলে।

প্লাটফরমে নামতেই চেকারসাহেব মৌনীবাবাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চললেন। আমরা সমান তালে হাঁটতে না পেরে ছুটতে লাগলাম। দেখতে দেখতে বেশ ভীড় জমে গেল। ভীড় হটাতে পুলিশ এসে জুটল। সবার চোখে মুখে তীব্র কৌতূহল। মৌনীবাবা কিন্তু বগলে সেই ছবিগুলি নিয়ে নির্বিকার।

চেকার তেড়ে উঠে নাম ধাম চাইতে মৌনীবাবা আবার মৌন হয়ে গেলেন। তাই-না দেখে চেকারের আনন্দ দেখে কে! অচিন্ত্য নিম্নস্বরে বললে, কেমন ঠিক হল তো।

হঠাৎ মৌনীবাবার হাতখানি আলখেল্লার পকেটে ঢুকে কী একটা খুঁজেপেতে বের করতে চাইলে যেন। চারপাশের লোকজন ক্রমেই

অধৈর্য হয়ে উঠতে লাগল। চেকারমশায় ক্রুর হাসিতে শিকারটিকে ভাল করে দেখে নিলেন। পুলিশের সঙ্গে তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ ইসারায় কথাবার্তা প্রায় সারা। এমন সময় মৌনীবাবা এগিয়ে ধরলেন, চিরকুট নয়, একখানি ছাপানো কার্ড। তাঁর নাম আর রিজার্ভেশনের মালিক এক হওয়ায় প্লাটফর্মসুদ্ধ লোকজন তো থ!

কিন্তু এ যেন কিছুতেই মনঃপূত হবার নং। সেই ঈশপের গল্পের চিরাচরিত কায়দায় চেকার বিনা টিকিটের দোষে শিকার ধরতে না পেরে মৌনীবাবাকে পুলিশের হাতে সঁপে দিলেন। দোষ একটা মিলল বৈকি! না, দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং সরকারী কর্মচারীর কার্যে বাধাদান।

মাদ্রাজ রাজ্যে এ একটা মারাত্মক অপরাধই বটে। অতএব গাড়ী যখন ছাড়ল মৌনীবাবাকে রেখেই আমাদের চলতে হল। মাসিমা সব শুনে যত না চেকারকে ধিক্কার দিলেন, তারচেয়ে বেশী বকলেন আমাদের। আমরা কেন ভদ্রলোককে অমনভাবে অস্থানে পুলিশের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম। বারবার কেবলি বলতে লাগলেন, অমন চমৎকার লোকটা, কারো কোন ক্ষতি যে করল না, তাকে পুলিশে একবার ছুঁলে আঠার ঘা।

সারা তুপুরটা এই নিয়ে আমাদের গেল ভীষণ মন খারাপ। মাসিমা গুম হয়ে রইলেন। মুখে ফলটি পর্যন্ত তুললেন না। অচিন্ত্যচরণ একজন ভালমানুষকে অহেতুক সন্দেহ করায় মর্মে মরে রইল। আমার কথা না বলাই ভাল।

এইভাবে তুপুর গড়িয়ে গেল। অপরাহ্ণে এমন একটি অদ্ভুত নাটকীয় দৃশ্য আমাদের কামরার মধ্যে ঘটতে চলেছিল যাতে অফুরন্ত হাসির খোরাক থাকায় মাসিমাকেও সরস হাসিঠাট্টায় মশগুল হয়ে উঠতে দেখা গেল।

ব্যাপারটা তেমন ভয়ঙ্কর কিছু নয়, যদিও নাটকীয় দৃশ্যের নায়ক-নায়িকা উভয়ই দেখতে দিনের আলোতে রীতিমত অনাটকীয়। মাঝপথে এক সময় এরা তুই প্রাণী আমাদের কামরায় উঠে জুড়ে বসেছিল। সেই

থেকে তাদের ঢলাঢলির অন্ত ছিল না। প্রথমটা আশা করা গেছল, সময়ে সামলে যাবে। কিন্তু সামলে যাওয়া দূরে থাক, ক্রমেই ওরা এতদূর বেসামাল হয়ে উঠতে লাগল যে, ওদের বেলেল্লাপনা কেবলি হাসির উদ্রেক করতে থাকল।

হঠাৎ কখন মাসিমা হেসে ফেললেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন,

"লঙ্কা জিনিল যে তার নাম কি?"
"দশ আনি ছ আনি ভাগ আমি জানি কি।"
"আজ থেকে হবে ভাগ সমান সমান।"
"লঙ্কা জিনিল বেটা বীর হনুমান।"

আমরা বললাম, সে কেমন মাসিমা? মাসিমা সহাস্যে বুঝিয়ে দিলেন, সে আর কিছু না, এই আমাদের সামনে বসা সমান সমান।

সৌভাগ্যক্রমে ওরা আমাদের আলাপের অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারেনি। কিন্তু মাসিমার ছড়ায় কাজ হতে বিলম্ব হয়নি। পরের রাস্তাটুকু বেলেল্লাপনার হাত থেকে যে পরিত্রাণ পাওয়া গেছল, সে ওই সরস ছড়ারই গুণে।

।। ২৮ ।। ত্রিবান্দ্রমের পথে

এই ত্রিবান্দ্রম। আসন্ন সন্ধ্যার ঘোমটা টানা আঁধারে গাড়ী এসে থামল। কুলিতে মালপত্র মাথায় তুলে নিল। মাসিমা খুব হুঁসিয়ার। তিনি অচিন্ত্যচরণকে বাংক্‌টায় ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিতে বলে নিজে ঝুঁকে পড়ে আসনগুলির তলদেশ দেখে নিতে লাগলেন। হঠাৎ কী একটা দেখে বললেন, ওই কোণায় একটা কী যেন দেখা যাচ্ছে দেখ।

আমি মাথা গলিয়ে তলা থেকে যে বস্তুটি বের করে আনলাম, তার কভারে রুচিবানের ছাপ আঁকা। তবু ওটি আমাদের কারো না হওয়ায় আসনের উপরে রেখেই আমরা নেমে আসছিলাম। দরজার কাছে এসে সহসা মাসিমা বললেন, অচিন্ত্য, ওটি নিয়ে এস না। কি জানি কে ফেলে গেছে—রেখে গেলে কুলিরাই হজম করে ফেলবে।

কুলিদের চেয়ে আমরাই যে ওটি হজম করবার যোগ্যতর পাত্র, এমন সন্দেহ না থাকলেও অচিন্ত্যচরণ চামড়ার কভারওয়ালা বস্তুটি সঙ্গে নিয়ে নামল। তাড়াতাড়িতে ভেতরে কি আছে-না-আছে সে যেমন দেখার সুযোগ হল না, কুলিরা অনেকটা এগিয়ে যাওয়ায় ওদের পেছনে ছুটতে হল। ছুটতে ছুটতে গেট ছাড়িয়ে ট্যাকসিতে চড়ে হোটেলের দরজায় এসে নামলে পরে মনে পড়ল, তাই তো জিনিসটাকে স্টেশনে জমা দেওয়া হল না। কথাটা প্রকাশ করতেই মাসিমা তাঁর বাস্তববুদ্ধিতে প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, ওখানে জমা দেওয়াও যা সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়াও তাই। যদি মালিকের সন্ধান না-ই পাওয়া যায়, কন্যা কুমারিকায় সাগরকে দিতে তো আর বাধবে না।

অচিন্ত্যচরণ তৎক্ষণাৎ ওটি মাসিমার হাতে দিয়ে বললে, সেই ভাল। এখন তাহলে মাসিমা এটি আপনার কাছেই রইল।

মালপত্র নামিয়ে হোটেলে একটু বসতে-না-বসতেই গরম-জল এল। এদিকের যে আবহাওয়া, দূর পথ পেরিয়ে এসে হঠাৎ অবেলায় ঠাণ্ডা জলে

স্নান করলে পরে অসুখে না ধরে, তার জন্যই এ গরম জলে স্নানের সতর্কতা।

স্নান সারতেই শরীরটা এমনি তাজা হয়ে উঠল যে, ঘরের মধ্যে বসে থাকতে আর মন চাইল না। সন্ধ্যার পরে মাসিমা কোথায় বা যাবেন। তাঁকে রেখে আমরা দুই বন্ধুতে বেরিয়ে পড়লাম নগরীর রাজপথে।

পিচমোড়া চমৎকার রাজপথ। পৌর শাসকরা যে ঘুমিয়ে নেই তারই সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু শহর কি এরি মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে? কয়েকদিন হয় পূর্ণিমা চলে গেছে। আকাশে চাঁদ উঠবে উঠবে করছে। পথের দুপাশে গাছের সমাবেশ থাকায় বিজলীবাতির উপরে তার ছায়া এসে পড়েছে। আলোছায়ায় এ রজনীর পরিবেশটি যেমন চমৎকার, তেমনি দেহমনও আমাদের ঝরঝরে হওয়ার মত।

চলতে চলতে স্টেশনের কাছটাতে পার্কে এসে বসলাম। অদূরে এক সার বাস দাঁড়িয়ে। তারই ওপাশে ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানরা যাত্রীর তল্লাসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। দু-একখানা ট্যাক্সি খালি চক্কর দিচ্ছে যদি দৈবাৎ ভাগ্য খোলে। পার্কে যারা ভীড় করেছিল তারা একে একে বিদায় হতে লাগল। চারপাশ নিস্তব্ধ হয়ে এল।

শিরশির করে হাওয়া বইছিল। হঠাৎ কখন যেন একটু একটু ঠাণ্ডার আমেজ! নতুন দেশ, নতুন হাওয়া। কানে কানে তার ভাষা বলে যেতে থাকে আর অন্তর উথলে উথলে ওঠে তাকে অক্লেশে আত্মসাৎ করবার উল্লাসে।

কতক্ষণ যে এইভাবে কাটল, সময়-বুড়ো তার কাঁটায় হিসাব কষলেও আমরা কেমন যেন সে খোঁজ সানন্দে হারিয়ে ফেলেছিলাম। কেবল এরই মাঝে কখন যে রাজপথে জনকোলাহল পূর্ণ হয়ে উঠল, হঠাৎ তারই সুবাদে ওদের সাথে মিশে যেতে চাইলাম।

হোটেল থেকে যে পথ দিয়ে এসেছিলাম, এ পথ সে পথ নয়। এ যে দেখছি—চারদিকে আলো, আলো আর আলো! রোশনী আর রোশনী!

সামনে সুসজ্জিত হাতীর পিঠে সোনালি হাওদা চেপেছে। দূর থেকে দেখা যায়, মাথাগুলো আভরণের সঙ্গে সঙ্গে দুলছে। তার পেছনে অশ্বারোহী সৈন্যদল মুক্ত কৃপাণ হাতে। তারই পরে মোটরে দলে দলে কারা সব! আরো পেছনে সারিবদ্ধ নরনারী।

ব্যাণ্ড বাজছে। জয়োল্লাস আকাশ ছুঁয়ে বাতাসে প্রচণ্ড আওয়াজ তুলছে। আতসবাজীতে দশদিক বিচিত্র রঙে ছেয়ে গেছে।

সামনের হাতীর সারি মোড় নিয়ে অন্য পথে বেঁকে গেল। সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা! দেখবার জন্যে ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে সুসজ্জিত হস্তীযূথের সন্নিকটে যখন পেঁ ছানো গেল তখন শোভাযাত্রা প্রাসাদের সিংহদ্বারে থমকে দাঁড়িয়েছে। আর একটি লোক দুই হাতে দুই তলোয়ার নিয়ে প্রাণপণে শূন্যপানে বন্‌বন্ করে ঘোরাচ্ছে আর আওয়াজ সপ্তমে চড়িয়ে জিগীর ছাড়ছে, ত্রিবাঙ্কুর রিয়াসৎ জিন্দাবাদ!

তলোয়ারের কসরৎ দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেছলাম। চারপাশের ভীড়েরও হয়তো তাক লেগে গিয়ে থাকবে।

এমন সময় পেছনের হাতী থেকে কে একজন নামতেই আশেপাশে গুঞ্জন উঠল, শ্বেত হস্তী।

সে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে তলোয়ারভাঁজা লোকটির কটিদেশ এক হাতে জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে ধরতেই সবাই তো একেবারে তাজ্জব! তখনো সে তলোয়ার ভাঁজছিল। তারপর হঠাৎ তলোয়ারে তলোয়ারে ঠেকে দুখানি তলোয়ারই টুকরো-টুকরো। চারপাশে যে ভীড় দাঁড়িয়ে গেছল তার মাঝ থেকে অমনি চীৎকার উঠল—জয়হিন্দ্!

সোল্লাসে ভেসে চলেছিলাম। হঠাৎ বাধা পেতেই চোখ রগড়াতে চারদিকে চেয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই। কেবল অচিন্ত্যচরণ পাশে বসে।

হুঁশ হতেই সে বললে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও হাসিস্ নাকি। আচ্ছা ঘুম বটে!

তা হবে, ঠাণ্ডা হাওয়ার মৃদু স্পর্শে চোখ বুজে এলে কি করি। কিন্তু একি স্বপ্ন? স্বপ্ন হলেও সত্যি।

ব্রিটিশরাজ ভারত ছাড়ার মুহূর্তে ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান এ রাজ্যকে ভারতের সঙ্গে অঙ্গীভূত না করে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ত্রিবাঙ্কুরের আওয়াজ তুলে দেশবাসীকে তাক লাগিয়ে দিতে গিয়ে নেহাৎই হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন। আর ভারতের নবজাগ্রত ঐক্যচেতনার অজেয় অভিযানের দুর্দমনীয় গতির সুমুখে সে সময় স্বাধীন স্বতন্ত্র ত্রিবাঙ্কুরের আওয়াজ যে এই দেশীয় রাজ্যের ক্ষুদে দেওয়ান নিজের বলে নয়, অন্যের ইসারায় তুলেছিলেন, সেই সন্দেহই সকলের মনে দানা বেঁধে গেছল। সৌভাগ্যক্রমে ত্রিবাঙ্কুরের আপামর জনসাধারণ সে আত্মঘাতী আওয়াজে কণ্ঠ মিলাতে রাজী হয়নি। তাই শেষ পর্যন্ত দেওয়ানের বিদায়ব্যবস্থা সাঙ্গ হবার পরে ত্রিবাঙ্কুর স্বাধীন ভারতে সত্যিকারের মুক্তির মুখ দর্শন করতে পেরেছে।

বেশ রাত হয়ে গেছল। আস্তে আস্তে পার্ক ছেড়ে রাতের আস্তানায় ফিরতে ফিরতে কেবলি ঘুরেফিরে স্বাধীনতার প্রাক্‌পর্বের দেশীয় রাজ্য-গুলির অভাবনীয় অবস্থার কথা মনে পড়ছিল।

* * *

একদিন। ভারতবিখ্যাত একজন তেলরঙা চিত্রকরের সঙ্গে ছোট্ট এক দেশীয় রাজ্যের রাজপথ দিয়ে আলাপে আলাপে পথ ভাঙছি। হঠাৎ মোটরের হর্ন শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীবর চিত্রকর আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করতে শুরু করলে। জনাকীর্ণ রাজপথে কেবল শিল্পীই নয়, একমাত্র আমি ছাড়া সকলেই কুর্নিশরত। হর্ন দিতে দিতে প্রকাণ্ড মোটরগাড়ী পেরিয়ে যেতে আবার যে যার পথে চলতে লাগল। কৌতূহল চরিতার্থ করতে শিল্পীকে জিজ্ঞেস করলাম, মোটরগাড়ীকে অত লোকে কুর্নিশ করলে কেন?

উত্তর পেলাম, চুপ, কেউ শুনতে পাবে। রাজার কানে গেলে কয়েদ তো কয়েদ, ধড় থেকে শিরও খসে যেতে পারে। গাড়ীতে যে মহারাজ নগরভ্রমণে বেরিয়েছিলেন।

আরেকদিন! বড় এক দেশীয় রাজ্যের জায়গীরদারের কেল্লায় অতিথি। জাঁদরেল জায়গীরদারের মেয়ের বিয়ে। বর আসবে চম্বলের

ওপার থেকে। সাথে থাকবে জোয়ান সব বরযাত্রী। তাদের রাত্রিবাসে শয্যাসঙ্গিনীর ব্যবস্থা চাই। তাই আদেশ হল, প্রজার ঘরের মেয়েছেলেকে বেগার খাটতে হবে। প্রতিবাদ উঠবার জো ছিল না। কারণ পরিণাম কারোরই রিয়াসতে অজানা নয়!

যখনকার ঘটনাটি, তখনো দেশীয় রাজ্য অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে একাঙ্গীভূত হয়ে যায়নি।

হঠাৎ চোখের সামনে নূতন পটক্ষেপ হল। সারা ভারতের আজাদী হাঁসিলের পর দেশীয় রাজ্যগুলির রাজারা একে একে বড় আক্ষেপে ভারতের সঙ্গে যোগ দিয়ে মনের দুঃখে নেহাৎই বেমানান হয়ে হাঁসফাঁস করতে লাগলেন।

অবশ্যি আজিও দেশীয় রিয়াসতের ভারতভুক্তি সত্ত্বেও তার রাজা-মহারাজার বিলাসব্যসনে সামান্য ভাঁটার টান পড়লেও তেমন কোন আমূল পরিবর্ত্তনের প্রমাণ দুর্লভ। প্রজারা এখন গণতান্ত্রিক বিধানসভার সুযোগ-সুবিধা পেলেও তাদের সত্যিকার মানুষ হিসাবে মনুষ্যত্বের অধিকার এখনো অর্জিত হতে বাকী আছে।

কিন্তু.........

হোটেলের দরজায় এসে পড়েছিলাম। আরেকটু হলে হোটেল ছাড়িয়ে অন্যপথে গিয়ে পড়বার আশঙ্কা ছিল। চোখের সামনে রিয়াসতের আরব্যরজনীর আরম্ভ হতে না-হতেই অতীতের অসহ স্মৃতির পটে যবনিকা নেমে এল।

* * *

কাক ডাকল। ভোর হল।

ত্রিবান্দ্রমের সকাল।

কথায় বলে, আগ্রার তাজ, আর ত্রিবান্দ্রমের হাতীর দাঁতের কাজ! মাসিমা সকাল হতে না-হতেই ধরে বসলেন, চল না—হাতীর দাঁতের কাজ কোথায় মেলে দেখা যাক।

আমি বললাম, সে কি মাসিমা, এখানকার পদ্মনাভ স্বামীর মন্দির দেখবেন না ?

—সে আবার কে, মাসিমা চমকে উঠলেন। চট করে তৎক্ষণাৎ মনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে স্মৃতি বেরিয়ে এসে বললে, মনে পড়েছে, শয়নে পদ্মনাভ ! তিনি এখানে, বেশ ত চল—দেবদর্শন সেরেই ফেরার পথে হাতীর দাঁতের একটা ব্যবস্থা করে আসা যাবে।

এতক্ষণে বুঝলাম, 'রথ দেখা কলা বেচা' কথাটার উৎপত্তি এমনিতে হয়নি।

মন্দিরের পথে যেতে যেতে মনে পড়ছিল এদিককার শোচনীয় অস্পৃশ্যাচারিতার কথা। এদেশে নাকি ব্রাহ্মণ্য প্রতাপের অপগুণ এতদূর প্রসারিত যে, এখানে ব্রাহ্মণত্বের মানুষ বহুক্ষেত্রে শুধুমাত্র অস্পৃশ্যই নয়, এমন অসংখ্য লোক আছে যাদের চোখে দেখা মাত্র ব্রাহ্মণের জাত যায়। তাই নিদারুণ অসহায়তার নিপীড়নে পড়ে লক্ষ লক্ষ নরনারী এদেশে খ্রীষ্টান হয়ে গেছে। ইতিহাসের এই সত্য জানা থাকায় মন্দিরে কি ব্যবহার আমাদের ভাগ্যে ঘটবে সে সম্পর্কে রীতিমত সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলাম। সংশয়ের অন্ত ছিল না। একেই মাছ-মাংসভোজী বলে বাঙলা দেশের ব্রাহ্মণরাও বাইরের ব্রাহ্মণদের কাছে মোটেই পাত পান না, তায় আমরা তিনটি অব্রাহ্মণ , না জানি ভাগ্যে কি আছে।

দুরুদুরু বুকে মন্দিরের দরজার সামনে উপস্থিত হতে সংগীন উচানো শান্ত্রী পথ আটকাল। রিয়াসতের সেপাইদের শৌর্য বীর্যের (!) উত্তরাধিকারী এই সব ভোঁতা সংগীনধারীদের বীরত্বের দৌড়টা জানা থাকলেও আমরা ত লড়াই করতে আসিনি। এসেছি মন্দির দেখতে। কাজেই অন্য পথে মন্দির প্রবেশের প্রত্যাশায় এগিয়ে যেতে হল।

সেটি একটি খিড়কির দ্বার। সেখানেও সংগীনধারী। তবে সে আমাদের পথরোধ না করে জামা কাপড় খুলে ফেলতে বলল। কাপড় খুলব কি! পরে জানলাম, পরনের কাপড়খানায় আপত্তি নাই—তবে কিনা মন্দিরে ঢুকতে হবে খালি গায়।

আতুড় গায়ে মন্দির-অঙ্গনে ঢুকতেই দেখি, চারদিকে ব্যাটনধারী, লুঙ্গিপরা, কটিদেশে গাজীর গীতের গায়কদের ঢঙে তেকোণা নিশান জড়ানো ত্রিবাঙ্কুরী মাউণ্টব্যাটেনদের পাহারা। ভেবেছিলাম মাউণ্টব্যাটেন সাহেব ভারত থেকে বিদায় নেবার পরে আর যেখানে সেখানে ব্যাটনের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না। এ যে দেখছি, মানুষ ভাবে এক, আর ত্রিবাঙ্কুরের মন্দিরের রেওয়াজ একেবারে আল্‌'দা!

নজরুলের কবিতায় পড়েছিলাম, 'এ মন্দির পূজারীর হায়, দেবতা তোমার নয়।' কিন্তু পদ্মনাভ স্বামীর মন্দিরের দোরে সঙ্গীনধারী, অঙ্গনে ব্যাটনধারীর ভীড়, না জানি মন্দির-গর্ভকক্ষের দ্বারে আরো কি দেখব ; তারপরই না বলা যাবে এ মন্দির আসলে কার!

মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে পা বাড়াতেই ব্যাটনধারী আমাদের রুখে দাঁড়াল। একি মজা, এখানেও এরা যে একেবারে তাজা।

নেহাৎ নিরীহ গোবেচারীর মত গায়ের রক্ত হিম করে জানতে চাইলাম, দেবদর্শন কখন পাওয়া যাবে। ব্যাটনধারী সোজা কথার উত্তরটা সবিক্রমে দেবার জন্যে প্রথমটা গোঁফে দিলে চাড়া, তারপর না ব্যাটন নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিলে, আগে আসবেন মহারাজ······

তার কথা শেষ হবার আগে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, মুখ্‌তার-উল-মুল্‌ক্‌, আজিম্‌-উল-ইখতিদার, রফি-উস্‌-সান, ওলা-শিখ, মোহাতাশিম-উদ-দনরান, উমদাত-উল-উমরা, মহারাজাধিরাজ, হিসাম-আস-সুলতানাৎ, মেজর জেনারেল, মনসুর-ই-জমান ফিদওয়াই হজরত মালিক মোজ্জাম, ইংলিস্থান জি. সি. আই. ই—মহারাজা আসবেন?

ব্যাটনধারী এত বিরাট উপাধির ভার সামলাতে না পেরে হঠাৎ বিনয়ী হয়ে উঠল। ওদিকে মাসিমা রাজদর্শন ঘটবে বলে অকস্মাৎ পুলক অনুভব করতে লাগলেন। আর আমরা দুই বন্ধুতে কতকটা সম্মানিত অতিথির মত মন্দির-অঙ্গনে এই সুযোগে ঘুরবার স্বাধীনতা নিয়ে বসলাম।

কয়েক পদ এগিয়ে যেতেই অচিন্ত্য জানতে চাইলে যে এইমাত্র ওই কতকগুলো কি আওড়ানো হল। ওগুলো যে একজন দেশীয় রাজার গালভরা উপাধি সে শুনে অচিন্ত্যচরণ ত হতবাক্ ?

এক পাশে বেড়া দেওয়া ঘরের মধ্যে এক পাল শিশুর কাকলি কলরব তুলছিল। এদের ওইভাবে আবদ্ধ করার কারণ অনুসন্ধানে জানা গেল যে, স্বয়ং মহারাজা স্বচক্ষে এইসব রক্তবীজ ব্রাহ্মণ বালকদের ভোজন দেখে তৃপ্ত হবেন, তাই এ ব্যবস্থা। কিন্তু বেলা বেড়ে ওঠায় বালব্রাহ্মণদের উদরদেবতা আর শান্ত থাকতে চাইছে না বলেই ভেতরে ওই গণ্ডগোল।

অন্য পাশে মন্দির প্রবেশের আচ্ছাদিত পাথরঢাকা পথে কেরলনারী তার স্বদেশী বেশে বালি ছিটিয়ে চলেছে। এ ব্যবস্থাটি এই জন্যে হচ্ছে যে, মহারাজাধিরাজ পরমধর্মরক্ষক খালি পায়ে মাটির 'পরে পা ফেলে পরমভক্তের মত মন্দিরে পূজা করতে যাবেন, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ঠিক আটটার সময়। এর নাকি একটুও এদিক ওদিক হবার জো নেই। এই রীতিই চলে আসছে নাকি সুদীর্ঘকাল থেকে।

চমৎকার! কিন্তু ঘড়িতে এদিকে যে আটটা পনেরো বাজে! মহারাজ আসবেন, তার কতই না তোড়জোড়! ব্যাটনধারীরা গোঁফে চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে সারি সারি। পাছে কেউ মহারাজের সামনে পড়ে তাই সকলকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বালব্রাহ্মণদের কলরব থামাতে পাতা পড়েছে। ফল হয়েছে উলটো। কলরব গেছে বেড়ে। আর মাসিমা একদৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছেন রাজদর্শন মানসে।

হঠাৎ সারিবদ্ধ ব্যাটনধারী যে যার স্থান থেকে সরে পড়ার ব্যবস্থা করায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল চাপা কথার ঢেউ। শোনা গেল, মহারাজের শরীরটা একটু ম্যাজ ম্যাজ করছে, তাই তিনি আজ আর আসবেন না। মাসিমা তো হায় হায় করে উঠলেন, ভাগ্যে না থাকলে কখনো রাজদর্শন ঘটে! আমি তো ভেবেই পেলাম না, দেবতাই যদি মুখ্য তবে রাজদর্শনের এত ব্যগ্র বাসনা কেন!

দেবদর্শনে আরেক ফ্যাসাদ ! কেবল প্রকাণ্ড পদ্মনাভ স্বামীর সুবিশাল শায়িত বিগ্রহই নয়, আশেপাশে ছোট বড় মাঝারি দেবদেবীকেও এখানে দর্শন করতে হয়। কোনক্রমে নাতিদীর্ঘ দরজার আড়াল থেকে দেবদেবীদের দর্শন যদি-বা পাওয়া গেল, পূজারী পরম উন্নাসিকতার সঙ্গে দর্শকদের যথাসাধ্য দূরে রাখতে চেষ্টা করতে লাগল। যারা পরম ভক্তি সহকারে তীর্থম্ অর্থাৎ চরণামৃত যাচ্ঞা করছিলেন তাঁদের পূজারী অদ্ভুত অবহেলা সহকারে দৃষ্টিবিদ্ধ করে পরে দরজার বাইরে দাঁড়ানো আরেকজন টিকিধারী মারফৎ যেভাবে তীর্থম্ বিতরণ করলে তা দেখলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। একালেও ধর্মের নামে মানুষের প্রতি এহেন উপেক্ষা কোন মন্দিরে চলতে পারে, ভুক্তভোগী না হলে সেকথা বিশ্বাস করতে বাধে !

বাইরে আসতেই দেখি, একটি নধর বালক সদ্য আহার সেরে দিব্যি পরিতৃপ্তিতে হাতের পাতা চাটছে। দৃশ্যটি যথাসম্ভব এড়িয়ে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই কে যেন পেছন থেকে কী সব বলতে বলতে ছুটে আসছে, তারই আওয়াজে ফিরে চাইতে সেই নধর বালকটিকে সামনে দেখা গেল। এখন সোৎসাহে সে আমাদের পাকড়াও করলে, পয়সা চাই। বালকটিকে দেখে কিছুতেই ধারণা হয় না যে, তার খাবার কোন অভাব আছে। তবু সমানে সে ভিক্ষার সুর টেনে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল। শেষটা যেই না হাতীর দাঁতের শিল্পসম্ভারের সুন্দর একটি দোকানে ঢুকে পড়লাম অমনি দোকানীর তীক্ষ্ণদৃষ্টির কল্যাণে সে মারলে ভোঁ দৌড়। এদের কে যে এভাবে ভিক্ষা করতে শিখিয়েছে সে প্রশ্নের জবাব আজো মেলেনি।

আবার সেই কথা, আগ্রার তাজ আর ত্রিবান্দ্রমের হাতীর দাঁতের কাজ। রসিক যিনি, তিনি উভয়ের রস সমভাবে নিয়ে তৃপ্ত হবেন। কিন্তু বেরসিক হয়তো বলবেন, কোথায় সাজাহানের প্রেমের কবিতা আর কোথায় বা হাতুড়ে শিল্পীর রচা খেলনা। তবে এই খেলনায় অলৌকিক ও চমৎকার শিল্পকর্মের যে প্রাণের ঢল নৃত্যচপল, তার তুলনা ওই এক তাজমহল !

দাম আছে। তবু মাসিমা কিনছেন, কিনেই চলেছেন। কিনতে কিনতে তিনি যেন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। পাছে শেষ কপর্দকটি নিঃশেষ হয় সেই আশঙ্কায় অচিন্ত্যচরণ সবিস্ময়ে বলে উঠল, মাসিমা করছেন কি !

মাসিমা যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তিনি থামলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও থামলেন। আর আমার তখন শিশুর মত অবস্থা, এ দোকান তো দোকান, জগৎ উজাড় করে এগুলি যদি কিনে নিয়ে যেতে পারতাম !

আমাদের যেন নেশায় পেয়ে গেছল। নেহাৎ কন্যাকুমারিকার মন-মাতাল-করা ডাক শুনেছিলাম, নইলে নিজেদের নিঃস্ব করে ত্রিবাঙ্কুরের হাতীর দাঁতের কাজগুলো লুটেপুটে আনলে তবে নেশার অবসান হত।

* * *

ত্রিবান্দ্রম। এ নগরীর আরেকটি নাম আছে, দক্ষিণের রোম। রোম নগরী পরিদর্শনের সুযোগ না ঘটায় নামকরণটি কতটা সঙ্গত, সে বলা কঠিন। কিন্তু এই অনুচ্চ পাহাড়-নগরীর মাথা থেকে পায়ের দিকে হরেক প্রকারের বাড়ী ঘরের যে বিভঙ্গ ঢেউ বয়ে গেছে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। নানারঙের শাড়িখানি পরে আশ্চর্য সজ্জা করেছে যেন কেরলসুন্দরী।

এখানকার পথেঘাটে যে সকল নরনারী হামেশাই চোখে পড়ে তার মধ্যে পুরুষদের দেখতে মন্দ নয়, কিন্তু কেরলসুন্দরীদের রূপের যে খ্যাতি শোনা যায়, তারা কোথায় ! সম্ভবতঃ বাইরে গিয়ে সে সব রমণীরা যতটা স্বাধীনভাবে ঘোরেন ফেরেন, জন্মভূমিতে নানান সামাজিক বিধিনিষেধের জন্য ততটা পেরে ওঠেন না। হয়তো স্থানীয় বাসিন্দারা বলতে পারবেন ভাল করে, সেই বজ্র-আঁটুনি ফসকা গেরোর অত্যাশ্চর্য সব কাহিনী।

আপাতত সে কাহিনী তোলা থাক। ভারতের শেষ স্থলবিন্দু থেকে কুমারী দেবীর মন্দির হাতছানি দিচ্ছে—এখন কতক্ষণে সেখানে পৌঁছানো যায়, সেই চেষ্টাই দেখা যাক !

কন্যাকুমারিকার আকর্ষণ কেবল কুমারী দেবীর জন্যে নয়, প্রকৃতির অনিন্দ্য অলকা তীর্থের জন্যে। যা কিছু সুন্দর, যা কিছু সুমহান্, তাকেই ঘিরে এ তীর্থের মহত্ত্ব চির অম্লান। তাই সেখানে শুধু কুমারীদেবীর দর্শনার্থীদের ভীড় নয়, দেশ-বিদেশের দূর-দূরান্তের সৌন্দর্যপিপাসুদের নিত্য আনাগোনা।

নগরী থেকে পঞ্চান্ন মাইল পাকা সড়ক। হরদম ট্যাক্সি হাজির, যাত্রী হলেই চলল তারা। কিন্তু ট্যাক্সির মোটা দর দিতে যাদের মনে সাড়া মেলে না, তারা বাসেও যেতে পারে।

সুন্দর পথ দিয়ে দুপাশে গোলমোরের থোলোর অভিনন্দন বহন করে দিবা অবসানে রাত্রির আঁধার ভেদ করে আমাদের নিয়ে এক সময় ট্যাক্সি থামল গিয়ে একেবারে ভারতভূমির শেষবিন্দুতে।

॥ ২৯ ॥ শেষ তীর্থ কন্যাকুমারিকা

সন্ধ্যা-উত্তীর্ণ রাত্রির প্রথম যামে আমরা তিনজন বিদেশী নামলাম এসে তিন সাগরের আঁচল ঘেঁসে কন্যাকুমারীর দেশে।

এখানে নীরব রাত্রিকে সরবে ঘিরে আছে তিনটি সাগরের চঞ্চলতা। ঘনবনশয়ন আশেপাশে যদিও নেই তবু 'এদেশ লেগেছে ভাল নয়নে'।

প্রথম দৃষ্টির ভাল লাগা অনেক সময় আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়! কিন্তু কন্যাকুমারিকার বেলায় ঠিক তার বিপরীত। যত দেখছি ততই অফুরন্ত বিস্ময়! এই তো সবে এখানকার রাজকীয় হোটেলের কামরার জানলা খুলে দাঁড়িয়েছি—চোখে লেগেছে রূপের জোয়ার। হৃদয়-দুকূলের কানায় কানায় এখন ছলাৎ ছলাৎ অরূপের ঢেউ।

রাত্রি অনেক। সব নিস্তব্ধ, একমাত্র সমুদ্র ছাড়া। তবে ওই সাগর হতে গর্জনে গর্জনে ভেসে আসছে কার আনন্দের সাড়া? কে যেন আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে নিজেকে পরমানন্দের অসীমে খুঁজে পেয়েছে—তারই অনিন্দ্য আভাস পলকে ছড়িয়ে দিয়ে সে দুনিয়াকে জানিয়ে দিচ্ছে—চির-অফুরান আনন্দ তার চির-অম্লান!

ভোরের দিকে চোখ জড়িয়ে এসেছিল। হঠাৎ কিসের সাড়ায় তন্দ্রা ছুটে গেল। দোর খুলে বাইরে এসে দেখি, দোতালার বারান্দায় সমুদ্রের দিকে মুখ করে কে একজন আবছা অন্ধকারে রেলিং-এ ভর দিয়ে আনমনে একা একা রাত্রিশেষের সমুদ্রের রূপ দেখছেন।

কাছে এগিয়ে যেতেও তাঁর তেমন হুঁশ হল না। নজরে পড়ল, যিনি ঐভাবে দাঁড়িয়ে তিনি পুরুষ নন, মহিলা।

পাশের ঘরে মাসিমা ছিলেন, তিনি কি এত ভোরে বাইরে এসে দাঁড়ালেন?

পূব-আকাশ আস্তে আস্তে আলোর আভাসে ফর্সা হয়ে আসছে।

এক্ষুনি বেরিয়ে পড়লে পরে তবেই সূর্যোদয় দেখা যেতে পারে বঙ্গোপসাগরের কিনারে। তাই, কে ওই রমণী, সে সন্ধানে না এগিয়ে অচিন্ত্যের দরজায় গিয়ে ওকে ডেকে তুলতে পা বাড়ালাম।

দরজায় আওয়াজ তুলেই চলেছি। মৃদু টোকা থেকে আওয়াজ তোলবার মাধ্যম মৃদু ধাক্কায় এসে দাঁড়াতেও অচিন্ত্যচরণের সাড়া নেই। কী করব তাই ভাবছি, ঠিক সেই মুহূর্তে রমণীকণ্ঠের জিজ্ঞাসায় ফিরে চাইতে দেখি, মুখখানি যেন চেনাচেনা।

কাকে খুঁজছেন ?

সমুদ্রের হাওয়ায় গা শিরশির করছে এই শেষ রাত্রির ভোরে। রমণীর সর্বাঙ্গ ঢাকা একখানি গোলাপী রঙের শালে। তাই মুখের আদলটুকু ছাড়া সেই সারাদেহ মোড়া রমণীকে চিনেও যেন চিনতে পারছিলাম না।

তৎক্ষণাৎ আবার কানে এল ঃ চিনতে পারছেন না ?

হকচকিয়ে গেছলাম। চকিতে জানতে চাইলাম, কোথায় দেখেছি বলুন তো।

—যদি না বলি কখনো চিনবেন না তো !

সমস্যায় ফেলে দিলে। তাই চুপচাপ চিন্তায় তলিয়ে যেতে বসেছিলাম। কখন শুনতে পেলাম, কি আশ্চর্য, কতবার দেখা—তবুও—

—আপনি, আপনি সেই······

—এতক্ষণে স্মরণ হল ! নামটা কিছুতেই মনে আনতে পারছেন না—না !

চিত্রা।

সকালে সূর্যোদয় দেখতে অগণিত নরনারীর মাঝে আমিও ছিলাম, চিত্রাও ছিল। কিন্তু সে আমায় চিনলে না। কতবার তার চোখে পড়লাম, সে দেখেও দেখলে না। ভাবলাম বেশ হল, রাত্রিশেষের প্রাক্‌পর্বের পরিচয় যে ঊষাসুন্দরীর সঙ্গে হয়েছিল, দিনের আলোয় সে মিলিয়ে যাওয়াই ভাল।

সূর্যের আলোতে সমুদ্রবক্ষে ঝলমলিয়ে উঠল পূবে আর দক্ষিণে দুটি পাহাড়। এর একটিতে একদিন ধ্যানস্থ হয়েছিলেন ভারতের বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। তাই আজিও ঐ পাহাড় 'বিবেকানন্দ রক' নামে প্রখ্যাত।

এই ভারতবর্ষ অচল কুম্ভকর্ণের মত জড়নিদ্রায় নিশ্চেতন হয়ে ছিল। সে নিদ্রার ঝুঁটি ধরে স্বামীজী ঝাঁকি দিয়ে কম্বুকণ্ঠে দেশবাসীকে জাগরণের আহ্বান জানিয়েছিলেন, 'ল্যাজেরাস, বেরিয়ে এস।'

সেই থেকে শুরু হল মহাভারতের মহাজাগরণ, নবভারতের নব অভ্যুদয়! তার পরে তিলক, চিত্তরঞ্জন, গান্ধীর নেতৃত্বে মহাভারতের মহা-আন্দোলনের সুমহান্ স্রোতে ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে একদিন ভাসিয়ে দিলে ব্রিটিশের বন্ধনশৃঙ্খলের বাধা। কিন্তু এর বিদ্যুৎ-প্রেরণা যাঁর দান, সেই চিরস্মরণীয় স্বামী বিবেকানন্দের নাম আজ এখানে কজনে স্মরণ করে?

এই কথাই ভাবছিলাম। আর অদূরের পাহাড়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গ আঘাতে কে যেন অবিরাম স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল সেই সন্ন্যাসীর নাম, যাঁর বাণীতে ছিল বিদ্রোহের মহা-আহ্বান।

দিনের আলোতে কন্যাকুমারিকা অনন্যা। 'অনন্যা' ছাড়া অন্য বিশেষণ বাংলায় খুঁজে মেলা ভার যা দিয়ে একটি কথায় এর ব্যঞ্জনা ব্যক্ত করা যায়। মাথার উপরে আকাশ অথৈ নীল। ওপাশে আরব সাগর, সুমুখে ভারত মহাসাগর, ডাইনে বঙ্গোপসাগর নাচছে ঢেউয়ের তালে তালে তাথৈ তাথৈ। ওই নাচের দোলে দুলে দুলে কোন্ ক্লান্তিহারা মহাবাদক ডমরু বাজিয়ে চলেছে সৃষ্টির আদি থেকে অনাদি কাল পর্যন্ত, পথে পথে অমৃতের তীর্থ রচনা করে।

আকাশের কত বিচিত্র রঙ। ওই রঙের আলিম্পনে সাগরের বুকে রূপবিকাশের রাঙিয়ে ওঠা শিহরণ! মুহূর্তে মুহূর্তে তিন সাগরে রঙের লীলার মহামেলা বসেছে—আর তাই দেখতে দেখতে উতলা আঁখি ক্ষণচঞ্চলা। ক্ষ্যাপা মেঘের মত চোখ এদিক থেকে ওদিক ছোটে,

যে রূপ দেখে ক্ষণিক আগে—ক্ষণপরে কোথায় পায় তার তুলনা!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই অতুলন আশ্চর্য রূপের চকিত পরিবর্তন, নিমেষে অপূর্ব রূপ ধারণ লক্ষ্য করতে করতে কখন ভেসে গেছলাম কন্যাকুমারিকার সৈকত থেকে সেই তীর্থ সৈকতে, 'বিশ্বজনার মিলনে যেথায় মিলেছে জগন্নাথ।'

মাসিমা সেই সকালে স্নান সেরে মন্দিরে গিয়ে বসেছেন। অচিন্ত্যচরণ আর আমি এখন একেবারে মুক্ত। মুক্তির আনন্দে আর আমাদের পায় কে! রোদে ঘুরে ঘুরে গলা শুকিয়ে এলে জিভটাকে উলটে-পালটে লেহন করতে থাকি। রূপো রোদের মদে মুখ ভরে ওঠে। অমনি নবোদ্যমে এগিয়ে চলি দূরের বালুপাহাড়ের শিখর লক্ষ্য করে।

যে পথ ত্রিবান্দ্রম থেকে এসে বঙ্গোপসাগর পাশে রেখে ভারত মহাসাগরের তট ঘেঁসে পূব থেকে পশ্চিমে দৌড়ে গিয়ে আরব সাগরের আঁচল ছুঁতে চেয়েছে, সে পথে কিছুদূর এগিয়ে দেখি, বালুর পাহাড়ের ঢল নেমে এসে পথের গতি রোধ করে রুখে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের তখন দুর্বার গতি। বুকে দুঃসাহস। চোখে দুর্জয়ের নেশা। তাই কে রোখে কাকে!

কিন্তু বালুতে পা তেমন চলে না। পালিশ জুতো পিছলে যায়। জুতো খুলে হাতে নিলেও পায়ের তলায় ফোসকা পড়ে জানিয়ে দেয়, আর নয়—এখান থেকেই ফেরো।

কে সে কথায় কান দেয়! এ পাহাড়-চূড়ায় চড়া তো চাইই চাই—তারপর দেখা চাই পাহাড়ের ওপাশে কী আছে।

হাওয়া উদ্দাম! কোন উন্মাদিনী যেন তার ঝলমলে আঁচলখানি ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেছে খল খল হাসিতে। আর তারই দৌলতে বালির স্তর শাণিত তীরের মত সোঁ সোঁ করে অপথে বিপথে ঝাঁপিয়ে পড়ছে উদ্দাম কোন্ খেয়ালের ঝোঁকে।

আমাদের ঝোঁক তাতে রোখ মানবে কেন! হাওয়ার ঝুঁটি ধরে খেলা করে উড়ে বেড়ানোর অধিকারী মানুষ!

ক্রমে ক্রমে হাওয়া হল হাজারগুণ উদ্দাম। আমাদের উড়িয়ে নিয়ে ফেলে দিতে চাইল চূড়ো থেকে একেবারে সমুদ্রতলে। দারুণ দুর্ঘটনার মুখোমুখি চোখ দুটি কখন যে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেছল জানতেই পারা যায়নি। যখন সে চোখ খুলতে গেলাম তখনি উড়ন্ত বালুর দুরন্ত পুচ্ছের এক ঝাপটায় রীতিমত কাণা হয়ে গেলাম।

অচিন্ত্যচরণ আর্তনাদ করে উঠল, সাপে কেটেছে রে, সাপে কেটেছে।

কোথায় সাপ, ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলাম। শঙ্কায় বোজা চোখ মেলে সাপ দেখব কি, প্রাণভয়ে ছুটবার আয়োজন সাঙ্গ করে এনেছিলাম। সেই মুহূর্তে আমার পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে কে যেন প্রকাণ্ড একটি ছুঁচ ফুটিয়ে দিলে। আর্তনাদ করে বসে পড়লাম।

ততক্ষণে অকস্মাৎ কোথা থেকে তীরের মত জলের ধারা উড়ে এসে হাওয়াকে যেন তাড়া করলে। চোখ খুলে চেয়ে দেখি, কোথায় গেছে বালুর ঝড়। অদূরে কাঁটা লতায় পা আটকে বন্ধুবর গড়াগড়ি দিচ্ছে। কাছে গিয়ে টেনে তুলতে যেতে নিজেরই ধরাশায়ী হবার অবস্থা। শুনেছিলাম, সাপে কাটলে দেখতে দেখতে দেহ ভারি হয়ে ওঠে। তবে কি সত্যিই…… !

কিন্তু আশেপাশে ওই লম্বা লম্বা তীক্ষ্ণ কাঁটার লতা ছাড়া সাপ তো দূরের কথা, এক গাছা দড়িও দেখতে না পেয়ে আশ্বস্ত হওয়া গেল। বন্ধুবর যে দেহে রীতিমত ভারিক্কী সে সত্যটুকুও সেই সঙ্গে মালুম হল।

অচিন্ত্যচরণের চোখ খুলতে আকাশ পরিষ্কার, বাতাস শান্ত, বালু ঠাণ্ডা হয়ে এল। যে বর্ষণবাণ উদ্দাম হাওয়ায় তেড়ে এসেছিল, তারই তীব্র আলিঙ্গনে পাগলিনী উড়ন্ত বালুরাশি এখন যেন আলিঙ্গনক্লান্ত, বিশ্রামবিলাসিনী।

আবার চলার আরম্ভ। যতদূর চোখ যায়, ঢেউ তুলে বালি পাহাড় সটান দৌড়ে গেছে। এক পাশে বাবলাসারি ছত্রাকারে দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে হাওয়ার সাথে পাতায় পাতায় কানাকানি জুড়ে দিয়েছে—অন্য পাশে শতেক ফিট নীচে নীলসায়র।

আরো কিছুদূর বালি ভাঙতে এক জায়গায় পরিত্যক্ত সুলম্ব ইটের গাঁথুনি চোখে পড়ে। এ গাঁথুনি বহু উপর থেকে সুগভীর নীচে সমুদ্রগহ্বরে নেমে গেছে। কে জানে, হয় তো এ অজানা ইতিহাসের কোন সাক্ষ্যের কঙ্কাল, কিংবা কোন রাজারাজড়ার রূপমহল, অথবা সমুদ্রের বুকে হারিয়ে যাওয়া জলদস্যুদের অবলুপ্ত লুণ্ঠন-গরিমার শেষ আশ্রয়-আগার।

তাকেও ছাড়িয়ে সামনে এগোতে বালির পাহাড়শেষে কাঁটকঙ্করের দেশে আমাদের পা পড়ল। ওই দূরে দেখা যায়, নারিকেলকুঞ্জের তলদেশ পর্যন্ত সমুদ্রের ঢেউ সাপের ফণায় দুলছে। আর তারই মাথায় চড়ে ছোট ছোট জেলে ডিঙ্গি দামাল ছেলের মত নাচছে।

কন্যাকুমারিকার এই দুর্জ্ঞেয় স্থানটাতে কেউ বড় একটা আসে না। কুমারী দেবী দর্শনে যাঁদের পুণ্য, তাঁদের মেরীমাতা কখনো আকর্ষণ করেন কিনা সন্দেহ। কেবল যাঁরা জাত-খ্রীষ্টান কিংবা যাঁরা কন্যাকুমারিকার শেষটুকু দেখতে চান, তাঁরাই হয় তো খ্রীষ্টান আধিপত্যর এই নিদর্শনবিন্দু পর্যন্ত আসেন। আমরা এসেছিলাম, বালুর পাহাড় পেরিয়ে ওপাশে কোন্ রহস্য সঙ্গোপনে রয়েছে তারই সন্ধানে। এসে দেখি, প্রকৃতির গুপ্ত রহস্যের চেয়ে জীবনের রহস্য-জটাজাল আরো প্রগাঢ় জটিলতায় গহন।

সমস্ত দিনই একরকম মাসিমা কাটিয়ে দিলেন কুমারীদেবীর মন্দিরে। দুপুরে দেবীর প্রসাদ পেয়ে মাঝে একবার এসেছিলেন। এসেই চিত্রার মার দেখা পেয়ে তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে সেই যে মন্দিরমুখো গেছলেন, বিকালে চিত্রার চায়ের নিমন্ত্রণে আমরা হাজিরা দিলাম, তখনো না তার মায়ের, না মাসিমার দেখা পাওয়া গেল। সন্ধ্যারতির পরে মাসিমা ফিরে এসে বললেন গর্ব করে, তোমরা জান অচিন্ত্য, নন্দা খ্রীষ্টান বিয়ে করলে কি হয়, হিন্দু ঘরের মেয়ে তো। এখন জোর

করে শাঁখা সিঁদুর পরে দ্বিগুণ তেজে হিন্দু হতে চায়। এই তো এতক্ষণ মন্দিরে মায়ের সামনে মেয়েকে নিয়ে কত দুঃখ করছিল। ওই রূপের খনি, কারো জিম্মায় সঁপে দিতে পারলে মা-বাপ বেঁচে যায়। তা মেয়ে নাকি বলে, কাউকে তার পছন্দ নয়। আমি বলেছি, এনো নন্দাই তোমার মেয়েকে একবার। দেখব, কেমন বর পছন্দ না হয়। কেন, ছেলে কি তোমরা কেউ মন্দ, না— ফেলনা ?

রক্ষে করুন মাসিমা, সমস্বরে কথাটা বলে ফেলতেই আমরা লজ্জিত না হয়ে পারি না। কিন্তু মাসিমা তখন ছেলেদের পক্ষ নিয়ে এমন উত্তেজিত যে, চিত্রা তো চিত্রা—রম্ভা, মেনকা, উর্বশী, এরা পর্যন্ত তাদের সমস্ত রূপ যৌবন নিয়ে সংসারে অসার অযোগ্যা না হয়েই যায় না।

মাঝে একবার কথা তুলেছিলাম, রাতে মাসিমার খাবার কি হবে। তাতে তিনি বললেন, তীর্থে এসে যার-তার হাতের পাক শেষটায় আর না-ই বা মুখে তুললাম। হ্যাঁ, ভাল কথা—তীর্থভ্রমণের সকল পুণ্য প্রায় নষ্ট করে এনেছিলাম। বেশ হল, মনে পড়ে গেল, সেই চামড়ামোড়াই জিনিসটি যে আমার কাছেই রয়ে গেছে।

—থাক না মাসিমা। তাতে হয়েছে কি !

—হয়েছে কি বলছ ! জান না বুঝি, এ পথে পা বাড়ালে পরের দ্রব্য ভুলেও ছুঁতে নেই। কই অচিন্ত্য, খোল দেখি স্যুটকেশটি। দেখ উপরেই রাখা আছে।

অচিন্ত্যচরণ স্যুটকেশ খুলে চামড়ায় মোড়া বস্তুটি আমার দিকে এগিয়ে ধরে বললে, ধর।

হাতে নিয়ে দেখি, ও কিছু নয়—চামড়ার তলায় একখানি খাতা। তার আবার অনেক পাতা কালির আঁচড়ে কলঙ্কিত।

খাতাখানি মাসিমার সামনে খুলে ধরতে তিনি বললেন, এ তো তোমাদেরই পড়ার যুগ্যি। মাঝে মাঝে ছবিও দেখছি।

এক সময় রাত্রি নিবিড় হয়ে এল। কক্ষে কক্ষে বাতি নিবল।

নিস্তব্ধ রাত্রিতে সমুদ্রগর্জন অদ্ভুত আত্মপীড়নের তীব্র হাহাকারে ভেসে বেড়াতে লাগল।

সেই সময় অধীর আগ্রহে খাতাখানি আমার ঘরের একলা জাগা বাতির সামনে মেলে বসলাম।

পাতার পর পাতা মুক্তাক্ষরে রাষ্ট্রভাষায় রঞ্জিত একটি জীবনের কাহিনী। ভাগ্যিস, ভাষাটি আমার জানা ছিল। কিন্তু হাজার হলেও হস্তাক্ষর, পড়তে ছাপার অক্ষরের মত সহজ হল না। তবুও ছাড়বার জো ছিল না। কেন যে ছিল না খাতাখানির পাঠোদ্ধারের সংক্ষিপ্ত সারেই তা প্রকাশ পাবে।

—আজব দেশের আমরা সব অদ্ভুত জীব, দুনিয়া যখন আমাদের তারিফ করে, তখন সে চাটুকারিতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। তাই আমরা পুরুষ জাতটা জনে জনে দেবতা আর আমাদের মেয়েরা মূলতঃ মেয়েমানুষ হয়েও দেবীমাহাত্ম্যে পূজা পায়।

ঘটনাপ্রবাহের সত্য দুটি তাহলে খুলেই বলতে হয়। কারণ এই ঘটনাদ্বয়ই আমার জীবন অভিজ্ঞতার নবদর্শনের মহামিনার।

হ্যাঁ, আমি একজন মানুষ, চেয়েছিলাম—রুচিরাধ্যক্ষরূপে নিজেকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। আমার অদম্য কামনা আমায় সুন্দরের নেশায় নেশাগ্রস্ত করে না-তুললে কখনো এ জীবনবেদ রচনার প্রয়োজন পড়ত কিনা সন্দেহ!

কিন্তু আসল কথায় আসবার আগে সেই সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালাবার অলক্ষ্য আয়োজনে সকালবেলার সলতে পাকানোর মত কাহিনীর সূত্রটি সুস্পষ্টরূপে খোলসা না করলে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং আমার জীবনের পাকা বনিয়াদের তলাকার সেই চোরাবালির ইতিবৃত্তটুকু কালির আঁচড়ে রেখে যেতে চাই।

বলতে গেলে, আদি গল্পকারের ভঙ্গীতে শুরু করলে দাঁড়ায়, এক যে ছিল স্টেশন মাস্টার, তাঁর পোস্টিং হয়েছিল বীরবিক্রম ফ্লাগ স্টেশনে। সেখানে কোনো গাড়ীই দাঁড়াতো না, একমাত্র লোক্যাল ট্রেন আর

কদাচিৎ পার্সেল ছাড়া। ওই লোক্যালে পাশের গাঁয়ের বাবুরাম চাপরাসি মাসের ত্রিশদিনই জেলাশহরে আসত-যেত। যাবার সময় হাতে থাকত তার চটের থলি। ফেরার পথে সে থলিতে ভরে আনত বিলিতি গুঁড়ো দুধ, বার্লি, বিস্কুট। ওগুলো বাবুরাম গাঁয়ের দোকানে যখন-তখন বেচে দিয়ে দু'পয়সা পকেটে প্রত্যহই তুলতে থাকায়, মাস গেলে লাভের অঙ্কটা টাকাপয়সার আক্রার দিনেও দাঁড়াত গোটা চল্লিশ-পঞ্চাশে।

কালক্রমে বাবুরামের মালের চাহিদা যেমন গেল বেড়ে, তেমনি লাভের অঙ্কটা লাফিয়ে উঠল চল্লিশ-পঞ্চাশ থেকে ক্রমে ক্রমে নব্বই-একশ-দু'শ পঞ্চাশে।

চাপরাসি বাবুরাম তখন ভাবলে, 'দুত্তোর ছাই, রোজ রোজ আট ঘণ্টার উপরি ঘণ্টাদুয়েক চাকরি করে যা সামান্য কটা টাকা পাই, তার চেয়ে ঢের বেশী কামাই হয় ফেরার পথে সামান্যক্ষণ সামান্য কটি দোকান ঘুরে। কাজ নেই আর ওই চাপরাসিগিরি করে।' এই না ভেবে বাবুরাম দিলে তার স্থায়ী চাকরিটি ছেড়ে।

এ সংবাদ গাঁয়ের ঘরে ঘরে পৌঁছে যেতে দেরি হল না। স্টেশনমাস্টার গিন্নির কানেও গেল কথাটা। একেই তিনি স্বামীর সামান্য আয়ে এতদিন খুঁত খুঁত করে এসেছেন, তায় চোখের ওপর লোক্যাল ট্রেনের নিত্যকার যাত্রী বাবুরাম চাপরাসির অবিশ্বাস্য উন্নতি স্বচক্ষে ঘটতে দেখেছেন! সুতরাং তাঁর আর সইল না। এতদিন যে সয়ে ছিলেন, সে শুধু বাবুরাম স্থায়ী চাপরাসিগিরির মোহ ছাড়তে পারেনি বলেই।

সে রাত্রিতে স্বামীর সঙ্গে তাঁর রীতিমত একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল। স্বামীর সেই চিরকেলে 'হক-কথা'—স্থায়ী চাকরির মত 'নিশ্চিন্ত' আর কী আছে।

গিন্নি তাতে কি আর হার মানেন। তিনি একেই রেগে আগুন হয়েছিলেন, সেই আগুনে ওই হক-কথার ঘৃতাহুতি হতে যেন বোমা ফাটলো: মুরদ না-থাকলে কি আর করবে!

যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা—স্থায়ী চাকুরে বীরবিক্রম ফ্লাগ

স্টেশনের স্টেশনমাস্টার গর্জে উঠে বললেন, রাতটা যাক না, দেখিস কাল—মুরদ দেখায়ে দেব।

অবলা রমণী এত বড় গর্জন অবিশ্বাস করতে না পেরে কেঁদেই কাটিয়ে দিলেন সে রজনী। তারপর সকালের আলোতে ঢুলুঢুলু চোখে জানলায় বসে কিসের যেন প্রতীক্ষা করছিলেন। এমন সময় স্টেশনের দিকে সোরগোল শুনে আলুথালু বেশে ছুটে গিয়ে দেখেন, স্বামী তাঁর দৃঢ় মুঠিতে লাল নিশান তুলে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আর অদূরে খাড়া একটানা চলা তুফান মেল।

আশ্চর্য, অত্যাশ্চর্য, অভাবনীয়, অবিশ্বাস্য—যেখানে প্যাসেঞ্জার ট্রেন পর্যন্ত থামে না আজ সেখানে তুফান মেল থামিয়ে দিয়েছে কিনা বীরবিক্রম স্টেশনের স্থায়ী চাকুরে মুরদওয়ালা স্টেশন মাস্টার। গিন্নির তখন আর আহ্লাদ ধরে রাখাই ভার!

এইখানে খাতার মালিক থেমেছেন একটুখানি। তার পরেই আবার আরম্ভ করেছেনঃ দুর্ভাগ্যক্রমে আমার মুরদ তুফান মেল থামানোতে কোনদিন থমকে থাকতে চায়নি। তাই স্থায়ী চাকরির বন্ধনে নিজেকে বন্দী না করে প্রথম যৌবনেই আমি দুঃসাহসিক জীবনসংগ্রামের অনিশ্চিত সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে কসুর করিনি। আমার আত্মীয়-স্বজন প্রথমত চেয়েছিল সরকারী চাকরির কলুর ঘানিতে জুতে দিতে। তাদের সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষোভের আর অন্ত ছিল না। কিন্তু কেমন করে জানি না, আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অগ্নিকণা আমায় সকল সময় জ্বালিয়ে তুলত। তারই প্রেরণায় আমি প্রায়ই বলতাম, চড়ি তো গৌরীশঙ্করে, ডুবি তো প্রশান্ত মহাসাগরে। এর মাঝামাঝি পথ আমার জন্যে নয়।

সেকথা অভিভাবকদের কানে উঠতে তাঁরা দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন, পরের খেয়ে লম্বা লম্বা বাত বেশ ফলানো যায়। ক্ষমতা যার থাকে, সে সংসারের দুচোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

আমিও তাই দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে

পড়লাম একদিন ঘরের ছেলে বাইরে। অসাধারণ কিছু একটা করব বলে কর্মক্ষেত্র ঠিক করবার আগে শিক্ষাক্ষেত্র বেছে নিলাম রাজপুতনা।

ছোটবেলা থেকে রঙ আমায় হাতছানি দিত। এবারে তাকে তুলির টানে ডাক দিলাম। চোখের রঙে, বুকের রঙে রাজপুতনার গাঢ় রঙকে গলিয়ে গলিয়ে নব উত্তাপে নতুন রূপে আকার দিতে বেশ কয়েকটি বছর কেটে গেল।

অকস্মাৎ একদিন দারিদ্র্যের কশাঘাতে রঙের বর্ণাঢ্য অঞ্জন ছুটে যেতে কর্মের অনুসন্ধানে রুক্ষ রাজপুতনা ছেড়ে আমীরী আগ্রায় আত্মপ্রকাশ করলাম ব্যবসাদার রূপে।

প্রথম দিকে ব্যবসাদারি তো আর জোটে নি। করতে হয়েছে গাইড-গিরি—হোটেলের······

সে সময় আত্মপ্রতিষ্ঠার অদ্ভুত ঝোঁক চেপেছে। কাজের ভাল মন্দ বিচার নেই। ভবিষ্যৎ যতই অন্ধকার হোক তার শেষ দেখতেই হবে—তাই যে কোন মূল্যেই দেখতে চাই।

সে দিনটির কথা মনে পড়ে। এক ফতেগড়ের রাজকুমার মোগল বাদশাদের রুচি অনুসারে তাঁর পিয়ারের সুন্দরীকে কিছু উপহার দেবার ঝোঁক করেছিলেন। অমনি ঝোপ বুঝে কোপ শানাব ঠিক করলাম। কিন্তু তার চেয়ে সহজ পথ আগ্রার জহুরী হুজুরমলজী আমায় বাতলে দিলে।

কাছে ডেকে নিয়ে ফিস ফিস করে বললে, বেটা—দেখলে শুনলে তো বেশ এলেমদার মালুম হয়। তা ছাব্বিয়া-টা ছাড়িস কেন?

আগ্রার 'ছাব্বিয়া' আর ঘরের গুরুঠাকুর বিদায় প্রায় সমান। বিদায়কালে গুরুঠাকুর বনেদী ঘরে এক-এক বারে যে মোটা টাকা দক্ষিণা পান, এ শহরের সওদাকারীদের পাকড়াও করে কোন দোকানে এনে ফেলতে পারলে তার চেয়ে কম মেলে না 'ছাব্বিয়া'।

সেই থেকে কয়েক মাস 'ছাব্বিয়া' যা কামিয়েছিলাম, বরাতগুণে

মক্কেল রীতিমত মোটা হওয়ায় তার অঙ্কটা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল চার অঙ্কের কোঠায়।

তখন আর আমায় পায় কে। আগ্রায় এক ভেষজবিদ্‌ ছিল, যে আমায় অতি পিয়ারের চক্ষে দেখত। তার কাছ থেকে একদিন গলিয়ে ছাড়লাম অদ্ভুত এক সালসার মালমসলার ইতিবৃত্ত সব।

তাই নিয়ে নেমে পড়লাম ব্যবসায়। মার খেতে বসেছিলাম। কিন্তু বেঁচে গেলাম বিজ্ঞাপনের গুণে।

সে এক অদ্ভুত আবিষ্কার। মা-বাবা হারানো ছেলের খোঁজে মাঝে মাঝে তখনো কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় কিনা তাই খুঁজতে খুঁজতে আবিষ্কার করলাম, বিজ্ঞাপনে সবই মেলে। এমন কি ভগবান স্বয়ং, তিনিও বিজ্ঞাপনের বশ।

অতএব কোমর বেঁধে লেগে গেলাম সালসার সুনাম ঘোষণায়। টাকা ঢেলে প্রমাণ করে দিলাম, যযাতি-যৌবন মিথ্যা নয়। আর অমনি দ্বিগুণে তিনগুণে আমার টনিক, সিলভার টনিক হয়ে ফিরে আসতে লাগল আমারি হাতের মুঠোতে।

অতঃপর একদিন যেখানে আমার মুটেগিরি করেও দুমুঠো অন্ন জোটেনি, দুটুকরো রুটি মেলেনি, সেখানেই আমার কদর দেখে কে।

সে কদর আত্মীয়স্বজনকে ডেকে দেখাতে উঠে পড়ে লেগে যেতে একটুও দেরি সইল না। আমি অজস্র অর্থের মালিক হই বা না হই, আমার আপনজনেরা দিনের পর দিন ডঙ্কা পিটিয়ে, নাম ফাটিয়ে আমাকে বাজারে রীতিমত দরদামওয়ালা মানুষ হিসাবে জাহির করে ছাড়লে।

এর পরও কি বিরাট আয়োজনে একটা বিয়ে না হলে চলে! না বংশরক্ষা হয়! সুতরাং পাশকরা মেয়ের সঙ্গে সাদি আমার মহা ধুমধামে দেখতে দেখতে সাঙ্গ হয়ে গেল। মনে মুকুলিত যৌবন, দেহে বসন্তের বাহার। অন্তরে প্রিয়ার জন্যে হাহাকার। এইক্ষণে সাদির সমারোহে জীবনের নতুন সুরঝঙ্কার শুনতে পেলাম অণুপরমাণু-শিহরণে।

পড়তে পড়তে চোখ ধরে এসেছিল। খাতাটি রেখে উঠে পড়া গেল। যদি স্নিগ্ধতায় চোখ জুড়ায়, সেই ভরসায় দরজা খুলে বেরিয়ে পড়তেই কেমন যেন মনে হল, ওই কে লঘু দ্রুত গমনে সরে গেল।

সামান্যক্ষণ! ঘরে যখন ফিরলাম, খাতার পাতার পাঠোদ্ধারে মন আর কিছুতেই বসতে চাইল না। সত্যি বলতে কি, মন তখন ঐ লঘু দ্রুত গমন অনুসরণে অভিযাত্রী হতে চাইছিল। আর কেবল থেকে থেকে নতুন জীবনের নতুনতর সুরঝঙ্কারপিয়াসী আত্মার অনুপরমাণু-শিহরণ অনুভবব্যাকুল বেদনায় বিহ্বল হয়ে উঠছিল।

পরের দিন। সূর্যোদয় দেখে ফিরছি। ঘরে ফিরবার পথে দেখি, মাসিমার কামরায় রীতিমত মশগুলী আলাপের আসর জমেছে। চিত্রার খল খল হাসির উচ্ছ্বাস ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে তার মায়ের হাসিও উপচে পড়ছে।

নিজের কামরায় দরজা ভেজিয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। অলস সময় ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ঢিমেতেতালায় বয়ে চলেছিল। সমুদ্রের সংক্ষুব্ধ কলরোল ভেসে এসে শুধু জানিয়ে যাচ্ছিল, মহাকালের রথযাত্রা কারো পানে ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে চলেছে।

উদাস মনে কোন ভাবনার বশে ধরা দিতে চাইছিলাম সে জানিনে। কতক্ষণ এইভাবে কেটে যেতে হঠাৎ দরজায় করাঘাত শুনে ভেতরে আসতে আহ্বান জানাতে দোর ঠেলে দেখা দিল কয়েকটি কৌতূহলী মুখ।

সবার আগে মাসিমা তাঁর সদ্য-পরিচিত বিশেষ অনুগত নন্দাইকে নিয়ে ঢুকেছিলেন। তিনি জানতে চাইলেন, শুচীন্দ্রম দেখতে যাবে।

শুচীন্দ্রম মন্দির বছর দুয়েক আগে একবার আমার দেখা। সে মন্দির ত্রিবান্দ্রম থেকে 'কেপে' আসবার পথেই পড়ে। এবার আসার সময় সন্ধ্যা ঘুরে যাওয়ায় শুচীন্দ্রম দর্শন সম্ভব হয়নি। তাই সেখানে যাওয়ার প্রস্তাব আমার সম্মতির অপেক্ষা রাখে না। বিশেষ করে শুচীন্দ্রম মন্দিরের প্রবেশ পথে মদন-রতির যে অপূর্ব আশ্চর্য সুন্দর ভাস্কর্য

দু'টি রয়েছে সে যেন তাদের অদ্বিতীয় রূপের দীপ্তিতে আমায় এই মুহূর্তেও হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

কিন্তু মাসিমা ও তাঁর অনুগত ভদ্রমহিলার মাথার ওপাশ দিয়ে আর দুটি আয়ত নয়নের ইসারা আমায় কেমন যেন সম্মোহিত করেছিল। প্রথমটা চকিত চঞ্চলতায় ঠোঁটদুটিতে কি একটা কবুল করে ফেলতে চেয়েছিলাম যেন। সেইক্ষণে দুটি গভীর চোখের আদেশ ঠিকরে এসে স্তব্ধ করে দিলে মুখের ফুটন্ত প্রাক্-মুখরতাকে।

গলার জোরে আদেশ করতে অনেক শুনেছি। পদাধিকারে আজ্ঞা দিতে কম লোককে প্রত্যক্ষ করিনি। শক্তি-সম্পদ-ঐশ্বর্যের দাম্ভিকতায় আদেশ পালনের হুকুম দানের পটুত্ব যাদের অসাধারণ, তাদের সংস্পর্শেও আসতে হয়েছে। কিন্তু গভীর চোখের সূক্ষ্ম বাণীতে অমোঘ হুকুমজারির সান্নিধ্য এই সবে। অথচ এর অবাধ্যতার শক্তি খুঁজেও মেলা ভার!

মাসিমা এপক্ষের নিরুত্তরে ফের জানতে চাইলেন, শুচীন্দ্রমে যাবার ইচ্ছে আছে কিনা।

জোর করে সম্মতি জানাতে গেছলাম। অকস্মাৎ অগ্নি-ইসারায় অসম্মতি প্রকাশে ঘাড় হেলালাম।

এপক্ষের একান্ত নির্বাকতায় মাসিমা শেষটায় বললেন, বেশ তোমরা বিশ্রাম নাও—আমরা অচিন্ত্যকে নিয়ে ঘুরে আসি। বলেই যে যার মত বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু এই তোমরা-টা......!

সেই খাতা খুলে বসেছিলাম। জানলা খোলা। আকাশ এসে নীল চোখে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। সুনীল সাগর অদূরে নভোলোকে ডানা মেলে অসীম নীলিমায় মিলে গেছে। ওই দুয়ের মিলনে যেন কোথাও আর কোন বিচ্ছেদ নেই। কিন্তু......... 'মূলত মেয়েমানুষ' কথাটা 'ফাণ্ডামেন্টালি এ ওম্যান'-এর তর্জমা যদি হয়, তাহলে একথা সত্যি, জীবনে সুদীর্ঘদিন আমি মেয়েদের কখনো 'মূলত মেয়েমানুষ' বলে এই সভ্য যুগে হেয় করতে নারাজ ছিলাম। যখনি কোন উপন্যাসে রমণীকে

এইভাবে ফুটিয়ে তুলবার প্রয়াস দেখতাম তখনি তীব্র তিতিক্ষায় অন্তর আমার বিদ্রোহী হত ঔপন্যাসিকের উন্নাসিকতার বিরুদ্ধে। যখন কোনো সামাজিক পরিবেশে কোনো পুরুষ নারীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাভ-ক্ষতি, তুচ্ছ স্বার্থীরূপে প্রতিপন্ন করতে যেত, তখন আমি বিদ্রোহ না করে পারতাম না। কিন্তু আর অগ্রসর হবার আগে 'মূলত মেয়েমানুষ' কেন বলছি সেই তুচ্ছ ঘটনাটার জট মেলে ধরলে কেমন হয়!

হালফ্যাসানের এক অতি সুন্দর সজ্জার দোকানে শো-কেসে চমৎকারভাবে সাজানো রয়েছে নরনারীর রমণীয় সজ্জা। দোকানে ঢুকবার দরজায় তুপাশে তুই রতির মত ডামি-রমণীকে সাজিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এমন ভঙ্গিমায়, যা দেখলে নয়ন আপনা থেকে বঙ্কিম হয়ে থমকে দাঁড়ায়।

এক পুত্রের বাপ তার পুত্র ও পুত্রের মাকে নিয়ে সেই দরজা দিয়ে দোকানে ঢুকতে যাবেন, হঠাৎ তিনজনেই ডামি-রমণীর সামনে থমকে গেছেন। পুত্রটি আশ্চর্য পুলকিত-নয়নে একবার সুসজ্জিত শো-কেসের রমণীর দিকে চাইছে, আর বার অদ্ভুত দৃষ্টিতে ফিরে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছে তার হাতধরা জননীটিকে। কয়েকবার কৌতূহলী কিশোর-দৃষ্টির এমনিতর আনাগোনার পরে ছেলেটি বাপকে তার প্রশ্ন করলে, 'শো-কেসে ওটি কে।'

বাপ বললে, 'ওটি একটি মেয়েমানুষ।'

কিশোরের কৌতূহল তখনো মেটেনি। সে আরো বারকয়েক মায়ের চোখ ফিরিয়ে দেখে নিয়ে চট করে জানতে চাইলে, 'আচ্ছা বাবা, মাও কি মেয়েমানুষ।'

বাপ অবাক্ হলেও সামলে নিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, মেয়েমানুষ মূলত মেয়েমানুষ!'

ঘটনার জট এর বেশি খোলার সাধ্য থাকলে নিশ্চয়ই খুলতাম। কিন্তু আমার সে অক্ষমতা অস্বীকার করে লাভ নেই এবং এরপর যা কিছু জীবনের ঘটনা তার সঙ্গে এই জটের কেমন যেন একটা অদৃশ্য অচ্ছেদ্য যোগ রয়েছে।

এই পর্যন্ত এসেছি এমন সময় দরজায় মৃদু আওয়াজ উঠতেই কানতুটি সজাগ হয়ে উঠল। কয়েক মুহূর্ত। আওয়াজ মৃদু হতে মৃদুতর ধ্বনিতে ওঠানামা করতে লাগল। কিন্তু ভুলেও বারেক বাজখাঁই কখনো হলোনা। তখন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ভেতরে আসুন।

ভেতরে যিনি এলেন তিনি 'মূলত মেয়েমানুষ' বলে গণ্য হতে যে চান না, সেই সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক। কেবল পোশাকের পরিপাট্যে নয়, গঠনের সৌকর্যে, মুখের লালিত্যে, চোখের শাণিত বাঁকাবঙ্কিম দীপ্তিতে যেন ছন্দে ছন্দে জানিয়ে দিতে চাইছিলেন, দিনের আলোয় দেখে নাও, আমি নই সামান্যা রমণী।

আসন নিতে বলায় রমণী গ্রীবা বাঁকিয়ে কটাক্ষ হেনে কেদারায় বসে পড়ে বললে, কেমন হল, যেতে দিলুম না ত।

কথাটা মোক্ষম। প্রতিবাদের অপেক্ষা রাখে না। তবু এই মুহূর্তে প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বললাম, যেতে দিলুম না মানে, নিজেই গেলাম না। শুচীন্দ্রম আমার দেখা কিনা।

আচ্ছা—

কথা শেষ করলে না চিত্রা। কেবল তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলে।

হঠাৎ তার শ্যেনদৃষ্টি খাতাখানিতে ছোঁ মারলে। আমি ত হা-হা করে উঠলাম। একটা বিসদৃশ দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছিল আর কি। কিন্তু না, হাতে নিয়েই সে ছুঁড়ে দিলে, চাইনে।

তার রাগ ভাঙ্গাতে অনুরাগের সুরে বলতে হল, কি চাই তাহলে, হুকুম কর।

নিজেকে নিজের মাঝে ফিরে পেয়ে সে বললে, হুকুম হচ্ছে—এখনি চলুন। দিনের বেলায় কে এমন ঘরে বসে বসে কাটায়!

কথাটা মিথ্যে নয়। কাজেই আর কথা না বাড়িয়ে বাইরে যখন বেরিয়ে পড়া গেল, তখন হয়ত মাসিমা আর তাঁর নন্দাইকে নিয়ে অচিন্ত্য শুচীন্দ্রমের মন্দির দর্শনে ব্যস্ত।

আকাশ রৌদ্রে ঝলমল। সমুদ্র সফেন। বিবেকানন্দ-রকে তরঙ্গ

দুর্দাম বেগে আছড়ে পড়ে অদ্ভুত জলস্তম্ভ রচনা করে চলছে। নীল মেঘে ভেলা ভাসিয়েছে অসীমের মহাযাত্রায় কোন্ সে নেয়ে। তার দিক্‌দিগন্ত আলোর ঐশ্বর্যে ছেয়ে গেছে। কি তার সমারোহ! কি তার ব্যঞ্জনা!

বাঁধানো স্নানের ঘাটে, দীর্ঘ বিক্ষিপ্ত সমুদ্রসৈকতে নানাবর্ণের বিচিত্রতর নর-নারীর ইতস্তত সমাবেশ। তাদের মধ্যে দূর্‌দূরান্তের মধ্যবিত্ত এবং অভিজাতদের দর্শন যেমন মেলে, নিম্নবিত্ত আর অতি-সাধারণ ধর্মান্ধের সাক্ষাৎ তেমন মেলে না। কন্যাকুমারিকার অশেষ আকর্ষণ সকলের কাছে আজো পৌঁছেনি। কোনদিন যে পৌঁছাবে সে কল্পনাও সুদূরের স্বপ্ন।

পাপের ভয়ে কিংবা পুণ্যের লোভে ধর্মের আকর্ষণ, মন্দিরের ডাক দুর্বার। কিন্তু সৌন্দর্য-অনুভূতি, রূপবৈচিত্র্যের সম্মোহন সকলের কাছে সমান আবেদন বহন করে আনে না। সুন্দরের দেবতা সংখ্যাগরিষ্ঠের পূজা পান না। তাই ধর্মের দোরে ধরণা দিয়ে যত লোকই মোক্ষ পেতে চা'ক না কেন—সুন্দর-লোকে তার শতাংশের এক অংশ ও আনন্দ-অমৃত পানে তৃষা মেটাতে আসে কিনা সন্দেহ!

এ তরুণীকে আজ আনন্দে পেয়েছে। পাখীর মত উল্লাসে সে বালু ভেঙ্গে ছুটছে। তাল মিলিয়ে চলতে অপারগ হলে অনুযোগের তার অন্ত নেই।

চলতে চলতে সত্যিই থকে গেছলাম। যতদূরে চাই সুমুখে জল অথৈ। পাশে বালুর বেলাভূমি। এই মাত্র এর উপর দিয়ে যে ঢেউ নিঃশেষ হয়ে গেল তার শেষ নিঃশ্বাস না মেলাতেই সিক্ত বেলাভূমিতে সে বসে পড়ল।

বসে আছি। মাথার উপরে বালার্ক বহ্নিমান। চারদিক ধূ ধূ। নীল সমুদ্র বাষ্পাচ্ছন্ন। যেন পেঁজা তুলোর কুয়াসা উড়ছে কার উষ্ণ নিশ্বাসে। আশেপাশে জনপ্রাণী বড় একটা দেখা যায় না। এখন সমুদ্র সাক্ষী শুধু অলস বিশ্রামের, নীরব কূজনের।

নীরবতায় কথা যত ভাল লাগছিল, হঠাৎ তার সরবতায় সে সোনালী শান্তি খান খান হতে বসল।

—সহজ মেলামেশায় আপত্তি এত কিসে?

—আপত্তি আর কি। কেবল যে আমাদের সমাজে ওটি তেমন চালু হয়নি।

—চালু করতে নিজে বাদী না হলে, অনায়াসে হতে পারে। মনে যার সঙ্কোচ নেই, সে শঙ্কা করবে কেন।

—সে ত জানি না।

—তাই নাকি! অদ্ভুত তীক্ষ্ণ হাসি। একটি দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললে, এতই যদি শঙ্কা, আজ এলেন কোন্ ভরসায়।

—দিনের আলোকে ভয় কিসের।

—এটা কিন্তু রৌদ্রময়ী রাতি। আবার সেই হাসি।

ফেরার পথে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেছল চিত্রা। স্নানের ঘাটে তখনো স্নানার্থীদের ভীড়। দু-চারটি গাড়ী এদিকে পার্ক করে দাঁড়িয়ে। দু-একজন অলস আলাপে আত্মহারা। কারো দিকে কারো তাকাবার তাড়া নেই।

হোটেলের এদিককার পথটা খোয়া-ওঠা। চিত্রা আনমনে চলতে চলতে হোঁচট খাবার জোগাড় করে এনেছিল আর কি। দেখে চলতে বলতে যাব—এমন সময় সে-ই বল্লে, পথের কত বিচিত্র রূপ! কিন্তু মেয়ে-পুরুষের সম্পর্কের কেন শুধু ওই স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য রূপ হতে পারে না?

যথার্থ চিন্তায় ফেলে দিলে চিত্রা!

॥ ৩০ ॥ মন্দির ও মানুষ

"আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠলে আলো
পূবে-পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললাম 'সুন্দর'
সুন্দর হল সে।"

এই সত্য, তাই, কবি বললেন, এ কাব্য। কন্যাকুমারিকায় আজ কোনো কাজ নাই। তাই বসে বসে ভাবছিলাম নিজের কথাটাই।

দেখতে বেরিয়েছিলাম মন্দির। কত মন্দির দেখলাম। পবিত্রতার প্রতীক বলে গ্রহণ যদি কিছুকে করতে পেরে থাকি, নিঃসংশয়ে বলতে গেলে পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর এবং সর্বোত্তম পবিত্রতার নিদর্শন দেখতে পেলাম মন্দিরের গঠনে মানুষের অমিত অমর শ্রমের প্রস্তরীভূত বিন্যাসে। আর দেখলাম, মানুষের নিজের কল্পনা আর স্বপ্নকে সুমহান স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-মাধ্যমে চিরন্তন করে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসে।

দেবতা মন্দিরের যে গর্ভগৃহে বন্দী, সেখানে আমার মন তেমন বসেনি। কিন্তু সুন্দর থেকে সুন্দরতর স্থাপত্য-ভাস্কর্যের মধ্যে মানুষের ভাল হওয়ার, শ্রেয়তর কল্পনার যে ক্রমাগত প্রয়াস প্রত্যক্ষ করা যায়, তার সন্দর্শনে পৃথিবীর সেরা স্রষ্টা মানুষের কাছে আপনা থেকে মাথা নোয়াতে হয়।

এই মানুষ-'আমি' যেদিন চোখ মেলল আকাশে সেদিনই জ্বলে উঠল আলো দশদিকে। এই মানুষের অনুভূতির রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙিয়ে। আর তারই মহান ঐতিহ্য বহন করে আমরা চলেছি, প্রভাত তোরণ থেকে যাত্রা করে, নব নব সুপ্রভাতের সোনালি সিংহদ্বার লক্ষ্য করে, মৃত্যুর আঁধার পেরিয়ে অমৃতের অন্বেষণে।

আগে চলার বেগ ছিল শান্ত। আজকাল সে বেগ বেড়ে গেছে

দুর্বার দুর্বারণ গতিতে। আগে রামেশ্বর আসতে হলে সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে মৃত্যুর অদৃশ্য হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে আসতে হত। আজ সেই রামেশ্বর দর্শন সেরে কন্যাকুমারিকায় এসে মনের আনন্দে শুধু এখন ভাবছি, জীবনে আরো কত দেখবার আছে। মৃত্যুভয় এখন অকল্পনীয়। কেবল কল্পনায় ছলছল মনখানি আসমানি নাবিকের মত ওই দিগন্তের মেঘলোকে নিরুদ্দেশ স্বর্গের রহস্য ভেদ করতে যাইছে।

তাইতো আবার ঘুরেফিরে মনে হয়, 'পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো রহস্য— দেখবার বস্তুটি নয়; যে দেখে সেই মানুষটি।'

মধ্যাহ্ন অপরাহ্ণে গড়িয়ে চলেছিল। আমার মনে মন্দির আবছা হয়ে অপরাহ্ণের আলোকে মানুষের মিছিল ভীড় করে এল। ভীড় আবার আমার তেমন প্রাণের জিনিস নয়। ওর প্রয়োজন আর যেখানেই থাক, মানুষের বড় রহস্যের গুপ্তধনের ভাঁড়ারে নেই। সেখানে মানুষমাত্রেই সুনির্দিষ্ট সত্তায় একক এবং ব্যক্তিত্ববৈশিষ্ট্য সমহিম্ন।

এই একক মানুষের আকর্ষণে এক সময় পড়ে যাওয়া খাতাখানি খুলে ধরলাম চোখের পরে। জ্বলজ্বলে অক্ষরগুলো মন্দিরের দ্রাবিড় ভাস্কর্যশৈলীর মত তার নিজস্ব দৃপ্ত ভঙ্গিমায় দৃষ্টিক্ষেপ করতে লাগল। কোথায় যেন তীব্র একটা অসন্তোষ, কোথা-ও-বা জীবনকে সুন্দর করার অতৃপ্ত পিপাসায় নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পবিত্র প্রয়াস। পড়তে পড়তে নিজেই নিজেকে হারিয়ে ফেলছিলাম। কখনো বা করুণায়, কখনো সমবেদনায় দুলছিলাম।

যাঁর জীবনগাঁথা এক জট খোলার জায়গায় ফেলে এসেছিলাম তাঁরই কথার সূত্র ধরে এগিয়ে চললাম।

টাকা, টাকা, টাকা! টাকার নেশায় পেয়েছিল। সে নেশায় বুঁদ হয়ে আমার মানসী প্রিয়াকে আমি রীতিমত অপমান করে টাকার নেশায় নিশিপাওয়ার মত ছুটে চলেছিলাম। দিনটা টাকার পেছনে ব্যয় হত। রাত্রির অর্ধেকটা অর্থের হিসাব-নিকাশ মেলাতে কেটে যেত। তারপর শ্রান্ত ক্লান্ত ঘরে ফিরতেই বধূ আমার হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করতে

ছুটে আসত—না, না—আমাকে নয়, আমার হাতের টাকার থলিটাকে।

ক্রমাগত টাকা টাকা করে যেই একটু হাঁপিয়ে উঠে আমার অন্তরপ্রিয়ার অশরীরী অন্তরে ঝাঁপিয়ে পড়তে রং তুলি নিয়ে বসতাম, অমনি রক্তমাংসের মানবী বধূটি আমার কর্ণে যে মধুবর্ষণ করতে লাগত তা শুনে অন্তর জুড়িয়ে যাবার কথা নয়।

মাঝে মাঝে আমার মধ্যে কল্পনার রং জেগে উঠত। আগ্রার ঐতিহাসিক পরিবেশে হঠাৎ কোনো শুক্লা চতুর্দশীতে মনে হত, আমি সাহানশা'র চেয়ে কম কিসে। চোখে নতুন নেশা রং ধরেছে। বধূকে দেখছি বাদশাজাদীর বেশে। ডেকে বলছি, আজ একটু ঘাগরা পরে ওড়না উড়িয়ে দাওনা। তার উত্তরে নেশা আমার ছুটে যেত। আমার বড় সাধের বাদশাজাদী মুখ নেড়ে হাত ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিত টাকার হিসাব কষার টেবিলখানি।

মেয়েদের প্রতি সহজাত শ্রদ্ধা আমায় কঠিন হতে দেয়নি কোনোদিন। আজীবন তাদের দুর্ভাগ্যের কথা শুনলেই পুরুষ জাতটার উপরে ক্ষেপে যেতে বসেছি। কিন্তু এ কি!

টাকা আসছে। অথচ কার জন্যে! বুঝে পাইনে। তবুও টাকা, না, যেন মদের নেশা।

আমার ঘর সাজাবার বিচিত্র সংগ্রহে দুনিয়াটাকে ঘরের কোণে বাঁধবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনেকদিন থেকেই ছিল। আগে টাকা ছিল না, তাই ওটা চাপা দিয়েছিলাম। টাকা এখন অঢেল আসছে আর কোন্ দুঃখে আকাঙ্ক্ষাটাকে পাথর চাপা দেওয়া!

তাই সেদিন মোটা একটা টাকা পেয়ে নিয়ে এলাম শ্বেতপাথরের তাজমহল। বধুকে বললাম, কি এনেছি দেখনা। সে কোথায় স্বামীর আনন্দে ভাগ বসাবে—না প্যাক খুলে দাঁত মেলে ধরলে, দুটো টাকা হয়েছে কিনা, তার ঠাট দেখনা।

ওই দন্তরাজি-কৌমুদীর দৌলতে আমার মন ভাঙতে বসেছিল।

তবুও কতবার ভাবলাম, ছবি দেখতে চোখের যেমন শিক্ষা চাই, শিল্পবস্তুর রসগ্রহণের তেমন শিক্ষা হয়ত আমার বিবাহিত বধূর নাই। বেশ ত এবার থেকে আমিই তাকে তৈরি করে নেব। অমোঘ আঘাত যদি কিছু পেয়ে থাকি, ভুলে যাব বিপুল ক্ষমায়।

আমি চেষ্টা করলে কি হয়, বিধি বাম। তার ধারণা, বিশ্ববিদ্যালয়ের গোটাকয়েক তকমা যার নেই, তাকে বিদ্বে বুদ্ধি নিয়ে কথা বলবার অধিকার দিলে কে? কিছু বলতে গেলেই তার বাঁধা গৎ,—'থাক হয়েছে!'

সেদিনের কথা জীবনে কখনো ভুলবনা। সেবার আমার প্রথম সন্তানের তৃতীয় জন্মবার্ষিকী। বাড়ীতে একটু আমোদ-উৎসবের আয়োজন করতে ইচ্ছে করেছি। রাতে কজনকে খেতেও বলা হয়েছে। দুপুরটা নিজেদের জন্যে একান্তই বরাদ্দ। আগের রাতে সমস্ত জানিয়েছি রাজকুমারের মাকে। কেবল জানালায় টানাবার গোলাপী পর্দা-ক'খানি তাকে না দেখিয়ে রেখে দিয়েছি, সকালে চমকে দেব বলে। যেই মনের আনন্দে পর্দাগুলি তার চোখের পরে মেলে ধরলাম, অমনি সে বলে উঠলে, এ দিয়ে কি হবে শুনি। আমি বলি, কেন, আমাদের জানলাগুলিতে আবরু পরাবে। তার উত্তর হল, খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই—এ দিয়ে দিব্যি ব্লাউজ হবে।

আকাশ থেকে পড়লাম। যা জালনায় মানায় তাই দিয়ে আমার সন্তানের মা বুক ঢাকতে চায়। সে চাইলে কি না দিতে পারি! তবু তার সামান্য ক'টুকরো কাপড়ে কি নিদারুণ লোভ!

মন ভাঙতে শুরু করেছিল। রাজকুমারের মায়ের সঙ্গে ঘর করা সত্যিই কঠিন। বিয়ের ব্যবস্থা যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা কেবল মূর্খ ই নন, কত বড় হিসেবী বেরসিক যে ছিলেন সে সত্যটুকু মর্মে মর্মে দাগ কেটে গেলে পর শুধুই ভাবতাম, মনমাতানো চেহারা মেয়েদের কেবল দেহেরই একচেটিয়া নয়, মনেরও ত হতে পারে। কিন্তু এই মেয়েলোকটিকে কোনো শ্রী-চেহারাই কি ভগবান দেননি।

এখন একে নিয়ে কি করে জীবনভর ঘর করি।

—আসতে পারি ?

—সে কথা আর বলতে !

—কি হচ্ছে মিত্রবর !

মাঝে ছুটো দিন কেটে গেছে। চিত্রাতে আমাতে এখন মিত্রতা। সেই সূত্রে সে মিত্রবর বলতে শুরু করেছে। আমি অবশ্যি সম্বোধনে খুব বেশি গতিশীল নই। তাই এখনো সম্বোধন উহ্য রেখেই কথা বলি।

—কি আর হবে, ভাবছি—।

—অত ভাবনা কেন—বুঝি না। বলেই হাত থেকে খাতাখানা টেনে নিয়ে ধমকের সুরে চিত্রা বললে, মনে নেই বুঝি সূর্যাস্ত দেখতে যেতে হবে। বন্ধুটি ওদিকে তৈরি হয়ে বসে আছে।

দিনান্ত তখন এগিয়ে আসছিল। সূর্যাস্ত দেখতে দল বেঁধে আরব সাগরের দিকে রওনা হওয়া গেল।

এমনি কত যাত্রা জীবনে কতবার পেছনে ফেলে এলাম। এ ত শুধু সামান্য একটু পথ। এ জীবনে পথচলার মহাকাব্যের এ-একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ ভাগ। তবুও এর মাধুর্য যেন সম্পূর্ণ অন্য রকম।

মাসিমা, চিত্রার মা, তার নেহাৎই ভালমানুষ বাপ, চিত্রা, অচিন্ত্যচরণ আর আমি—আমরা জনে জনে একের থেকে অন্যে একেবারেই পৃথক্। কিন্তু কোথায় কেমন যেন একটি অদৃশ্য সূক্ষ্ম বন্ধনে এইখানে বাঁধা পড়ে গেছি। এ বন্ধনে বজ্র আঁটুনির বেদনা ত আনেনি !

সরল হাসিতে চিত্রার বাবা বলছিলেন, একমাত্র মেয়ে সরকারি বৃত্তি নিয়ে সাগর পাড়ি দিতে চলেছে। যাবার আগে আপনারা সবাই আশীর্বাদ করুন যাতে ভালয় ভালয় পৌঁছয়। বলেই ভদ্রলোক শিশুর মত মুখখানি করে অত বড় মেয়ের কাঁধে আদরে চাপড় দিয়ে জানিয়ে দিলেন, চিত্রা আজও তাঁর সেই কচি খুকিটি।

মাসিমা নাতিপুতির মুখ দেখেছেন। তাঁর ছেলের মেয়ে এখন বিবাহের বয়স ধরে ধরে। চিত্রার ব্যাপারে আশীর্বাদ থেকে বলা কওয়া

সবি তাঁরি সাজে। তিনিও তাই এই সুযোগে মনের ভাব প্রকাশ করে বসলেন, গাঁটছড়া বাঁধাটা সেরেই মেয়েকে বিদেশ পাঠালে ভাল হত নন্দাই।

—কিন্তু ওর জাহাজ যে এই শনিবারে কোচিন থেকে ছাড়চে। তা ছাড়া মেয়ের আমার বলেছি ত ছেলে পছন্দ হলে তবে ত!

চিত্রার মায়ের কথা থামতেই ওর বাপ বললেন, জানেন না বুঝি, কত ছেলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে ছিলাম, বাড়ীতে কতজনকে নিয়ে এলাম, চিত্রার ধনুর্ভঙ্গ পণ ভাঙ্গাবে যে, তেমন একটিও ওর চোখে ধরল না।

চিত্রা বাধা দিলে, কি সব বলছ বাবা—!

পৃথিবীতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সকাল সন্ধ্যায় প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করবার যে ক'টি দুর্লভ ঠাঁই, কন্যাকুমারিকা তার মধ্যে অন্যতম ও অদ্বিতীয়। সকালে যেখানে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয়ের সোনালি আশীর্বাদে মনপ্রাণ রাঙিয়ে নেওয়া যায়, দিনশেষে তারই অন্যপাশে দিবাকরের শেষ দর্শনে ধন্য হবার অনন্য পরিবেশ কন্যাকুমারিকায়। একদিকে ছত্রাকারে বাবলার সারি যেন মহাকালের রুক্ষ প্রহরী। অন্যদিকে আদিম সমুদ্র দিনান্তের রক্তিমে অনাদিকালের রূপকথা বলে চলেছে বর্ণে বর্ণে বিদগ্ধ আকাশের বিরহবিধুর কানে কানে।

আকাশে সাগরে আলোকে গগনে স্নিগ্ধ গানে কোথায় এক গভীর বিচ্ছেদ; এই বুঝি সূর্যাস্তের কাব্য ছন্দ। যেখানে মিলন, সেখানে বিচ্ছেদ—হাসিকান্নার টানাপোড়েনে প্রকৃতিতে এই যে জীবন-মন্থনের উপচার উপহার, এ দেখে মানুষের মনে এমন এক অদ্ভুত ভাবের আবির্ভাব হয়, যার চেতনার রঙে অব্যক্ত অনুভূতিরা বাঙ্ময় হয়ে উঠতে চায়। সেই মুহূর্তে সূর্য ডুবে যায়। অন্ধকারে নিবিড় আলিঙ্গনে অসীম আকাশকে জাপটে ধরে রাহুর প্রেমে ক্ষুধাতুর সমুদ্রের সহস্রবাহু।

কৃষ্ণপক্ষের কালো বোরখা-ঢাকা পথে ফিরে চলেছি আস্তানার আশ্রয়ে। চিত্রা কখন গম্ভীর হয়েছে, আর তার মুখে টুঁ শব্দটি নেই। ওর বাবা অচিন্ত্যচরণের সঙ্গে বইপড়া বিদ্যে নিয়ে বাঘ শিকারের গল্প

জুড়েছেন। মাসিমা মন্দিরের দেবীমাহাত্ম্য তাঁর নন্দাইকে বলতে বলতে চলেছেন। আমার বলার কিছু নেই। বললেই বা শুনছে কে! কেমন একটা অব্যক্ত একাকীত্বের বেদনায় দলের মধ্যে থেকেও অন্তর টনটন করছে। মনে হচ্ছে, এ ব্যথার উৎসটা যেন এখানে নয়, অজানা অনেক দূরে কোথায়; যেখানে অনাগত আনন্দের সকল সম্ভাবনায় কোন অজ্ঞাত মানুষের মনের মণি-কোঠার বৈদূর্যমণি চিরজাগ্রত, চিরপ্রতীক্ষারত।

মনটা কেমন হয়ে গেছ্‌ল! কামরায় ফিরে আলো জ্বেলে চুপচাপ বসে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু একাকীত্বের নির্মমতায় সে এক রকম অসম্ভব হয়ে ওঠায় কত কি-ই-না ভাবনায় ডুবে গেলাম।

চিন্তার অতলে অকস্মাৎ টর্পেডো আক্রমণ হল। অচিন্ত্যচরণ আচম্বিতে হাজির হয়ে বললে কাল ভোরেই এখানকার পাট তুলতে হবে। মনে থাকে যেন।

একটু বাদে স্বয়ং মাসিমা এসে হাজির। তিনি জানালেন, কুমারী দেবীর তপস্যা কোন্ ভবিষ্যতে ভাঙবে কে জানে! সে ভাঙুক আর নাই ভাঙুক, নন্দাইয়ের মেয়ের ধনুর্ভঙ্গ পণের একটা হিল্লে কেউ করতে পারলেই মঙ্গল।

মাসিমা যে একা নন, সে জানা গেল সমবেত কলরোলে। কলরোল ক্রমশ মিলিয়ে এল। তবুও আমার মনের অবস্থান্তর কিছুমাত্র না-ঘটায় যাবার আগে সেই খাতায় আবার নিজেকে সঁপে দিতে চাইলাম।

—বিবাহিত জীবনের ট্র্যাজেডি যতই ভয়াবহ হোক না কেন, বধূকে নিয়ে নীড় গড়ায় অপারগ বললে, কে শুনছে। তাই পরিত্যাগের পথে খুঁজে নিতে গিয়ে দেখি, অচলায়তন মনুর সমাজ পথ রুখতে কতই না তৎপর!

তারপর মনপ্রাণ সঙ্গীত সাগরে ডুবিয়ে দিয়ে কিছুটা সান্ত্বনা পেতে এক ওস্তাদজীকে গুরু বহাল করলাম। তখন রাজকুমারের মায়ের যত আক্রোশ গিয়ে পড়ল গুরুজীর উপর। তাঁকে বিদেয় করে আমার উপর হামলা শুরু করলে।

শেষ পর্যন্ত সমানে পাল্লা দিতে গিয়ে গলার দফা রফা শেষ। শুধু কি তাই? ঘরে টেকাই হল দায়।

ফলে একদিন সব কিছু ফেলে পালিয়ে বাঁচার পথ না ধরে আর উপায় রইল না। পাছে বিকৃত স্বরে রাজকুমারের মায়ের নেকনজর পড়ে সেই শঙ্কায় আজো গলা খুলতে সাহস পাই না।······

খাতাখানি রাখতে যাব, দেখি স্কন্ধদেশে কার পেলব স্পর্শালুতা ছুঁয়ে আছে। কেমন উগ্র গন্ধে ঘরের আকাশ ভরপুর।

ফিরে চাইলাম। চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

অত্যাধুনিক উপন্যাসের পাতায় যে দৃশ্য হুবহু মানায় অথচ অবাস্তব ভ্রম হয়, তারই প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে হতভম্ব না হয়ে উপায় কি!

চিত্রার হাতে পানপাত্র······

কাছে, না যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসতে থাকে স্খলিত কণ্ঠস্বর, ঘৃণা করতেও কি পারনা তোমরা······নাঃ, মাতাল আর হই না।······ একবার······হয়েছিলাম, মদে নয়······প্রেমের মাদকতায়। প্রতারণায় নেশা ছুটে যেতে এই শুরু করলাম। ·····

শূন্য পাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিলে চিত্রা।

তখনো হতভম্ব ভাব আমার কাটেনি। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে বললে, কি সব পড়ছিলে। জীবনের সঙ্গে ও সব কি কখনো মেলে! সত্যি কথা শুনবে, তোমরা ভীরু, কাপুরুষ, আর আমরা তোমাদের হাতের খেলনা বই ত নই······

অবশিষ্ট রাতটুকু অতন্দ্র অদ্ভুত এক বেদনার মধ্য দিয়ে কিছুতেই যেন কাটতে চাইছিল না। কার কথা সত্যি, মৌনীবাবার না চিত্রার? কার অভিযোগ যথার্থ, নারীর না পুরুষের?

একনিষ্ঠ কুমারী তপস্বীর বেদীপীঠ সুমুখে করে সেই মহান উদার শঙ্কর-উমার আবির্ভাব হবে যারা শাশ্বত নরনারীর এ চিরন্তন জিজ্ঞাসার মোক্ষম জবাব জীবনে রূপায়িত করে তুলবে। সেদিন কি হবে মানুষের মন্দির-তীর্থ-পরিক্রমার মহাপ্রস্থান কিংবা মহাযাত্রা নতুন এক পরমতীর্থের উদ্দেশে!